আমার ফাঁসি চাই

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু

(প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারিভাবে সস্ত্রীক অবাঞ্ছিত ঘোষিত)

উৎসর্গ

দেশপ্রেম বিবর্জিত নেতা-নেত্রীর খপ্পরে পড়ে যে সমস্ত প্রতিভাবান তরুণ ছাত্র-যুবক তাঁদের ভবিষ্যত এবং জীবন বিসর্জন দিয়েছে,

"আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থটি তাঁদের জন্য-

• কেন এই ই-বুক ভার্সন •

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ফ্যাসিস্ট স্বৈরশাষক, বাংলাদেশের বর্তমান অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসল পৈশাচিকরূপ উন্মোচনকারী তারই একসময়ের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু রচিত স্মৃতিকথামূলক আলোড়ন সৃষ্টিকারী তথ্যবহুল প্রামাণ্য গ্রন্থ **"আমার ফাঁসি চাই"** এর ছাপানো সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য। মূলতঃ বইটি প্রকাশের পর রাজনীতি সচেতন মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যাওয়ায় এবং শেখ হাসিনার প্রকৃত চরিত্র ফাঁস হয়ে পড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আতংকিত শেখ হাসিনা ক্ষমতার দাপটে বইটি নিষিদ্ধ করে দেয়। বইটি এখনো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলেও তারা তা কঠোর গোপনীয়তা সহকারে রেখেছেন এবং হাত বদল করতে চান না সঙ্গত কারণেই। ইন্টারনেটে মূল বইয়ের যে সব স্ক্যান করা কপি পাওয়া যায় তা আয়তনে বিশাল এবং খুবই অস্পষ্ট থাকায় অনেকেই বইটি অনলাইনে খুঁজে পেলেও আয়তনে বিশালতার দরুণ ডাউনলোড করার সাহস পান না মূলতঃ ধীর গতির ও স্বল্প প্যাকজের নেট ব্যবহার করার কারণে। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বের দাবিদার হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এই দলটি প্রতিনিয়তই তার ফ্যাসিবাদী চরিত্রের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আওয়ামী লীগের চিরস্থায়ী সভানেত্রী শেখ হাসিনার চরম অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী ও নির্বিচারে গুম-হত্যার ঘৃণ্য রাজনীতির কারণে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নগ্ন পৈচাশিক মুখোশ দেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে '৭১ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উন্মোচন করে দেয়ার জন্য এমন একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের আবেদন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন আরো বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সময়ের দাবির প্রেক্ষিতে প্রথবারের মতো আয়তনে ছোট ও টেক্সট বেইজড ই-বুক (এক মেগাবাইটের মতো) পিডিএফ ভার্সন হিসেবে প্রকাশের জন্য **"আমার ফাঁসি চাই"** প্রামাণ্য গ্রন্থটি রি-টাইপ করা হলো। কিছু কিছু বানান সংশোধন করা ছাড়া কোথাও কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়নি। পিডিএফ ভার্সনটির আয়তন বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ছাপানো মূল বইয়ে সংযোজিত সকল ছবি বাদ দেয়া হয়েছে। যারা এই পিডিএফ ভার্সনটির সত্যতা নিশ্চিত হতে চান - তারা অনলাইন থেকে মূল বইয়ের স্ক্যান কপিগুলো নামিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারেন, দেখতে পারেন ছবিগুলোও যা তথ্যের প্রামাণ্যতা নিশ্চিত করবে।

যারা শেখ হাসিনাকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি তথা দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল বলে মনে করে আসছেন, এই বইটি নিশ্চিতভাবেই তাদের অনেকের ভুল ভাঙাবে; অনেকেই উপলব্ধি করতে বাধ্য হবেন "সাম্য, মানবিকতা ও ইনসাফ" যা ছিল স্বাধীনতার মূল চেতনা তা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ফিরিয়ে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে শুধুমাত্র টাকায় কেনা বুদ্ধিজীবি, পোষা মিডিয়া এবং অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করাসহ ভারতীয় আগ্রাসনের নীল নকশা বাস্তবায়নে শেখ হাসিনা বাকশালী কায়দায় কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বিকৃত ও ভুলুন্ঠিত করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, ন্যায় বিচার ও সুশাসনকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

দেশপ্রেমিক সচেতন জনগণ যে যেভাবেই পারুন শেখ হাসিনার পৈশাচিক মুখোশ উন্মোচন করার জন্য **"আমার ফাঁসি চাই"** এর এই ই-বুক ভার্সনটি সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জালিম স্বৈরশাষক, ভারতের দালাল খুনী শেখ হাসিনার দুঃশাষণ এবং সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও নষ্ট-ভ্রষ্টদের দল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখুন।

— **ই-বুক প্রকাশক**
২০/০১/২০১৪ ইং

প্রথম প্রকাশ

স্বাধীনতা দিবস' ১৯৯৯

নামকরণ

যদি পুলিশের উদ্দেশে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়া হতো তাহলে গ্রন্থটির নাম হতো "১৬১ ধারার জবানবন্দী"। যদি ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়া হতো, তাহলে গ্রন্থটির নাম হতো "১৬৪ ধারার জবানবন্দী"। কিন্তু জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর কোনো ধারা নেই। যেহেতু এই গ্রন্থটি জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া এক ধরনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, তাই গ্রন্থটির নাম দিয়েছি "আমার ফাঁসি চাই"। যদি বলা যায় মিস্টার X অপরাধ করেছে। মিস্টার X এর ফাঁসি চাই। তাহলে নিজে অপরাধ করলে কি বলা উচিত না আমার ফাঁসি চাই? তাই গ্রন্থটির নাম রেখেছি "আমার ফাঁসি চাই"।

— লেখক

ভূমিকা

আমার বিশ্বাস অতীতের সত্য ঘটনা বা ইতিহাস জানা থাকলে ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা হয়ত আসতে পারে। শুধু আমি জড়িত আছি বা জানি এমন সমস্ত ঘটনাবলীই কেবল এখানে লিখিত হলো। তবে আমার দেখা বা জানার বাইরে অন্য কিছু নেই, এটা একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্যই আছে।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, যারা রাজনীতি করেন বা দেশ চালান তারা আমাদের চাইতে খুব বেশি কিছু বোঝেন তা মোটেও নয়। আমাদের ধারণার আশপাশ দিয়েই তাদের ধারণা। আমাদের চাইতে খুব বেশি জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা রাজনীতিবিদদের আছে, এমন ভাববারও কোনোই কারণ নেই। বরং কোনো কোনো বাস্তব বিষয়ে তাদের ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানের চাইতে আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সেই তুলনায় অনেক বেশি। অন্তত বাংলাদেশের রাজনীতিক ও প্রশাসকদের বেলায় এটা ষোলআনা সত্য।

কত নিচ প্রকৃতির এবং কত লোভী ও ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির মানুষেরা কত উপরে আসীন, সাধারণ জনতার কাছে তা তুলে ধরার জন্যই এই বই লেখার প্রয়াস আমার। বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের মানুষের জন্য এই ধরনের বই বা পুস্তক লেখা উচিত কি-না এ নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছি — রাজনীতির অন্তরালে

কোনো সত্য ও তথ্যকে বাধাগ্রস্ত না করে, যতটুকু জেনেছি তাই-ই জনসম্মুখে তুলে ধরব এই ভেবে যে, তা যদি বর্তমান এবং আগামী দিনের মানুষের কোনো কাজে লাগে।

এই গ্রন্থ বা পুস্তক পড়ে কোনো কোনো পাঠক আমাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করবেন, পারলে তার চাইতেও ভয়ানক চরম দণ্ড দেবেন। আবার কোনো কোনো পাঠক হয়ত সতর্ক-সাবধান হয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করে আগামী দিনের রাজনৈতিক পথ চলবেন।

পাঠক কি করবেন, এটা একান্তই পাঠকের নিজস্ব ব্যাপার। তবে আমরা এটাকে প্রকাশ করা আমাদের একান্তই দায়িত্ব মনে করেছি।

আমাদের সমূহ বিপদের কথা চিন্তা করে সকলেই একবাক্যে বইটি এখন প্রকাশ না করে, শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না, তখন প্রকাশ করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্মিলিত সকলের রায়ের সাথে একমত হইনি এই ভেবে যে, মানুষের (শেখ হাসিনার) দূর্বল মুহূর্তে তাঁর পিছনের কথা ফাঁস করে দেয়ার মধ্যে কোনো সৎ সাহস বা কৃতিত্ব থাকতে পারে না।

তাই ভবিষ্যত বিড়ম্বনার সম্ভাবনা জেনেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসন আমলেই এই গ্রন্থ বা পুস্তক প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জীবন মানে পরাজিত হওয়া নয়, অবিরাম যুদ্ধ করা। রাখে আল্লাহ মারে কে?

পাঠক মনে করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারিভাবে আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) কে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার জন্যই আমরা এই জাতীয় লেখা তৈরি করেছি। হ্যাঁ, এটা খুবই সত্যি কথা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) কে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় না দিলে হয়ত আমাদের মাথায় এই গ্রন্থ লেখার বিষয়টি আসত না।

পুলিশ, সিআইডি, ডিবি, আইবি, এনএসআই, ডিজিএফআই—সহ রাষ্ট্রের সকল সংস্থায় আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐ আদেশই আমাদের মাথায় এই বই বা গ্রন্থ লেখার বিষয় এনে দেয়। এখানে যা লেখা হয়েছে তার সবটুকুই বাস্তবের ছবি। আমারা শুধু সত্য বিষয়ের উপর কথার মালা গেঁথেছি।

আমাদের চিন্তায় এই বিষয়গুলো জাগিয়ে দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐ বেআইনি আদেশের প্রতি আমরা যারপরনাই কৃতজ্ঞ। কারণ সেই সূত্র থেকেই এত কিছুর বিস্তার।

রাষ্ট্রের নাগরিককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা শুধু সংবিধান বিরোধী এবং বেআইনিই নয়, এটা হচ্ছে শপথবাক্যের স্পষ্ট বরখেলাপ।

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের সময় শেখ হাসিনা শপথ নিয়ে বলেছিলেন, "আমি শেখ হাসিনা সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করিব।

"আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়। এই বিষয়টি নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে ফেরার দিন থেকে ১৯৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১৬ বৎসর বিরামহীন দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের তাড়িয়ে দিলেন। আমরা পরাজিত হলাম। তবুও বুঝাতে পারলাম না, রাজনীতি মানুষকে দেয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়। সত্যি কথা বলার প্রবল দৃঢ়তা আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের কাছে বিপদজনক করে তুলেছিল। ব্যক্তিগতভাবে যিনি অসৎ, বেঈমান, নিমকহারাম এবং মুনাফেক, তিনি কি রাষ্ট্রীয় বা সমাজ-জীবনে সৎ ঈমানদার হতে পারেন?

— লেখক

সূচীপত্র

৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ শিকদার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেখ মুজিব হত্যা, খন্দকার মুস্তাক রাষ্ট্রপতি, কোল হত্যা, ৩রা নভেম্বর অভ্যূত্থান, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব	১২
৭ই মার্চের ভাষণ	১৪
ভারতে পলায়ন	৪১
বাঘা সিদ্দিকীর কাছে যাওয়া	৪৭
প্রতিবাদ যুদ্ধ	৫২
যুদ্ধে পরাজয়	৬৭
হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা	৭১
রাজনীতিতে শেখ হাসিনা	৭৪
এই জিয়া সেই জিয়া নয়	৭৬
রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা	৭৭
লেবানন ট্রেনিং	৮১
এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ	৮৩
১৯৮৩—এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র হত্যা	৮৪
সেলিম ও দেলোয়ার হত্যা	৯০
দেশদ্রোহী অসভ্য বাহিনী	৯২
মসজিদ সরিয়ে ফেলুন	৯৪
১৯৮৬—এর নির্বাচন	৯৪
এত বড় মাঠ	৯৯
আন্দোলন আন্দোলন খেলা	১০০
ছিয়াশির পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া	১০১
এরশাদ পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার	১০২
এরশাদ পতনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা	১০৩
পদত্যাগ নাটক	১০৫
টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী	১০৬
জাহানারা ইমাম ও শেখ হাসিনা	১০৭
গোলাম আযম ও শেখ হাসিনা বৈঠক	১০৮
১৯৯২—এর হিন্দু-মুসলিম রায়ট	১০৯
ফেরি আটকিয়ে ফেলে রাখা	১১৩

শেখ হাসিনা ও গোলাম আযম ২য় বৈঠক ১১৬
নির্বাচন বাতিলের দাবি ১১৬
শেখ হাসিনা এবং মেয়র হানিফ ১২০
রুমালে গ্লিসারিন ১২০
আজ আমি বেশি খাব ১২১
টাকার ভাগ দিতে হবে ১২১
জাহানারা ইমাম মরেছে, আপদ গেছে ১২২
শেখ হাসিনার ট্রেনে গুলি ১২৩
ফুল ছিটানো ১২৫
কুকুর পালা ১২৬
স্বামী-স্ত্রী রাত কাটাননি ১২৮
শেখ হাসিনার দেহে আঘাত ১২৯
অদ্ভুত চরিত্র কর্ম ও ভাগ্য ১৩০
রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দিব না ১৩১
সব যান, বের হন ১৩২
এক কোটি সাইত্রিশ লক্ষ টাকা ১৩৩
নেত্রী এখন নামাজ পড়ছেন ১৩৪
আমার সাথে বেঈমানি করেছে ১৩৫
আমি খাইছি ১৩৫
বঙ্গবন্ধুর ৭৬–তম জন্ম উৎসব ১৩৭
হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিওটা সুন্দর হতো ১৩৯
শেখ হাসিনাকে মিথ্যে বলা ১৪০
আওয়ামী লীগে সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ১৪১
জনতাকে শান্ত থাকার বক্তৃতা ১৪২
খাতা-কলম, গোলা-বারুদ ও দিগম্বর ১৪৪
জেনারেল নাসিমকে ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব ১৪৬
পুলিশের লাশ চাই, মেলেটারির লাশ চাই ১৪৭
বেঈমানটা আসছে ১৪৯
নায়ক, মন্ত্রী ও জনতার মঞ্চ ১৫১
আজ পিকনিক ১৫২
শেখ হাসিনা–জেনারেল নাসিম বৈঠক ১৫৩
হিন্দুরা নৌকায় ভোট দেয় ১৫৪
রাজাকারের কাছে আসন বিক্রি ১৫৫

হিন্দুরাই আমার বল-ভরসা ১৫৬
সৈন্য নামানোর নির্দেশ দিয়ে চম্পট ১৫৭
আবু হেনার আগমণ ১৬৩
ঐক্যমত্যের সরকার ১৬৪
রওশন এরশাদের পা ধরা ১৬৬
বোরখাওয়ালীদের সিট ১৬৭
হানিফ এলজিআরডি মন্ত্রী ১৬৯
সবার মুখ কালো ১৬৯
আমার সাথে বেঈমানি ১৭০
বেসামাল ১৭১
দুই বোনের ভাগাভাগি ১৭৩
শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি ১৭৪
ওরা ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা ১৭৫
ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া ১৭৭
প্রথম আমেরিকা সফর ১৭৮
যুদ্ধ বিমান ক্রয় ১৮১
কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা ১৮২
বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া ১৮৬
বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা ১৮৮
গঙ্গা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯০
ঘর ভাঙ্গা আসছে এবং মহিউদ্দিন মন্ত্রী ১৯২
অবাঞ্ছিত ঘোষণা ১৯৪
দশ টাকার নোটে শেখ মুজিবের ছবি ১৯৪
পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি ১৯৫
নেতা ও উপদেষ্টাদের সাথে সম্পর্ক ১৯৮
কুত্তার জাত ২০১
জিল্লুর রহমান সেক্রেটারি ২০১
টাকা আর লাশ ২০২
স্বামীর সাথে না থাকা ২০৪
হিন্দুরা কেন আওয়ামী লীগ সমর্থন করে ২০৫
পাচার ২০৬
ভ্যাট প্রত্যাহার ২০৭
খেলা ২০৭

প্রিয়-অপ্রিয়, পছন্দের-অপছন্দের ২০৮
প্রথম নির্দেশ ২০৮
কোনো নেতা ছিল না ২০৯
চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলা ২০৯
রাজা-বাদশা, রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ২১০
ওয়াদা ২১০
চাচি-ভাতিজির কাণ্ড ২১১
ইয়েস মেড্যাম, কারেক্ট মেড্যাম ২১২
কাকে প্রথম সৎ হতে হবে ২১৩
সুরে সুরে কথা বলা ২১৫
কোনো শিক্ষা নেয়নি ২১৬
কার কত টাকা ২১৭
স্বাধীনতা ঘোষণা, দিবস, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত বিতর্ক ২১৮
৭ই মার্চের ভাষণ ঃ ট্রিমেনডাস কন্ডিশন্যাল স্পিচ ২২৫
ধিক্ শেখ মুজিব ধিক্! ২২৯
ডায়েরির পাতা ২৩০
শিক্ষা ২৩০
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ২৩২
আমার, শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই ২৩৩
তবে তার আগে ২৩৩
উপসংহার ২৩৫

৬৯–এর গণ আন্দোলন, ৭০–এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ শিকদার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেখ মুজিব হত্যা, খন্দকার মুস্তাক রাষ্ট্রপতি, জেল হত্যা, ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব

১৯৬৯ সাল, বাঙালি বীরোচিত এক সংগ্রামের মাধ্যমে কারাগার থেকে বের করে আনল বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে। তথাকথিত আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার এক প্রহসনমূলক বিচার করছিল শেখ মুজিবর রহমানসহ সামরিক–বেসামরিক–বাঙালি কিছু লোকের। কিন্তু বাংলার মানুষ এই মামলা এবং বিচার গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, এই মামলা এবং বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন করে বাঙালিরা পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করল এই মামলা প্রত্যাহার করতে এবং শেখ মুজিবরসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে। তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ। আমাদের এই দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

স্বাধীনতার পরে এই আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে মিলেমিশে যতটুকু জানা যায়, তাহলো – পাকিস্তান যে আমাদের উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছিল এবং ধর্মের নামে বাঙালিদের শোষণ করছে, এটা তারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। ঔপনিবেশিক শোষণ ও বাঙালিদের বিশেষ করে বাঙালি সৈনিকদের বঞ্চিত করার বিষয়গুলো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত বাঙালিদের মধ্যে কানাঘুষা চলছিল। পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বাঙালি সৈনিকরা তাদের প্রাপ্য পাওনা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছিল। ঠিক এমন মুহূর্তে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবরসহ সামরিক-বেসামরিক বাঙালিদের গ্রেফতার করে ও আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজায়।

এই মামলায় অভিযুক্তরা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করবে এই রকম কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত সেই সময় নেয়নি। তবে ক্রমশ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ছিল। এই মামলায় এমন অভিযুক্তও ছিলেন যিনি কিছুই জানতেন না। শুধু বাঙালি হওয়ার কারণেই মূলতঃ অভিযুক্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমাদের অধিকার সচেতনতাকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই এই আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত করেছিল। এমন অনেক অভিযুক্ত ছিলেন যারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ছাড়া শেখ মুজিবকে আর কখনোও দেখেননি।

এক প্রত্যুষে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ফেলার এমন কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত অভিযুক্তদের কারোই কখনো ছিল না বলে আগড়তলা মামলার প্রায় অভিযুক্তদের কাছ থেকে জানা যায়। অভিযুক্তদের প্রায় সকলেই বলেন, বাঙালিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা এবং নির্যাতনের জন্যই মূলতঃ পাকিস্তান সরকার তিলকে তাল বানিয়ে এই আগড়তলা মামলা দায়ের করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পাকিস্তানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বীরোচিত গণ আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্ত করে আনে।

১৯৬৯ সালেই ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ–এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র-জনতার বিশাল সভায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধী দেয়া হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সরকার জাতীয় পরিষদ (এমএনএ)–এর এবং প্রাদেশিক পরিষদের (এমপিএ) নির্বাচন ঘোষণা করে।

মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন বর্জনের জোরালো আহ্বান জানান। মজলুম জননেতা মাওলানা ভাষানীর বক্তব্য ছিল, পাকিস্তানি সরকারের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে পূর্বাঞ্চলকে স্বাধীন করার সংগ্রাম শুরু করা উচিত। তাদের শ্লোগান ছিল, "নির্বাচনে লাথি মার, পূর্ববাংলা স্বাধীন কর॥" অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি জনগণকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান। জনগণ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া দিলো। গোটা পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু এবং তার দল আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী জোয়ার বয়ে গেল। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগকে বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি ছাড়া বাকি ১৬৭টি আসনে বিজয়ী করল। মোট ভোটের শতকরা ৯২টি ভোট বঙ্গবন্ধু এবং তার দল পেলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাড়া পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যগরিষ্ঠ নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রীত্ব এবং তার দল আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের ক্ষমতা না দেয়ার নানান চক্রান্ত শুরু করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হলো আগ্নেয়গিরির মতো। বাঙালিরা চরম উৎকণ্ঠিত, উত্তেজিত। রাজপথ মিছিলে মিটিং–এ প্রকম্পিত। ঘরে ঘরে মানুষে মানুষে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। সমগ্র বাঙালি কেবল তাকিয়ে আছে জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানের দিকে। তিনি যা বলছেন চোখের পলকে বাঙালি তাই করছে। ইতিহাসের পাতায় অনেক ইতিহাস দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো ধরনের কর্মসূচীতে শুধু শেখ মুজিবের ঘোষণা করতে যতটুকু দেরি – তিনি যে কোনো কর্মসূচী ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে বাঙালি তা বাস্তবায়িত করছে। উত্তাল জাতির মুখে শুধু একটি শ্লোগান গর্জন করে ফিরছে, "বাংলাদেশ স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।"

৭ই মার্চের ভাষণ

এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) জনতার সভা ডাকলেন। ভোর না হতেই লক্ষ লক্ষ বাঙালি রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হলো স্বাধীনতা প্রশ্নে নেতার রায় শোনার জন্য। লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন জনতার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। পাকিস্তান সরকারের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মূলতঃ ৪টি কন্ডিশন বা দাবি দিয়ে তার ভাষণ শেষ করলেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম, তারপর তিনি বিবেচনা করে দেখবেন এ্যাসেম্বলিতে যাবেন, কি যাবেন না। যদিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

তারপরও বলা যায় না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ৭১–এর ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ৭ই মার্চ , ১৯৭১ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। অজ্ঞাত কারণে তিনি ৭১–এর ৭ই মার্চ পরিস্কারভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না করে, স্বাধীনতা ঘোষণা করতে একটুখানি বাকি রাখলেন এবং পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্যে ৪টি দাবি করলেন। আবার তার এই দাবি মেনে নেয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারকে সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমাও বেঁধে দিলেন না। তবে তাঁর নির্দেশে যে অসহযোগ আন্দোলন তখন চলছিল তা বজায় রাখার নির্দেশ তিনি দেন এবং সেই সাথে নতুন করে যোগ করলেন খাজনা-ট্যাক্স সব বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ। হরতাল প্রত্যাহার করলেন। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা সব বন্ধ ঘোষণা করলেন। মাস শেষে কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আসতে বললেন। শিল্পের মালিককে শ্রমিকের বেতন পৌঁছে দিতে বললেন। রেডিও, টেলিভিশন তাঁর সংবাদ পরিবেশন না করলে বাঙালিদের রেডিও টেলিভিশনে যেতে নিষেধ করলেন।

আন্দোলন নতুন মোড় নিল। বাঙালি বুঝতে পারল স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। কিন্তু ঠিক কবে থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবে এবং কীভাবে হবে তা নিয়ে ছিল অস্পষ্টতা ও সংশয়। কারোরই সঠিক কোনো পরিস্কার ধারণা ছিল না।

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ৭১–এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এককভাবে সুস্পষ্ট করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না কেন, তা কখনো কোনো দিন পরিস্কার জানা যায়নি।

বিশ্লেষণ এবং সামরিক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যদি পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে ঘোষণা করতেন এবং সুদূর ১২ হাজার মাইল দূর থেকে আসা পাকিস্তানি সৈন্যদের বন্দী করতে বলতেন, তাহলে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ ও জনতার যে লড়াই বা যুদ্ধ হতো, সেই যুদ্ধে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সামান্য রক্তপাতের বিনিময়েই আমাদের দেশ মুক্ত বা স্বাধীন হতো।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তানি সৈন্য সংখ্যা এতই নগন্য ছিল যে, পাকিস্তানি পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ সৈন্য বাঙালি সৈন্যদের কাছে অসহায় এবং মুখাপেক্ষী ছিল। আবার এই পাকিস্তানি পাঞ্জাবি, সিন্ধি বেলুচ সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল অফিসার। যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে, কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ করে না। এই নগন্য সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্যকে ধরাশায়ী বা পরাস্ত করতে বাঙালি সৈন্য, ইপিআর (আজকের বিডিআর) পুলিশ এবং সাড়ে সাত কোটি জনতার কোনোক্রমেই সপ্তাহের বেশি সময় লাগত না।

কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান স্পষ্টভাবে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা না করায় এবং অনির্দিষ্ট সময় নিয়ে পাকিস্তানের কাছে ৪টি দাবি বা শর্ত দেয়ার সুযোগে পাকিস্তান দিবা-রাত্রি তাদের সৈন্য এবং অস্ত্র বাংলাদেশে এনেছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানের যত ননবেঙ্গলি সৈন্য ছিল, ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণের পর (৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত) পাকিস্তান বাংলাদেশে তার সৈন্য ও অস্ত্রসস্ত্র গোলাবারুদ বহুগুণ বেশি বৃদ্ধি করে এবং পাকিস্তানি ননবেঙ্গলি সৈন্যের সংখ্যা যখন বাঙালি সৈন্য সংখ্যার চাইতে বহুগুণ বেশি বৃদ্ধি হয় কেবল তখনই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের আক্রমণ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করলে রাস্তাঘাত বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেছেন। যার যা আছে তাই নিয়ে মোকাবেলা করার কথা বলেছেন। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেছেন। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে টাকা-পয়সা পাঠানো বন্ধ করেছেন।

ফলে পাকিস্তান ৭ই মার্চ থেকে তৎকালীন ঢাকা—তেজগাঁও বিমান বন্দর দিনরাত ২৪ ঘন্টা শুধু সৈন্য আনার কাজে ব্যবহার করেছে।

পাকিস্তান আমাদের দেশ থেকে ১২ হাজার মাইল দূরবর্তী একটি দেশ। শুধু দূরত্বটাই মুখ্য নয়। আমাদের বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের ঠিক পুরোপুরি মাঝখানে রয়েছে পাকিস্তানের চির শত্রুদেশ ভারত। এই মাঝখানের শত্রু ভাবাপন্ন বিশাল ভারত টপকে পাকিস্তানিদের বাংলাদেশে আসা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। প্রশ্নই ওঠে না। ভৌগলিক কারণেই অতি সহজে স্বল্প সময়ে স্বল্প প্রাণহানিতে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়া খুবই সম্ভব ছিল, উচিত ছিল। এমন হওয়াও বিচিত্র ছিল না যে,

বিনাযুদ্ধে, বিনা রক্তপাতেই আমাদের দেশ স্বাধীন হতো। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার জন্য কার্যকরি ব্যবস্থা না নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক পাকিস্তানিদের দীর্ঘ সময় দেয়ার কারণেই আমাদের স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হলো (ত্রিশ লক্ষ শহীদ এর এই সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন আছে)। দুই লক্ষ মা-বোনদের ইজ্জতও দিতে হলো (এই দুই লক্ষ বীরাঙ্গনাদের সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন আছে)। আসলে শেখ মুজিবর রহমান মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অথবা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র তিনি চাননি। পাকিস্তানিরা আমাদের উপর স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞের ফলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করতে বাধ্য হই। অর্থাৎ পাকিস্তানিরাই আমাদের স্বাধীন হতে বাধ্য করেছে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কাছে যে ৪টি দাবি করেছিলেন —

(১) সামরিক আইন মার্শাল 'ল' তুলে নিতে হবে,

(২) সমস্ত সেনাবাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে,

(৩) যেসব হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে এবং

(৪) জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করতে হবে।

এই দাবিগুলো যদি পাকিস্তানিরা মেনে নিত তাহলে কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ করতে হতো? পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ হতো? কবি নির্মলেন্দু গুণের মতে শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের দাবি পাকিস্তান যদি মেনে নিত তাহলে আর যাই হোক, এই যাত্রায় বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতা। পাকিস্তানিরা যদি শেখ মুজিবকে নির্বাচিত নেতা হিসেবে ক্ষমতা দিতো, যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে তো আমরা নিশ্চয়ই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হতাম না, বা বঙ্গবন্ধুও তা চাইতেন না। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বাঙালি জনপ্রতিনিধিদের কাছে পাকিস্তান সামরিক শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং বাঙালি জনপ্রতিনিধিরা পাকিস্তান সরকার পরিচালনা করবেন এই তো ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রকৃত কথা। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙালি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা পাকিস্তান শাসন করবে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মূলমন্ত্র। ঘটনা প্রবাহের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের শেষ ব্যক্তি, যিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।

ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের ছিল পূর্ণ আনুগত্য। পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, পাকিস্তান টুকরো হয়ে যাক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কখনোই তা চাননি। আর চাননি বলেই প্রয়োজনীয় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির জন্য কোনো বাস্তব কার্যকর ভূমিকা নেননি।

শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ হলো ট্রিমেনডাস কন্ডিশন্যাল স্পিচ। যে ভাষণে পাকিস্তান রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে শেখ মুজিবর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্ত দেয়া হয়েছিল। আবার ক্ষমতা না দেয়া হলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সতর্ক হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ভাষণ ছিল বিশ্ব ইতিহাসে অদ্বিতীয় এক অনন্য ঐতিহাসিক ভাষণ, যে ভাষণে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।

সেই কারণেই আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ বা দিন এবং স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে চির বিতর্ক।

আমরা ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি তার মূল কারণ হলো, ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত বারটার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির উপর পৈচাশিক আক্রমণ ও গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৫শে মার্চ দিবাগত গভীর রাত অর্থাৎ ঘড়ির সময় অনুযায়ী তা ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহর ধরা হয় বলেই ২৬শে মার্চকে আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি সৈনিকদের আক্রমণ আর ঘড়ির সময় হিসেবে নিয়েই ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস ধরা হয়। এই হিসেবে বলি পাকিস্তানিরা আমাদের ২৬শে মার্চের আগে অথবা পরে যে কোনো দিন আক্রমণ করতো তাহলে সেই দিনটিই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হতো।

সত্যি কথা বলতে কি, কেউই সঠিক সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। যদিও বলা হয়ে থাকে ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর টেলিগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু টেলিগ্রামের ঐ ঘোষণার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। টেলিগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাটি তখনকার সময়ের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কেউ পেয়েছে বা শুনেছে আজ পর্যন্ত এমন দাবি কেউ করেনি।

২৩শে মার্চ হলো পাকিস্তান দিবস। এই ২৩শে মার্চে পাকিস্তান দিবসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) সহ সাড়া পাকিস্তানের সকল সরকারি-বেসরকারি পতাকা তোলা হতো। শহরের রাস্তাগুলো পাকিস্তানি পতাকা দিয়ে সাজানো হতো এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৩শে মার্চ

পাকিস্তান দিবস পালন করা হতো। কিন্তু '৭১–এর ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) কোথাও, কোনো সরকারি বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানি পতাকা তো উড়ানো হয়নি বরং জনগণ স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি ভবনে, প্রতিটি বাড়িঘরে, রাস্তাঘাটে, গ্রামবাংলার গাছে গাছে এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসভবনে সবুজের মাঝে লাল বৃত্তের উপর হলুদ রঙের মানচিত্র খঁচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের যবনিকাপাত ঘটালো। পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানি পতাকা উড়ল না। পাকিস্তানি সৈন্যরা কুঁচকাওয়াজ করল না। পাকিস্তানের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বীকৃত পন্থায় সোজাসুজি স্পষ্ট করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। কি এক অজ্ঞাত কারণে শেখ মুজিবর রহমান মুখ খোলেননি, নীরব ছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ রাজনৈতিক দ্বায়িত্ব কেবলমাত্র শেখ মুজিবকেই বাঙালি জাতি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান জাতি কর্তৃক প্রদত্ত রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।

ঐ পরিস্থিতিতে অন্য কারো পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। কেননা শেখ মুজিব ছিলেন বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তবে পাকিস্তানিরা ভয়, লোভ কোনোকিছুর বিনিময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা চান না এই রকম কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। যদি শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার বিপক্ষে কোনো কথা বলতেন, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়া ডিফিক্যাল হয়ে যেত।

অপরদিকে ২৭শে মার্চ প্রত্যুষে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান দুই রকম স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। মেজর জিয়াউর রহমান প্রথম ঘোষণা দেন, **"আই অ্যাম মেজর জিয়া প্রেসিডেন্ট পিপুলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, আই ডিক্লেয়ার ইনডিপেন্ট অব বাংলাদেশ।"**

মেজর জিয়াউর রহমান দ্বিতীয়বার ঘোষণা দেন, **"আই অ্যাম মেজর জিয়া, আই ডিক্লেয়ার ইনডিপেন্ড অব বাংলাদেশ অন বিহাব আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবর রহমান।"**

মেজর জিয়াউর রহমান বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল) পুলিশ এবং জনতাকে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরার আহ্বান জানান এবং সাড়া দুনিয়ার কাছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহায্যের আবেদন জানান। যদিও জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চ সকালে এই ঘোষণা দেয়ার আগেই ২৫শে মার্চ দিবাগত গভীর রাতে অর্থাৎ ঘড়ির সময় অনুযায়ী ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরেই ঢাকাতে ইপিআর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল) এবং পুলিশ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং ঢাকার

পিলখানায় ইপিআর হেড কোয়ার্টারে আক্রমণ করলে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল (আজকের বিডিআর) এবং পুলিশ পাকিস্তানিদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পাল্টা আক্রমণ করে। এবং আমরা ছাত্রজনতা ঐ রাতেই ঢাকার বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশের রাইফেল এনে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু আমাদের রাইফেল চালানোর (ট্রেনিং) প্রশিক্ষণ না থাকায় আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঐ রাতে যুদ্ধ শুরু করতে পারিনি। ইপিআর ও পুলিশের ঐ রাতের যুদ্ধটা ছিল মূলতঃ আত্মরক্ষার্থে। কারো কোনো প্রকার নির্দেশ বা ঘোষণা ছাড়াই ইপিআর ও পুলিশ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ২৫শে মার্চ দিবাগত গভীর রাতেই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। তারপরও বলা চলে মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চের সকালের স্বাধীনতা ঘোষণায় মুক্তি পাগল গোটা জাতি ভীষণভাবে আশান্বিত হয়েছিল, অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বিশেষ করে যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করার জন্য মানসিকভাবে চূড়ান্ত প্রস্তুত হয়েছিল তাদের মধ্যে জিয়াউর রহমানের এই ঘোষণা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার কোনোরূপ চেষ্টা না করেই পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হন। অজ্ঞাত কারণে তিনি কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই পাকিস্তানিতের হাতে বন্দী হন বলে অনুমান করা হয়।

২৭শে মার্চ থেকে ঢাকার বাসিন্দারা দিশেহারা হয়ে লক্ষ লক্ষ নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পিপড়ার সারির মতো ঢাকা শহর ছেড়ে পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে চলে যায়। শহর ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষের এই কাফেলাকে একমাত্র রোজ কেয়ামতের কাফেলার সাথেই তুলনা করা চলে। সবুজ গ্রাম আর গ্রামের মেঠো পথ ভরে ওঠে শহর ফেলে পালিয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষে।

শহর থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্রামের কৃষক-কৃষাণী নিজের সন্তানের মতো তাদের বুকে ঠাঁই দেয়। গ্রামের মানুষ রাস্তায়, পথে-মাঠে-ঘাটে চিড়া, গুড়, মুড়ি, ডাব যা কিছু সহায় সম্বল ছিল তার সবটুকুই উজাড় করে বাড়িয়ে দিয়েছে শহর থেকে আসা মানুষের সাহায্যে। শহর ছেড়ে পালিয়ে আসা মানুষের এতটুকু কষ্ট যেন না হয়, তার সব দায়িত্ব গ্রামবাসীর। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে দিন-রাত্রি ভাত রান্না হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ খাচ্ছে। কে খাচ্ছে? কার বাড়িতে খাচ্ছে আর যারা খাওয়াচ্ছে তারাও জানে না কাদের খাওয়াচ্ছে। মানুষে মানুষে এ এক মহামিলন, এক মহা ভ্রাতৃত্ব। কখনো পৃথিবীতে এমন হয়েছে কিনা, কিংবা আর হবে কিনা জানি না। মানুষ মানুষের এত আপন! নিজের চাইতে মূল্যবান অপরজন! এ দৃশ্য যারা দেখেনি তারা কোনোদিন বুঝবে না। তাদের কোনোদিন বোঝানো যাবে না। পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা নেই, শব্দ নেই, এমন কোনো লেখক নেই যে লেখক ঐ সময়ের মানুষে মানুষে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব সহমর্মিতা আর নিজের চাইতে অপরকে বেশি ভালবাসার চিত্র

তুলে ধরতে পারবে। ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মুকসুদপুর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। কত নদী পার হয়েছি। পার হয়েছি পদ্মা নদী। পাঁচ দিন-পাঁচ রাত্রি পথ চলেছি, তারপর গ্রামের বাড়ি এসেছি। একটি পয়সাও ধার হয়নি। কোথায়ও একটি পয়সা লাগেনি। গ্রামের মানুষ খাইয়েছে। নৌকার মাঝি নদী পার করে দিয়েছে। বিনা পয়সায় খাওয়ানো, থাকতে দেয়া, নদী পার করে দেয়া, এ যেন গ্রামের মানুষের মহা পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব ছিল। হাঁটতে হাঁটতে পথিমধ্যে কত গর্ভবতী মা-বোন সন্তান প্রসব করেছে। আর গ্রামের মা-বোনেরা তার সেবার ভার তুলে নিয়েছে আপন করে।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, এবার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পালা। কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায়, মুক্তিযুদ্ধ করা যায়? ১৭ই এপ্রিল আকাশবাণী কলকাতা থেকে বারবার ঘোষণা এসেছে, আজ রাত আটটার পর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। রাত আটটার আকাশবাণী কলকাতা বেতারের বাংলা খবরে বলা হলো সংবাদের পর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।

দেশাত্মবোধক গান দিয়ে শুরু হলো অনুষ্ঠান। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এবং বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দিন এবং শ্রেষ্ঠ ঘটনাটির কথা। আজ ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে জননেতা তাজউদ্দিন আহম্মেদ এর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের কথা জানানো হলো। মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার নাম ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষর দিয়ে নতুন করে রাখা হলো মুজিবনগর এবং এই মুজিবনগরেই তাজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে শপথ নিল বাংলাদেশের প্রথম এবং বিপ্লবী সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে করা হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং তার অনুপস্থিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহম্মেদকে করা হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভাও গঠিত হলো। জেনারেল ওসমানীকে করা হলো প্রধান সেনাপতি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি সকলের শপথ অনুষ্ঠানও হলো এই মুজিবনগরে। এখানেই প্রবাসী সরকারকে গার্ড অব অনার দেয়া হলো। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের নতুন যাত্রা। বাঙালির ইতিহাসে সংযোজিত হলো নতুন অধ্যায়ের। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সুসংগঠিত হলো। আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিল। আমরা যারা মুক্তি পাগল কিশোর, তরুণ, যুবক আমরা ভারতে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ (আর্মি ট্রেনিং) নিলাম এবং মুক্তিযোদ্ধা হলাম। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার আগে শুধু ভাবতাম কবে মুক্তিযোদ্ধা হব? কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা হব। ভাবতে ভাবতে গ্রামের বাড়ি থেকে আবার ঢাকায় এলাম। এই ঢাকায়ই আমি জন্মেছি। শিশু থেকে কিশোর হয়েছি। এখানেই আমার সব বন্ধু-বান্ধব। গ্রামের বাড়িতে আমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই।

মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য অন্তত একজন বন্ধু তো খুবই দরকার। কাজেই আবার শত্রুর প্রধানঘাটি ঢাকায় চলে এলাম। প্রতিদিন ভাবি মুক্তিযুদ্ধে যাব। কিন্তু রাতে শুধু মা'র কথা মনে হয়। মনে হয় আমি যুদ্ধে চলে গেলে মা শুধু কাঁদবেন। আমার জন্য মা অনেক কষ্ট পাবেন, অনেক কাঁদবেন। আমার আর কোনো পিছুটান নেই, শুধু মা। আব্বার কথা আমি মোটেও ভাবি না। মা'র জন্যই মনটা আমার কেমন হয়ে যায়। কেমন জানি সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এভাবে ভাবতে ভাবতে কয়েক দিন চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনটা আমার অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু মাকেও ছাড়তে পারি না, মুক্তিযুদ্ধেও যাওয়া হয় না।

একদিন আমার মনে হলো, সব ছেলেরই তো মা আছে। ছেলে যুদ্ধে গেলে মা তো কাঁদবেই। মা'র কান্নার কথা ভেবে ছেলে যদি মুক্তিযুদ্ধে না যায়, তাহলে তো মুক্তিযুদ্ধ হবে না। দেশও স্বাধীন হবে না। না, মা কাঁদে কাঁদুক, আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে। পরের দিনই পাশের বাড়ির আমার একবন্ধু বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড়, নাম তার বাবুল আজাদ – তাকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা বলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গেই বাবুল আজাদ খুশিতে রাজি হয়ে গেল। বলল আমি তো এই রকমই ভাবছিলাম এবং এই রকম একজন বন্ধুই খুঁজছিলাম।

তারপর প্লান-প্রোগ্রাম করে একদিন খুব ভোরে দু'জনে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

আমরা দু'বন্ধু গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে একটি বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। শ'খানেক পুরুষ-মহিলা-শিশু আগে থেকেই নদী পার হওয়ার জন্য এই বাড়িতে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে। বাড়ির নদী ঘাটে ছোট একটি ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা আছে। এই ছোট নৌকাটিতে আট দশজনের বেশি লোক একসঙ্গে পার হওয়া যাবে না। এই বাড়ির কোনো মানুষ এখানে নেই। শুধু কয়েকটি লাশ পঁচে গলে পড়ে আছে। আর এই যে শ'খানেক মানুষ, এরা সবাই শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য এখানে জড়ো হয়ে আছে। সন্ধ্যার পর নৌকার মাঝি এসে নদী পার করে দেবে সেই অপেক্ষায় আছে। নদীতে পাক সেনারা গানবোট নিয়ে ঘাঁটি করেছে। দিনের বেলায় নদী পার হতে গেলে দেখা যাবে এবং আর্মিরা গুলি করে মেরে ফেলবে। তাই রাতের অপেক্ষায় আছে সবাই। রাতের অন্ধকারে নদী পার হতে হবে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বেশ গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ নদীতে পাকিস্তানি আর্মির গান বোটের সার্চ লাইটের আলো দেখা গেল। এই দিকেই আসছে গান বোটটা। চাপা কান্না শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ বলছে কাইন্দেন না ভাই, কাইন্দেন না, আল্লাহরে ডাকেন।

গান বোটটা দ্রুত এই দিকে ছুটে আসছে। সবাই মৃত্যু ভয়ে চুপসে গেল, কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু গানবোটের আওয়াজ আর সার্চ লাইটের আলো। আমরা

সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম যাতে গানবোটের সার্চ লাইটের আলোতে যেন দেখা না যায়। বুকের ভেতর ভয়। তার উপর মানুষের পঁচা লাশের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দিন চারেক আগে পাকিস্তানি হানাদাররা এই বাড়িতে হানা দিয়ে এই মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারো মুখেই কোনো শব্দ নেই। অন্তরে শুধু আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) আর ভগবানের নাম। গানবোট যতই এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে মৃত্যু ততই এগিয়ে আসছে। মৃত্যু এখন শুধু কয়েক মিনিটের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সবাইকে বললাম, কেউ শোয়া থেকে উঠবেন না, নড়াচড়াও করবেন না, কোনো কথা বলবেন না। সবাই মাটিতে যেভাবে শুয়ে আছেন ঠিক এইভাবেই থাকবেন। কোনো প্রকার চিৎকার বা ছোটাছুটি মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। আল্লাহ পাক যদি সহায় হোন তাহলে আমরা এভাবেই বেঁচে যাব। এছাড়া আমাদের আর বাঁচার কোনোই পথ নেই সবাই সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন।

গানবোট একেবারে বাড়ির পাশে এসে পড়ল। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় আলোকিত হলো সাড়াবাড়ি। বাড়ির আঙ্গিনায় কাপড় শুকানোর যে দড়ি বাঁধা ছিল তাও স্পষ্ট দেখা গেল। গানবোটটি যত দ্রুত এসেছিল তত দ্রুতই চলে গেল। থামল না। একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই যেন নতুন জীবন নিয়ে বেঁচে উঠল। কিছুক্ষণ পর নৌকার মাঝি এলো। কার আগে কে যাবে, এক সঙ্গে লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়ল। যা হবার তাই হলো। তীরেই নৌকা ডুবে গেল। নৌকা তুলে পানি ফেলে মাত্র ভাসানো হলো, সঙ্গে সঙ্গে আবারও সবাই নৌকায় লাফিয়ে উঠল। পানি সেচে নৌকা আবার ভাসানো হলো। আবারও সবাই একসঙ্গে উঠতে গিয়ে ডুবিয়ে দিলো নৌকা। শিশু আর মহিলারা কাঁদতে শুরু করল। আমি আর আমার বন্ধু বাবুল আজাদ উচ্চ কণ্ঠে ধমকের সুরে বললাম, আমরা দু'জন সবার শেষে যাব। একজনও বাকি থাকতে আমরা যাব না। সবাই নদী পার হওয়ার পর আমরা পার হব। কে কে আমাদের সঙ্গে নদী পার হবেন?

কেউই কোনো কথা বলল না। সকলেই চুপ।

আমরা কথা দিলাম সবাই আগে যাবেন – আমাদের আগে যাবেন। আমরা যাকে বলব সেই নৌকায় উঠবেন। নইলে নৌকা আর তুলব না, সবাই একসঙ্গে মারা পড়ব। জনাকয়েক বলে উঠল ঠিক আছে, আপনারাই ঠিক করে দেবেন কে কখন উঠবে। কেউ কেউ বলে উঠল আবার নিজেরাই আমাদের ফেলে চলে যেয়েন না।

বললাম, দেখতেই তো পাবেন যাই কিনা। কাউকেই ফেলে আমরা যাব না। আমাদের কথা শোনেন, সবাই নদী পার হতে পারবেন এবং আমাদের আগে পার হবেন।

আবার নৌকা তুলে পানি ফেলে নৌকা জাগালাম। ডান দিক থেকে এক এক করে নয়জন করে নৌকায় তুললাম। নৌকা ছেড়ে গেল নামিয়ে দিয়ে আবার নৌকা ফিরে এলো শেষ ট্রিপ–এ আমরা দু'জনসহ পাঁচজন নৌকায় উঠে নদী পার হলাম।

সীমান্তের কাছাকছি বাতেন ভাই নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত্রি কাটানোর পর সকাল বেলায় আমার বন্ধু বাবুল আজাদ কান্না জুড়ে দিলো। সে ঢাকায় ফিরে আসবে। আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। বাবুল আজাদ কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকল, রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, মা বলছে ফিরে আয়। রিম্মিকে স্বপ্ন দেখেছি। রিম্মি হলো বাবুল আজাদ আর আমার বাসার ঠিক উল্টো দিকের বাসার মস্ত বড় এক ধনী লোকের মেয়ে। বাবুল আজাদের প্রেমিকা, খুবই ভালো মেয়ে। সবদিক দিয়েই ভালো। আচার-ব্যবহার অমায়িক, দেখতে সুন্দরী, ভালো ছাত্রী, সবার প্রিয়। (*বেচারা রিম্মির অকাল মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি রিম্মি যেন বেহেস্তে যান।*) বাবুল আজাদ বলল, স্বপ্নের ভিতর রিম্মি আমাকে বলছে, বাবুল তুমি যুদ্ধে যেও না। তুমি মরে গেলে আমি কাকে ভালোবাসবো? তুমি ছাড়া আমি কাউকে ভালোবাসতে পারব না। তুমি ফিরে এসো, নইলে আমাকেও নিয়ে যাও। ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে বলতে সে কি কান্না বাবুল আজাদের। আমার কাছে বাবুলের দাবি, চল আমরা ঘরে ফিরে যাই।

কান্না যখন কিছুতেই থামাতে পারলাম না, তখন বললাম তুই ফিরে যা। আমি ফিরে যাব না। আমি যুদ্ধে যাব।

বাবুলের উত্তর আমি তোকে ফেলে একা ফিরে যাব না। চল দু'জনেই ফিরে যাই।

না, আমি ফিরে যাব না, তুই ফিরে যা।

না, আমি তোকে ছাড়া ফিরে যাব না।

বাবুল আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে, আমি ফিরে আসব না। বাবুলের কান্না থামে না। এক পর্যায়ে বললাম, সীমান্তের কাছেই তো চলে এসেছি, চল আর একটু সামনে গিয়ে দেখি কী হচ্ছে। তারপর ফিরে আসব।

এবার বাবুল আজাদ রাজি হলো। কান্না থামাল। আমরা এবার সীমান্ত লক্ষ করে চলতে শুরু করলাম। যতই সীমান্তের কাছে যাচ্ছি ততই বেশি করে গোলাগুলি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অনেক চড়াই-উৎড়াই পার হয়ে দু'বন্ধু মিলে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগড়তলায় গিয়ে পৌঁছুলাম। পথের অনেক কাহিনী, সব লিখলে ফুরাবে না। ভারতের যে জায়গায় আমরা গিয়ে উঠলাম, সে জায়গাটা বেশ উঁচু পাহাড়ের মতো। তবে পাহাড় না। এই জায়গায় উঠেই দেখি খাকি পোশাক পড়া চার-পাঁচজন আর্মি একটি বাংকারে দাঁড়িয়ে আছে এবং আরো সাত-আটজন আর্মি

দাঁড়িয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। দেখেই তো আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল! এ আমি কোথায় এলাম, যে আর্মির ভয়ে সারা পথ কত কষ্ট করে এলাম আর এখানে এসে সেই আর্মির একেবারে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম! ভয়ে আমি হিম হয়ে গেলাম। কিছু সময় জ্ঞানশূন্য থাকলাম। তারপর ধীরে ধীরে তাকিয়ে দেখলাম জনগণের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই; সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। আমি ভীষণ অবাক হলাম – স্বপ্ন দেখছি না তো? পরে বুঝলাম, ও এটা তো ভারত! এরা ভারতীয় আর্মি। পৃথিবীর সব দেশের আর্মির পোশাকই যে এক এটা আমার জানা ছিল না।

আমরা শরণার্থী ক্যাম্পে বা শিবিরে না গিয়ে সোজা কলেজ টিলায় চলে গেলাম। কলেজ টিলা মানে আগড়তলা এমবিবি কলেজ ক্যাম্পাস। এই কলেজ টিলাতেই বাংলাদেশের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র নেতারা থাকেন। এখানেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিস। শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, দৈনিক বাংলার বাণী ও দৈনিক টাইমস পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগ্নে। ১৯৭৫–এর ১৫ই আগষ্টে শেখ মনিকেও হত্যা করা হয়।) আ, স, ম রব (ডাকসুর ভিপি, জাসদ–এর সাধারণ সম্পাদক, হুসাইন মোহম্মদ এরশাদ–এর ১৯৮৮ সালে পার্লামেন্টের গৃহপালিত বিরোধী দলীয় নেতা। সম্মিলিত ওয়াচ ডগ, শেখ হাসিনার ঐক্যমতের সরকারের মন্ত্রী।)

আব্দুল কুদ্দুস মাখন (১৯৭০–১৯৭১–এর ঢাকসুর ছাত্র সংসদের জি এস, ১৯৯০ দশকে মারা যান এবং মীরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মুক্তিযোদ্ধা কবরস্থানে দাফন হয়) এম, এ, রশিদ (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠকারী, স্বাধীনের পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে ব্যবসায়ী)। শেখ ফজলুল করিব সেলিম (প্রাক্তন ছাত্র নেতা, শেখ মনির সহদর, বর্তমানে দৈনিক বাংলার বাণীর সম্পাদক, যুবলীগের চেয়ারম্যান, জাতীয় সংসদ সদস্য)। মিজানুর রহমান মিজান (প্রাক্তন ছাত্রনেতা, আব্দুল কুদ্দুস মাখন–এর ভগ্নিপতি, বর্তমানে ঢাকা জেলার এডিসি ল্যান্ড) প্রমুখ এর তত্ত্বাবধানে কলেজটিলা থেকে বাংলাদেশের ছাত্রদের তালিকাভুক্ত (রিক্রুট) করে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠানো হতো।

এই কলেজ টিলাতে গিয়ে আমরা মনি ভাই, মাখন ভাই, রশিদ ভাই এবং মিজান ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। নেতারা বললেন যতদিন ট্রেনিং–এ যাওয়া না হয় এখানে থাক। আমরা সারাদিন আগড়তলায় ঘুরে বেড়াই, রাতে কলেজ টিলায় ঘুমাই। এমনি করে প্রায় মাসখানেক চলে গেল। আমরা সঙ্গে করে বাড়ি থেকে যে টাকা–পয়সা এনেছিলাম তা শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এদিকে ট্রেনিং–এ

যেতে আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় বন্ধু বাবুল আজাদ একদিন বলল, দোস্ত তুমি থাক, আমি ঢাকায় যাই, গিয়ে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাবুলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম, না ট্রেনিং এ যতদিন না যাই ততদিন খেয়ে না খেয়ে কষ্ট করতে থাকি।

খাওয়ার দারুণ কষ্টে পড়ে গেলাম। দিনে একমুঠো ভাত পাইতো পাই না অবস্থা। আর বাবুলের প্রতিদিন একই কথা – তুই থাক আমি ঢাকায় যাই, ট্যাকা–পয়সা নিয়ে আসি।

আমি বলি, না তুই ঢাকা ফিরে গেলে আর আসবি না।

বাবুল আমাকে বুঝায়, দেখ দোস্ত, আমি যদি এখান থেকে চলে যেতে চাই, তাহলে কি চলে যেতে পারি না? তুই কি আমাকে আটকিয়ে রেখেছিস? আমি চলে যেতে চাইলে তো যে কোনো সময় চলে যেতে পারি, তোকে বলে যাওয়ার দরকার কী? আমি এই জন্যই তোকে বলে যেতে চাই যাতে তুই মন খারাপ না করিস। তুই বিশ্বাস কর, আমি কথা দিলাম ঠিকই ঢাকায় গিয়ে মা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবার তোর কাছে ফিরে আসব।

আমি বাবুলের কথা বিশ্বাস করলাম না।

যে ছেলে বাংলাদেশে থাকতেই রাস্তা থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল, সেই ছেলে একা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ঢাকার বাড়িতে ফিরে গিয়ে টাকা নিয়ে আবার আগড়তলায় আমার কাছে ফিরে আসবে! এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে চিন্তা করলাম বাবুল যে কোনো মুহূর্তেই সত্যিই আমাকে না জানিয়ে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে। ওকে ধরে রাখার কোনো উপায় আমার নেই। না বলে পালিয়ে যাবে তার চাইতে আমিই বাবুলকে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেই। সেই ভালো। আমি বাবুল আজাদকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। দু'বন্ধু সীমান্তে এলাম, একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরলাম।

অশ্রুসজল চোখে আমি বাবুল আজাদকে বিদায় দিলাম। মনে হলো যেন আর দেখা হবে না। এ দেখাই শেষ দেখা। বিদায়ের বেলায় শুধু বললাম, আমার মাকে শান্তনা দিস।

আমি টিলার উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনে সমতল ভূমি, বাংলাদেশ। বাবুল ধীরে ধীরে বাংলাদেশে নেমে গেল। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বাবুলের যাওয়ার দিকে। দৃষ্টিতে যতদূর দেখা যায় বাবুল আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এক সময় দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল বাবুল আজাদ। টিলার উপর ঐ একই স্থানে কতক্ষণ নির্বাক, পলকহীন, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। ভারতীয় এক শিখ সৈন্যের স্পর্শে সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। একাকী বিষণ্ন মনে কলেজ টিলায়

ফিরে এলাম। নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো। সারারাত ঘুম হলো না। রাতভর শুধু মনকে শক্ত করলাম। দেখতে দেখতে সপ্তাখানেক পার হয়ে গেল। শুনলাম কলেজ টিলায় আমরা যারা আছি তাদের খুব তাড়াতাড়ি ট্রেনিং–এ পাঠিয়ে দেয়া হবে। শুনে মনটা ভালো লাগল। মুক্তিযোদ্ধা হব। দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করব। বাবুল আজাদের কথা মনে হলো। বাবুল আজাদ আর আসবে না, জানি। তবুও যদি আসে, আমাকে পাবে না। এসে দেখবে আমি ট্রেনিং–এ চলে গেছি। আমার সাথে বাবুল আজাদের আর দেখা হবে না। যদি বেঁচে থাকি, বাবুলও যদি বেঁচে থাকে, দেশ স্বাধীন হলে হয়ত দেখা হবে। মিজানুর রহমান মিজান ভাই খুব অমায়িক লোক। আমাকে ডেকে বললেন, রেন্টু তৈরি হও, দুই-চারদিনের মধ্যেই ট্রেনিং–এ যাবে। তুমি ছোট তো তাই একটু ঝামেলা হবে। তোমাকে ছোট বলে ট্রেনিং–এ নিতে চাইবে না। তুমি চিন্তা করো না। আমি সব ঠিক করে দেবো। মিজান ভাই-ই ট্রেনিং–এর লিস্টটা লিখে। তাই খুব একটা ঘাবড়ালাম না। বাবুল চলে গেছে বেশ কয়েক দিন হয়ে গেল। মনের গভীরে নিজের অজান্তেই ক্ষীণ আশা। এখনো বাবুল এলো না? আগামী পরশুদিন সকাল সাতটায় আমি ট্রেনিং–এ চলে যাব। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মাগরিবের নামাজের সালাম ফেরাতেই দেখি, বাবুল আজাদ বলছে, রেন্টু আমি আইসা পরছি!

আমি স্বপ্ন দেখছি! না, ঠিক দেখছি, কিছুক্ষণ বুঝে উঠতে পারলাম না। সত্যি সত্যিই বাবুল আজাদ এসেছে (ব্রিগেডিয়ার আমীন আহাম্মেদ চৌধুরী ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার–এর কাছ থেকে ১৯৭১–এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮৮/১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দপ্তরে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত হয়, ভারতীয় সেই তালিকার ১নং ভলিউম–এর ৪৬১ নং "মোঃ বাবুল হোসেন এর ডাকনাম হলো বাবুল আজাদ)। শুধু একা বাবুল আজাদ আসেনি। সঙ্গে আবার মনির নামে একজনকে নিয়ে এসেছে (ব্রিগেডিয়ার আমীন আহাম্মেদ চৌধুরী ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার–এর কাছ থেকে ১৯৭১–এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেনানিবাস (ক্যান্টনম্যান্ট) ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৮/১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দপ্তরে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত হয়, ভারতীয় সেই তালিকার ১নং ভলিউম–এর ৪৬৬ নং "মোঃ আব্দুল হালিম সিদ্দিক, পিতাঃ মোঃ সুবেদ আলী ৫৩ নং বি, কে দাস রোড ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।" মোঃ আব্দুল হালিম সিদ্দিক এর ডাকনাম হলো মনির। বর্তমানে মনির সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করে)। মনির আমাদের পাড়ার ছেলে। আমি অবশ্য মনিরকে এর আগে চিনতাম না। এই প্রথম দেখলাম

মনিরকে। মিজান ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললাম, আমার দু'বন্ধু ছাড়া আমি ট্রেনিং–এ যাব না। যে করেই হোক বাবুল আজাদ ও মনিরকে আমার সাথে ট্রেনিং–এ পাঠাতেই হবে।

পরের দিন সকালেই মনির বলল, ওর বড় ভাই মন্টু ভাই আগড়তলাতেই কোথাও আছে।

ছুটলাম মনিরের বড় ভাই মন্টু ভাইয়ের সন্ধানে। খুঁজে বের করলাম মন্টু ভাইকে। মন্টু ভাই ট্রেনিং শেষ করে অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে যুদ্ধে যাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। মন্টু ভাইয়ের কাছেই শুনলাম আমার সেজো ভাই ঢাকা কায়েদে আজম (বর্তমান শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী) কলেজ ছাত্র সংসদের জি এস, মজিবুর রহমান মন্টু ট্রেনিং শেষ করে অনেক আগেই ঢাকায় অপারেশনে চলে গেছে। কলেজ টিলায় ফিরে এসে দেখা হলো শহীদ ভাইয়ের সাথে। শহীদ ভাই আমার সেজো ভাই মজিবুর রহমান মন্টুর বন্ধু এবং কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের এজিএস।

শহীদ ভাই আমাদের পরে যাবে টেন্ডুয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য। মিজান ভাইয়ের বদৌলতে পরের দিন সকালে আমরা তিন বন্ধু একটা মিলেটারি লরিতে উঠে বসলাম অন্যান্যদের সাথে। মিলেটারি লরিতে ওঠার আগে তিন চার জায়গায় আমাদের নাম লেখা হলো এবং আমাদের স্বাক্ষর নেয়া হলো। সামরিক লরি আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করল, সন্ধ্যা নাগাদ লেম্বুচোরা নামক ট্রেনিং ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। এই লেম্বুচোরা ট্রেনিং ক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর কে, বি, সিং এবং মেজর আর, পি শর্মার অধীনে একমাস সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ২নং সেক্টরের সদর দপ্তর মেলাঘর থেকে অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশারফকে লেঃ কর্নেল পদে পদোন্নতি দিয়ে তাঁর নামের ইংরেজি প্রথম অক্ষর K অনুসারে গড়ে তোলা হয় K ফোর্স। এবং এই K ফোর্সের অধিনায়ক হন খালেদ মোশারফ। তখন ২নং সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন থেকে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া মেজর হায়দার। খুব সম্ভবত খালেদ মোশারফ যখন ২নং সেক্টর কমান্ডার তখন হায়দার ২নং সেক্টরের টুআইসি ছিলেন।

আমরা যারা ভারতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছি, আমাদের প্রশিক্ষণকালে অসংখ্যবার অসংখ্য জায়গায় আমাদের নাম, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, কতজন ভাই, কতজন বোন, তাদের নাম ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং স্বাক্ষর নেয়া হয়। এই জাতীয় বায়োডাটা দিতে গিয়ে আমরা বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভারত সরকার যদি প্রয়োজন মনে করে ঐ তালিকা ধরে এখনোও আমাদের খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে। একমাত্র কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এর

কাদেরিয়া বাহিনী ছাড়া আমরা যারা ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছি – এই মুক্তিযোদ্ধারাই মূল মুক্তিযোদ্ধা বা প্রথম মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধারাই দেশে এসে ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং দিয়ে আরো মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করে। অর্থাৎ ভারতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের থেকেই জন্ম নেয় দেশীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। এই হলো ইন্ডিয়ান ট্রেইন্ড এবং লোকাল ট্রেইন্ড মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এদেশের আপামর জনতা যোগ হয়ে হলো মুক্তিবাহিনী। যদি মুক্তিবাহিনী বলা হয় বা ধরা হয়, তাহলে কেবল মাত্র রাজাকার, আলবদর, আলশামস ব্যতীত সকল (সাড়ে সাত কোটি) বাঙালিই মুক্তিবাহিনী।

যেমন সেনাবাহিনী; সেনাবাহিনীর সকল সদস্যই যুদ্ধ করে না। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে ব্রিজ, কালভার্ট, পুল ইত্যাদি তৈরি করা। যুদ্ধ করা নয়। আবার সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর বা সিগল্যান কোর – এর সদস্যরা যুদ্ধ করে না। মেডিকেল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে আহত সৈনিকের চিকিৎসা করা, যুদ্ধ করা নয়।

সিগন্যাল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে সিগন্যাল দেয়া। যুদ্ধ করা নয়। সেনাবাহিনীর সাপ্লাই কোরের লোকেরা যুদ্ধ করে না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ, গোলাবারুদ, খাবার ইত্যাদি সকল কিছু সাপ্লাই করার বা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সাপ্লাই কোরের। সেনাবাহিনীর পদাতিক (ইনফিন্ট্রি), গোলন্দাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করা।

সেনাবাহিনীর পদাতিক (ইনফিন্ট্রি), গোলন্দাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের কাজ হচ্ছে শত্রুকে আক্রমণ করা বা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা। অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় যুদ্ধ করা। ইঞ্জিনিয়ারিং কোর, সিগন্যাল কোর, মেডিকেল কোর, সাপ্লাই কোর ইত্যাদি সকল কোর মিলেই হয় সেনাবাহিনী।

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকেরা ব্রিজ বা পুল না বানিয়ে দেয়, তাহলে সৈনিকেরা নদী পার হতে পারবে না। মেডিকেল কোর চিকিৎসা না করলে আহত সৈনিক সুস্থ হতে পারবে না। সিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দিলে সৈনিকেরা বুঝতে পারবে না। সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না দিলে সৈনিকেরা গোলাবারুদ পাবে না, খাবার পাবে না।

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর ব্রিজ তৈরি না করে, মেডিকেল কোর চিকিৎসা না দেয়, সিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দেয়, সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না দেয়, তাহলে কি পদাতিক বা গোলন্দাজ কোর যুদ্ধ করতে পারবে? না পারবে না। যুদ্ধ করতে হলে উল্লিখিত সকল কিছু চাই। এই সকল কিছু মিলেই হয় যুদ্ধ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও সকল কিছু মিলেই হয়েছে। যেমন নৌকার মাঝি মুক্তিযোদ্ধাদের নদী পার করে দিয়ে

ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের দায়িত্ব পালন করেছেন। গ্রাম্য ডাক্তার বা ঔষধের দোকানদার মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা করে মেডিকেল কোরের কাজ করেছেন। গ্রামের কৃষক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গতিবিধির খবর মুক্তিযোদ্ধাকে জানিয়ে সিগন্যাল কোরের ভূমিকা নিয়েছেন। গ্রামের মা ভাত রেধে খাইয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ অস্ত্র ও গুলির বোঝা মাথায় করে মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিয়ে সাপ্লাই কোরের কাজ করেছেন। তবেই না কেবল আমারা মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছি। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা পদাতিক বা গোলন্দাজ কোরের কাজ করেছি। গোটা সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, সিগন্যাল, সাপ্লাই ইত্যাদি কোরের কাজ করেছেন এবং এই সকল কোরের সমন্বয়ে অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা-জনতার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিবাহিনী।

কেবলমাত্র রাজাকার আলবদর ব্যতীত সকল বাঙালি মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানিরা অবশ্য এই সংজ্ঞাই বিশ্বাস করত, আর এই জন্যই তারা নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করেছে। নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করা ছাড়া পাকিস্তানি সৈনিকদের আর যা করার ছিল তা হলো আত্মসমর্পণ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থা ছিল দীপান্তরে বা নির্বাসনে আসা মানুষের মতো। নির্বাসনে বা দীপান্তরে আসা মানুষ থাকে নিরস্ত্র। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সৈনিকদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নিজ ভূখণ্ড পাকিস্তান থেকে ১২শত মাইল দূরে বাংলাদেশে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। পাকিস্তানি সমরবিদ ও রাজনীতিবিদরা মনে করেছিল তারা শুধু অস্ত্রের জোরে মানুষ খুন করেই বাংলাদেশ দীর্ঘদিন দখল করে রাখতে পারবে। কিন্তু যেই মাত্র নিরস্ত্র বাঙালি সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিল সঙ্গে সঙ্গে শুধু শহর অঞ্চল ছাড়া গোটা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিবাহিনীর কাছে। বাংলাদেশে আসা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে যে ধরনের অস্ত্র এবং যে পরিমাণ অস্ত্র ছিল তা দিয়ে কেবল নিরস্ত্র মানুষকে দীর্ঘদিন দাবিয়ে রাখা যেত ঠিকই, কিন্তু সশস্ত্র মানুষকে বেশি দিন দাবিয়ে রাখা কিছুতেই যেত না এবং ভারতে মতো একটি রাষ্ট্রের আক্রমণ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানিদের অস্ত্র ছিল সম্পূর্ণ অকার্যকর। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধা এবং এদেশের আপামর জনতা অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর দাপটে পাক হানাদাররা রাতের বেলায় চলাফেরা বন্ধ করে দিলো। তবে পাক হানাদাররা ঠাণ্ডা মাথায় একটা পরিকল্পনা দ্রুত চালিয়ে যেতে থাকল, তাহলো – এদেশের নারীদের ধর্ষণ করা। পাকিস্তানিদের নীল নকশাই ছিল এদেশের কিশোরী, যুবতী, রমণী নির্বিচারে ধর্ষণ করে তাদের পেটে পাকিস্তানিদের জারজ সন্তান তৈরি করা। বাঙালি নারীর গর্ভে পাকিস্তানি জারজ বংশধর বৃদ্ধি করা এবং পাকিস্তানি এই জারজদের দিয়ে বাংলাদেশকে চিরকাল দখল করে রাখা। পাকিস্তানিরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য গোলাম আযম, মতিউর

রহমান নিজামীদের মতো মুষ্টিমেয় হাতে গোনা কতিপয় ঘৃণিত ব্যক্তিকে তাদের দোসর হিসাবে পেল ঠিকই। কিন্তু গোটা বাঙালি জাতি পাকিস্তানিদের চিরদিনের জন্য উপড়ে ফেলার জন্য ছিল বদ্ধ পরিকর।

অপরদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এবং ভারতের জনগণ বাঙালির জন্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের সকল ধরনের সাহায্যের দূয়ার খুলে দিলো অকৃপণভাবে।

মুক্তিযুদ্ধের মাত্র নয় মাসের মাথায় ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ বেধে গেল। একদিকে মুক্তিযোদ্ধা জনগণ মিলে সাড়ে সাত কোটি মুক্তিবাহিনী, তার সাথে যোগ হলো ভারতীয় সেনাবাহিনী। মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী মিলেমিশে হলো মিত্রবাহিনী। ৬ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী সাড়াশি আক্রমণ শুরু করল। নির্বাসনে আসা দিশেহারা পাক হানাদার বাহিনী মাত্র দশ দিনের মাথায় ১৬ই ডিসেম্বরে অসহায় এর মতো পরাজয় বরণ করল। ছিয়ানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করল। এই আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিলে আত্মসমর্পণকারীদের পক্ষে পাকিস্তানিদের জেনারেল নিয়াজি স্বাক্ষর করেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা বিজয়ীদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তি পাগল মানুষ মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতার লাল সূর্য।

বাঙালি জাতি শসস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে আনল।

স্বাধীন দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, যার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বিপ্লবি সরকারের প্রধানমন্ত্রী বা মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহম্মেদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী হলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাঙালিরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অধীনে চাকরি করেছে ও পরাজিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সেই পরাজিত প্রশাসনকে পুনর্জিবীত করলেন ও দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। আর মুক্তিযোদ্ধারা কে কোথায় গেল তার কোনো খবর রাখলেন না। শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পূর্ণ সঠিক তালিকা থাকা সত্ত্বেও সেই তালিকা না এনে নানাজনকে দিয়ে নানা রকমের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট বিতরণ করলেন। আমার জানা মতে, ঐ মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট কোনো প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তো নেনইনি, বরং যারা রাজাকার ছিল, চরম

সুবিধাবাদী ছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধের ধার কাছ দিয়েও হাঁটেনি তারাই ঐ সকল মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং সার্টিফিকেট নিয়েছে।

একজন মুক্তিযোদ্ধর জাতির কাছ থেকে একমাত্র, কেবলমাত্র সম্মান ব্যতীত আর কিছু পাওয়ার থাকতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির গৌরব। ভারত সরকারের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিয়ে আসার সহজ পন্থা গ্রহণ না করে কেন শেখ মুজিবর রহমান নানাজনকে দিয়ে (অনেক বিতর্কিত ব্যক্তিও এর মধ্যে আছে) নানান রকমের তালিকা আর মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট দিয়ে লেজেগোবরে বেহাল অবস্থা করলেন, তা বোধগম্য নয়।

মুক্তিযোদ্ধারা থাকবে না। থাকবে দেশ। থাকতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা। কিন্তু শেখ মুজিব অতি সামান্য ও অতি সহজ কাজ ভারত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিক নিয়ে আসতে কেন ব্যর্থ হলেন। এই ব্যর্থতার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কখনোই ক্ষমা করব না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি জাতির ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সর্বপোরি বিশ্বাস আকাশছোঁয়া, তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। জাতির আশা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি জাতীয় সরকার গঠন করবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তা করলেন না। তিনি সরকার গঠন করলেন মুক্তিযুদ্ধের কঠিন ত্যাগের পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়া, দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ, সুবিধাভোগী আওয়ামী লীগের সেই সব ব্যক্তিদের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতা তাজুদ্দিন আহম্মেদসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের দূরে ঠেলে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পরাজিত প্রশাসন ও লোকদের দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী একটি জাতি ও একটি দেশকে পরিচালনা করতে গিয়ে, আসলে বিজয়ী জাতিকে পরাজয়ের গহ্বরে ঠেলে দিলেন।

একজন জাতীয় নেতার জ্ঞান গরিমা আর অভিজ্ঞতায় পূর্ণাঙ্গ সফল হতে যদি একশত মার্কের দরকার হয়, তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছিল পঞ্চাশ মার্ক। পাকিস্তানের তেইশ-চব্বিশ বছরের আন্দোলন আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবর রহমান পঞ্চাশ মার্ক অর্জন করেছিলেন। আর বাকি পঞ্চাশ মার্ক অর্জন হতো, যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭১–এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কাছে বন্দী না হয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন। তাহলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতেন মুক্তিযুদ্ধ কী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ কী। মুক্তিযোদ্ধা কারা হয় এবং কীভাবে হয়। একটা জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ বারবার আসে না। জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ আসা বিরল ত্যাগের ব্যাপার। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই একটি জাতি দেহমনে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং পুরোনো ধ্যান ধারণা, পুরোনো সকল ব্যবস্থা, সংকীর্ণ সকল চিন্তা ঝেড়ে ফেলে জাতি নতুন করে জন্ম নেয়। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের জীপনপণ কঠিন

পরীক্ষার মাধ্যমেই দেশ ও জাতির সেবায় এগিয়ে আসে জাতির বীর সন্তানেরা। আর পিছনে পড়ে যায়, পালিয়ে যায় সুবিধাবাদী ভীরু কাপুরুষের দল। কেবল মুক্তিযুদ্ধের সময়ই পরিষ্কার চেনা যায় কারা সুবিধাভোগী ভীরু কাপুরুষ আর কারা ত্যাগী পুরুষ। কিন্তু জাতির দূর্ভাগ্য, দূর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান চিনলেন না, জানলেন না জাতির সাহসী, ত্যাগী পুরুষদের। এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পঞ্চাশ মার্ক ঘাটতি থেকে গেল। শুধু পঞ্চাশ মার্ক নিয়ে তিনি দেশ চালাতে গেলেন। পাকিস্তানিরা যুদ্ধে পরাজি হলো। বন্দী হলো। কিন্তু তাদের পরাজিত তাবেদারি বাঙালি প্রশাসনটা শুধু অক্ষতই রাখলেন না বরং বিজয়ী বাঙালি জাতির মাথার উপর পুনরায় চাপিয়ে দিলেন। তিনি দলে ও প্রশাসনে মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন স্থান দিলেন না। এক সময়ে যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের দলে ছিল, তারা বিভক্ত হলো, জাতি বিভক্ত হলো। বাড়তে থাকল নিরাশার সংখ্যা। হতাশা আর নিরাশার ভিতর দিয়ে সময় বয়ে যেতে থাকল।

এদেশের কৃষক–শ্রমিক–ছাত্র–জনতা এবং সাধারণ মানুষ জীবনপণ করে যুদ্ধ করেছে। জীবনপণ করা সকল যোদ্ধাদের তথা গোটা জাতির শুধু একটি স্বপ্ন ছিল। একটিই আশা ছিল। আর সে স্বপ্ন ও আশা হলো সুখে থাকার স্বপ্ন, সুখে থাকার আশা। সুখ বলতে যা বোঝায় তা হলো – থাকার জন্য ঘর। ক্ষুধার জন্য অন্ন। রোগশোকের জন্য চিকিৎসা। পরিধানের বস্ত্র এবং জ্ঞানের জন্য শিক্ষা। এই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তাই হলো সুখে থাকা। আর এই সুখে থাকার জন্যই এদেশের মানুষ লড়াই করেছে, যুদ্ধ করেছে। অস্পষ্ট হলেও জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজ বিপ্লবের। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক উপাদান ছিল, মুক্তিযুদ্ধে সমাজতন্ত্রীরাও ছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয়তাবাদীদের উপরে ওঠার আগেই আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধ বিকাশ লাভ না করে অসমাপ্ত থেকে যায়। ফলে সামাজিক বিপ্লবও অসমাপ্ত থেকে যায়। স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে জনগণের মুক্তি। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু জনগণ মুক্তি পেল না। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি হলো না। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পুরাতন সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার মধ্য দিয়ে সকল মানুষের জন্য অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা না করে বরং প্রতিহত করেছে সামাজিক বিপ্লবকে। অক্ষুণ্ন রেখেছে অসম বিকাশের পুরাতন ধারাকে। তারা লুণ্ঠন করেছে দু'হাতে। আমলা, কালো ব্যবসায়ী, অসৎ রাজনীতিক এরাই ক্রমাগত ধনী হয়েছে স্বাধীনভাবে। জনগণের অগ্রগতি হবে কী? তারা আরো নিঃস্ব, আরো দরিদ্র হতে থাকল। নেতৃত্ব সমগ্র জনগণের স্বার্থ না দেখে, শ্রেণীস্বার্থ দেখেছে। তাৎপর্যের বিষয় নেতৃত্ব যে কেবল শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আটক ছিল দল এবং সর্বপোরি পরিবারের

কাছে। দেশে দুর্ভীক্ষ শুরু হলো। হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে ক্ষুধায় মারা গেল। বৃদ্ধি পেল লুণ্ঠন ও দূর্নীতি। শেখ মুজিবের নেতৃত্ব বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে লাগল। অপর দিকে অসমাপ্ত সামাজিক বিপ্লবের বিপ্লবীরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির মহান নেতা কমরেড সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে তাদের সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতা তীব্রতর করে তোলে। যুবকরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি জিন্দাবাদ, কমরেড সিরাজ শিকদার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে দেশে ব্যাপক এক নতুন সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামের নাম দেয় শ্রেণী সংগ্রাম। দলে দলে যুবকরা সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে এই সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে।

আদিকাল থেকে শিক্ষিত ও ধনী পরিবারে সিরাজ শিকাদার জন্মগ্রহণ করেন। সিরাজ শিকদার খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং নিজে বিএসসি (সিভিল) ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি বামপন্থি ছাত্র সংগঠন করতেন। শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লবের প্রয়োজনে কমরেড সিরাজ শিকাদারের সশস্ত্র সংগ্রাম এতই ব্যাপক ও তীব্র হলো যে, শেখ মুজিবর রহমানের প্রশাসন দিনকে দিন অচল হয়ে যেতে শুরু করল। নির্যাতিত–নিপীড়িত–শোষিত বাঙালির হৃদয় কমরেড সিরাজ শিকাদারকে ঘিরে নতুন করে স্বপ্ন দানা বাঁধতে লাগল।

১৯৭৪ সালের ২ জানুয়ারি সিরাজ শিকদার গ্রেফতার, পলায়নকালে পুলিশের গুলিতে নিহত, এই শিরোনামে দেশের সকল পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হলো। পুলিশের প্রেসনোটে বলা হলো সিরাজ শিকদারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং সাভার রোড দিয়ে নিয়ে আসার সময় সিরাজ শিকদার পুলিশের ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তখন পুলিশ গুলি করে, সেই গুলিতে সিরাজ শিকদার নিহত হয়।

কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা যায় পুলিশের প্রেসনোট বানোয়াট। সিরাজ শিকদারকে গ্রেফতার করা হয় ঠিকই। এবং গ্রেফতারের পর বিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। সিরাজ শিকদারের বুকে মোট পাঁচটি গুলির চিহ্ন ছিল। যা সামনে থেকে করা হয়েছে। কেউ যদি পালাতে থাকে এবং পলায়ন পর ব্যক্তিকে যদি পিছন থেকে গুলি করা হয়, তাহলে গুলি পিঠে বিদ্ধ হবে। কিন্তু সিরাজ শিকদারের বুকে বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য, শোষকের শেষণ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত সকল ভোগ-বিলাস, সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীতে মিশে গেলেন। নিপীড়িত, নির্যাতিত সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঘর-সংসার, আত্মীয়-পরিজন, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সমাজ বিপ্লবে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের জন্য এমন উৎসর্গকৃত প্রাণ কমরেড সিরাজ শিকদারকে বিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় মির্মম

নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর শেখ মুজিবর রহমান পবিত্র পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দম্ভের সাথে বললেন, আজ কোথায় সিরাজ শিকদার?

এই ঘটনার পর শেখ মুজিবের দেশপ্রেম, মহানুভবতা এবং আইন ও বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ল। মানুষ ভাবতে লাগল শেখ মুজিব যদি একজন দেশপ্রেমিক হন, একজন বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কী করে আর একজন দেশপ্রেমিক আর একজন বীরকে আর একজন সর্বস্বত্যাগী মহান নেতাকে বিনা বিচারে বন্দীদশায় গুলি করে হত্যা করতে পারলেন? আবার জঘন্য অন্যায় ও কলঙ্কের কথা পবিত্র পার্লামেন্টে দম্ভের সাথে শেখ মুজিব কী করে বলতে পারলেন!

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা। শেখ মুজিবের বাকশাল ছাড়া কেউ অন্য কোনো দল করতে পারবে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি সংবাদপত্র ছাড়া দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিভক্তি গেল না। আশা-নিরাশার মিশ্র প্রতিক্রিয়া বইতে লাগল। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বহু মানুষ, বহু পেশাজীবি সংগঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বাকশাল করার জন্য প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে অভিবাদন জানাল।

সরকারি মালিকানায় নেয়া দৈনিক ইত্তেফাকসহ চারটি পত্রিকা ছাড়া বাকি সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ। শেখ মুজিবের নেয়া নতুন একদলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিসহ দেশের সকল নাগরিকের কিছুই বলার সুযোগ থাকল না। সর্বত্র নিঃস্তব্ধতা।

১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সাল। ফজরের আজানের পর কাক ডাকা ভোরে রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠ, আমি মেজর ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে।

এরপর দ্বিতীয়বার ঘোষণা করা হলো, শেখ মুজিব ও তার স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে খন্দকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং কার্ফু জারি করা হয়েছে।

সহকর্মী হিসেবে শেখ মুজিব যাদের দীর্ঘদিন কাছে এবং পাশে রেখেছেন সেই সকল আওয়ামী লীগের নেতা নীরব এবং নিশ্চুপ থেকেছেন। সামান্য সংখ্যক কিছু ছাত্রলীগের তরুণ নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা সবাই চুপচাপ থাকার এবং অপেক্ষা করার ও দেখার পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। নেতাদের ইংরেজিতে একটা কমন ডায়লগ ছিল, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশ হিসেবেও মান্য হয়েছে। এই ডায়লগটি হলো 'ওয়েট এন্ড সি'। '৭৫–এর

১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার পর আওয়ামী নেতাদের 'ওয়েট এন্ড সি'–এর রাজনীতি শুরু হয়। ছাত্র নেতাকর্মীদের খুবই সামান্য একটা অংশ 'ওয়েট এন্ড সি' রাজনীতি প্রত্যাখান করে অনুল্লেখযোগ্য কর্ম-তৎপরতা শুরু করে এবং তৎপরতা মূলতঃ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। এই কর্ম-তৎপরতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বর্তমান কম্যুনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

১৫ই আগস্ট–এ শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার পর হত্যার সমর্থনে আনন্দ উল্লাস করে রাজপথে কোনো মিছিল হয়নি। আবার হত্যার বিপক্ষেও কোনো শোক সভা, শোক মিছিল এবং প্রতিবাদ মিছিলও হয়নি।

বলা যায় শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের পিছনে প্রায় সকল সামরিক এবং বেসামরিক নেতৃত্ব সমর্থন জুগিয়েছিল। অন্তত একথা সহজেই বলা যাবে যে, সকলেই নীরবে এ হত্যা মেনে নিয়েছিল কেবলমাত্র ব্যতিক্রম কাদের সিদ্দিকী ছাড়া।

মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তী কাদের সিদ্দিকী শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় আবারো সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের পর আওয়ামী লীগের নেতারা এবং শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার সদস্যরাই খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ–এর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করে। খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ শেখ মুজিবের স্থলাভিষিক্ত হন। খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ ছিলেন শেখ মুজিবর রহমানের মন্ত্রীসভার বাণিজ্যমন্ত্রী। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সাংবিধানিক কোনো বৈধতা ছিল না। খন্দকার মোস্তাকের রাষ্ট্রপতি হওয়া সাংবিধানিকভাবে সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। তবুও দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হন খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ এবং খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের নেতৃতে মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন বর্তমান শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভার সদস্য আবুল হাসান চৌধুরীর পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য এবং এমপি আব্দুল মান্নানসহ শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার অনেক মন্ত্রী।

খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া সাংবিধানিকভাবে কোনো বৈধতা না থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান সুপ্রীম কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি এ, বি মাহামুদ হোসেন।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী বঙ্গবীর জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী খন্দকার মোস্তাকের সামরিক উপদেষ্টা হন। ১৫ই আগস্ট সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার দলের বর্তমান এমপি মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ দেন। এরপর আনুগত্য প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ

দেন বিমান বাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার বর্তমান বিতর্কিত এমপি এ, কে খন্দকার, নৌ বাহিনীর প্রধান এডমিরাল এম, এইচ খান ও বিডিআর এবং পুলিশ প্রধানগণ।

নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ পার্লামেন্ট মেম্বারদের সভা ডাকেন। এই সভায় যোগদান করা থেকে বিরত রাখার জন্য ছাত্রনেতা নিহত সৈয়দ নূরুল ইসলাম নূরুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের হাতে গোনা কয়েকজন কর্মী জোর চেষ্টা ও তদবির চালালেও আওয়ামী লীগের প্রায় সকল এমপি উক্ত সভায় যোগদান করেন।

অপরদিকে বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম তার জনা পঞ্চাশেক সাথীসহ সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়ে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ–এর সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করলে, ছাত্রনেতা সৈয়দ নূরুল ইসলাম নূরু তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বৃহত্তম ময়মনসিংহ এবং বৃহত্তম সিলেট জেলায় সীমান্ত অঞ্চলে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগঠন জাতীয় মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেন। ডাকসুর সাবেক ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম (বর্তমানে কমিউনিষ্ট "সিপিবি" পার্টির সাধারণ সম্পাদক) ইসমত কাদির গামা, রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে সরকারি আমলা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোক্তাদির চৌধুরী) দের নেতৃত্বে মাত্র শ'খানেক ছাত্রনেতা ও কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা শুরু করলে, এই কর্ম তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য জাসদ ছাত্রলীগ (গণবাহিনী) প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ছাত্রলীগের এই মুষ্টিমেয় নেতাকর্মী মিলে সিদ্ধান্ত নিল ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭৫ ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে মৌন মিছিল করে যাওয়া হবে।

৪ঠা নভেম্বরের মৌন মিছিল সফল করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরে গোপন বৈঠক চলতে লাগল। ২রা নভেম্বর দিবাগত গভীর রাতে অর্থাৎ ৩রা নভেম্বর প্রত্যুষে দেশে দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল। ৩রা নভেম্বর সকালে সোভিয়েত রাশিয়া নির্মিত বোমারু বিমান মিগ ২১ আকাশে উড়ল এবং খুবই নিচ দিয়ে ঘন ঘন মহড়া দিতে লাগল। বাংলাদেশ বেতারের বা রেডিও বাংলাদেশের এবং টেলিভিশন সম্প্রচার সারাদিন বন্ধ রইল। বোমারু বিমানের নিচ দিয়ে ঘন ঘন মহড়া দেয়া এবং রেডিও বন্ধ থাকায় দেশে যে দ্বিতীয় বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এটা স্পষ্ট বুঝা গেল এবং এটাও সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই ২য় সামরিক অভ্যুত্থানের জয়-পরাজয়ের কোনো নিশ্চিত ফলাফল এখনোও হয়নি। কোনো পক্ষই এখনও নিশ্চিত বিজয়ী হয়নি। আর এই জন্যই বোমারু বিমান মিগ ২১ বার বার নীচে ড্রাইভ দিয়ে প্রতিপক্ষকে বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে এবং বেতার বা রেডিও বন্ধ রয়েছে। বোমারু বিমান বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে কিন্তু বোমা মারছে না, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে দুই

পক্ষের সাথে আলোচনা চলছে। আর সেই জন্যই যুদ্ধ বিমান আক্রমণের মহড়া দিচ্ছে কিন্তু আক্রমণ করছে না।

রাতে হঠাৎ টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করল কিন্তু অভ্যুত্থান সম্পর্কে কোনো কিছুই বলা হলো না। ৪ঠা নভেম্বর সকাল বেলা পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মৌন মিছিলের প্রস্তুতি নিয়ে শ' পাঁচেক ছাত্র-জনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সমবেত হলো। সমবেত ছাত্র-জনতা বিচ্ছিন্নভাবে সামরিক অভূত্থান নিয়ে আলোচনা শুরু করল। এদের অধিকাংশেরই ধারণা সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাদানকারী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অভ্যুত্থান করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে জেনারেল জিয়ার একটা পরিচিতি ছিল এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাই অনেকেই মনে করেছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বেই সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ অভ্যুত্থান করেছেন। অভ্যুত্থান এর নেতৃত্ব কে দিয়েছেন তা পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া গেলেও একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ১৫ই আগস্টে অভ্যুত্থান করে শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করেছে, তারা এখন আর ক্ষমতায় নেই এবং তারা দেশ ত্যাগ করেছে। ইতোমধ্যে আরো কয়েকশত লোক সমাবেশে যোগ দিয়েছে। সাত-আটশত লোক নিয়ে মৌন মিছিল শুরু হলো। মৌন মিছিল ধানমণ্ডি ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর বাসভবন অভিমুখে যাত্র করল। পলাশির মোড়ে পুলিশ প্রথম বাধা দিলো। পুলিশ বলছে, মিছিল নিষিদ্ধ আপনারা মিছিল করবেন না। কে মিছিল নিষিদ্ধ করেছে জিজ্ঞেস করলে পুলিশ কোনো উত্তর দিতে পারেনি। পুলিশ বলেছে আপনারা একটু অপেক্ষ করুন আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জেনে নেই। কিন্তু মিছিল থামল না। মিছিল চলতে থাকল। পুলিশও কামকাওয়াস্তে হালকা পাতলা বাধা দিতে লাগল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে পুলিশি বাধা বলতে যা বুঝায় তা পুলিশ মোটেও দেয়নি। আসলে পুলিশও জানত না কারা এখন দেশের ক্ষমতায় আছে, দেশে কী হচ্ছে, পুলিশের কী করণীয়। পুলিশ অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল। নিঃশব্দ মৌন মিছিল সাইন্স ল্যাবরেটরির মোড় পাড় হয়ে কলাবাগানের দিকে যেতে থাকলে এদিকে পাহাড়ায় থাকা সেনাবাহিনীর দশ-বার জন সৈন্য মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো। সৈন্যদের মিছিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বেশকিছু মিছিলকারী মিছিল ত্যাগ করে আশেপাশে সরে পড়ল। সৈন্যরা মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো ঠিকই কিন্তু মিছিলে বাধা দান বা সমর্থন কোনো কিছুই করল না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তবে সৈন্যদের তাকানোর ভঙ্গিটা বিরূপ ছিল। তারা বাঁকা চোখেই মিছিলটাকে দেখেছে এবং মনে হয়েছে দ্বিতীয় সামরিক অভ্যূত্থান ও সৈন্যদের করণীয় সম্পর্কে তারাও নিশ্চিত নন। মিছিল কলাবাগান

অতিক্রম করার সময় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ–এর মা এবং ছোট ভাই রাশেদ মোশাররফ (বর্তমানে শেখ হাসিনার ভূমি প্রতিমন্ত্রী) মিছিলে অংশ নিলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ–এর নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের বিষয়ে বিস্তারিত জানায় যায়। এখানেই জানা গেল নতুন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এর অনুগত বাহিনী বন্দী করেছে এবং অনতিবিলম্বে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল পদোন্নতি নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান হচ্ছেন। মিছিল ৩২ নম্বর ধানমণ্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটে গিয়ে বিকাল তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী দিয়ে শেষ হয়।

দুপুর ০১:০০ টার দিকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান–এর ভবনের সামনে থেকে যে যার স্থানে ফিরে যাই। মাত্র আধা ঘন্টা সময়ের মধ্যে দুপুরের আহার শেষ করে পুরান ঢাকা থেকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রওনা হই। বিকাল তিনটার আগেই আমরা ঢাকসু ভবনের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখি প্রায় হাজার খানেক ছাত্র-জনতা ইতোমধ্যেই সমবেত হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ শুরু হয়নি কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে সবাই আলোচনা করছিল। এই আলাপ-আলোচনার মূল বিষয় ছিল জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যা। গতকাল ০৩রা নভেম্বর শেখ মুজিব হত্যাকারীরা জেলখানার অভ্যন্তরে বন্দী অবস্থায় বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দানকারী জনাব তাজুদ্দিন আহম্মেদ, প্রথম রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুনসুর আলী এবং শিল্পমন্ত্রী কামরুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করে এবং তারপর দেশ ত্যাগ করে।

ঢাকসুর সাবেক ভিপি বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইসমত কাদির গামা সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর মিছিল শুরু হলো। জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যার খবরে মিছিলের মানুষগুলো কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। মিছিলটা পুরোনো ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু মিছিলের গতি-প্রকৃতিটা এমনই হলো যে, এটা না হলো বিক্ষোভ মিছিল,না হলো মৌন মিছিল। মিছিলটা পুরাতন শহর দিয়ে নাজিমুদ্দিন রোডের সেন্ট্রাল জেলের (কেন্দ্রীয় কারাগার) সামনে দিয়ে সন্ধ্যার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহিরুল হক হলের মাঠে এসে শেষ হলো। এখানে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আগামী ৫ই নভেম্বর শোকসভার কর্মসূচী ঘোষণা করে পাড়ায়-মহল্লায় মিছিল ও পথসভা করার নির্দেশ দিলেন। এর আগে বিকাল ০৩:০০ টার দিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের পশ্চিম কোণে তিন নেতার মাজারের সামনে জাতীয় চর নেতাকে দাফন দেয়ার জন্য কবর খোড়া হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের বাধার জন্য জাতীয় চার নেতাকে এখানে কবর দেয়া গেল না।

আমরা দশ-এগার জন মিছিল করতে করতে পুরাতন শহরে আমাদের মহল্লায় ফিরে এলাম। তখন রাত ০৮:০০ টা হবে। মহল্লায় এসে পরিচিত মাইকের দোকান থেকে মাইক এবং গেরেজ থেকে রিকশা নিয়ে মাইক বেঁধে মিছিল এবং পথসভা করতে লাগলাম। পথসভা ও মিছিলে জাতীয় চার নেতা হত্যার প্রতিবাদে আগামীকাল শোকসভার ঘোষণা দিতে থাকলাম। পথসভা এবং মিছিলে জনতা তো অংশগ্রহণ করলই না, এমনকি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও অংশগ্রহণ করল না। আমরা দশ-এগারো জন ছাত্রনেতা-কর্মীই সারাটা পুরাতন শহরের যতটা এলাকা সম্ভব মিছিল আর পথসভা করতে থাকলাম। রাত ১১:০০ টার দিকে শ্যামবাজার এলাকায় মিছিল নিয়ে এলে সূত্রাপুর থানার পুলিশ রাস্তার দুই দিক থেকে ঘেরাও করে আমাদের বেড়ধর লাঠিপেটা করে রিকশা এবং মাইক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পুলিশের এই হামলায় গুরুতর আহত হয় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বর্তমানে সরকারি আমলা খন্দকার শওকত হোসেন (জুলিয়াস) এবং কবি নজরুল সরকারি কলেজের তুখোড় ছাত্রনেতা সৎ ও প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব বিএনপি সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭৯নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান বর্তমানে জাতীয়তাবাদী দল ৭৯নং ওয়ার্ড সভাপতি জননেতা মোঃ ফরিদ উদ্দিন। আমরা সবাই পালিয়ে গেলাম। রাতে কেউই বাসায় থাকলাম না। কিন্তু রিকশাওয়ালা, রিকশার মালিক, মাইকওয়ালা এরা সবাই আমার বাসায় এসে রিকশা আর মাইক দাবি করে বসে রইল। পরদিন সকালে টাকা-পয়সা দিয়ে থানায় লোক পাঠানো হলো রিকশা আর মাইক ছাড়ানোর জন্য, কিন্তু থানা পুলিশ কিছুতেই মাইক আর রিকশা ছাড়ল না। ০৩রা নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংগঠিত দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকারীরা দেশ থেকে পালিয়ে গেলেও যার নেতৃত্বে মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হলো এবং যিনি সংবিধান বহির্ভূতভাবে অবৈধ পন্থায় দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেন নেই খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ ঠিকই রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকলেন। ১৫ই আগস্ট সকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করে সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতি হয়ে বসা খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি এ, বি, মাহমুদ হোসেন। সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ–এর কাছ থেকে ০৫ই নভেম্বর, ১৯৭৫–এ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ পদোন্নতি নিয়ে মেজর জেনারেল হন এবং সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেনাবাহিনী প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। বিমান বাহিনী ও নৌ বাহিনী প্রধানগণ খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান এর ব্যাচ পরিয়ে দিচ্ছেন এই ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাকায় শ’ পাঁচেক ছাত্র-জনতা সমবেত হলেও নেতৃত্বের অভাবে এবং জাসদ ছাত্রলীগের দাপটের কারণে ৪ঠা নভেম্বর ঘোষিত ৫ই নভেম্বরের শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা এবং আতঙ্ক নিয়ে বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা আর মিছিলের চেষ্টার মধ্য দিয়ে ৫ই নভেম্বরের দিন শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যায় আমরা পুরাতন ঢাকায় ফিরে আসি এবং সরকারি কবি নজরুল কলেজের শহীদ সামসুল আলম ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রসভা করি। পরদিন ৬ই নভেম্বর সকালে পুরাতন ঢাকা থেকে যথারীতি আমরা দশ-এগার জন মিছিল নিয়ে আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হলে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাহাদাত মোঃ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করা, (আওয়ামী লীগের) পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া, সামরিক আইন জারি করা এবং সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়াসহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত শোনা যায় এবং এই দিনেও আমাদের মিছিল ও আলোচনার কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। সবাই ছিল বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা পুরাতন শহরে ফিরে আসি। নেতৃত্বের কোথাও কেউ নেই। সব কেমন যেন শূন্য ও ফাঁকা। দেশে আরো সাংঘাতিক বড় ধরনের কী যেন হতে যাচ্ছে তা অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু পরিষ্কার বুঝা যায় না। আওয়ামী বাকশালী নেতারা সব কে যে কী করছে বা কোথায় পালিয়ে গেছে তাও বুঝা যায় না। ছাত্র নেতাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ শহীদ অনেকটা পাতানো গৃহবন্দী বলেই মনে হচ্ছে। ইসমত কাদির গামার ততটা বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। তবে কিছু করার চেষ্টায় আছেন। রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমান আমলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোক্তাদির চৌধুরী) আছেন, সব সময়ই আছেন। বলতে গেলে সেই এখন সব চাইতে বড় নেতা। ঢাকসুর সাবেক ভিপি ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম হলেন কিছু একটা করার চেষ্টাকারীদের মূল নেতা। ছাত্রনেতা সৈয়দ নূরু কাদের সিদ্দিকীর সাথে যোগ দিয়েছেন।

আগামীকাল যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো কর্মসূচী নেই। রাত যখন গভীর হলো, দেড়টা-দুটা বাজে, ঘড়ির সময় অনুযায়ী ৭ই নভেম্বর গভীর রাতে হঠাৎ গুলির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। রাত যতই বাড়তে লাগল গুলির আওয়াজও ততই বাড়তে লাগল। গুলির আওয়াজে মনে হতে লাগল এ যেন পঁচিশে মার্চ, ১৯৭১–এর মতোই এক কালো রাত। পঁচিশে মার্চ, ১৯৭১–এর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। কিন্তু আজকের গুলি কারা করছে। কেন করছে। কার বিরুদ্ধে করছে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।

৭ই নভেম্বর ভোর হতে না হতেই দেখা গেল সেনাবাহিনীর সিপাহীরা (জোয়ান) আকাশপানে গুলি করতে করতে রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে, গাড়িতে চড়ে যে যেভাবে খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এই সেনা সিপাহীদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের একটা অংশ যোগ দিয়েছে। সিপাহী-জনতা রাজপথে মিছিল করছে আর আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ছে, শ্লোগান দিচ্ছে। সিপাহী-জনতার এই মিছিল থেকে নানা ধরণের শ্লোগান শোনা গেল। কোনো মিছিল থেকে শ্লোগান এলো মোস্তাক-জিয়া জিন্দাবাদ, মুসলিম বাংলা জিন্দাবাদ। কোনো মিছিল থেকে শ্লোগান উঠল কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ, তাহের-জিয়া ভাই ভাই। গণবাহিনী জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই ইত্যাদি নানা ধরণের শ্লোগান দিতে শোনা গেল সিপাহী-জনতার মিছিল থেকে। এই সিপাহী-জনতার সামনে কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা পরিষ্কার কোনো ধারণা যে ছিল না তা বোঝা যাচ্ছিল। এবং এই সিপাহী-জনতার বিদ্রোহে কোনো একক নেতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ যে ছিল না তাও বোঝা যাচ্ছিল। তবে এই সিপাহী-জনতার বিদ্রোহ যে আওয়ামী বাকশালী এবং শেখ মুজিব–এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তা নিশ্চিত ছিল।

ঐ মিছিলকারী সিপাহী-জনতা আওয়ামী বাকশালী বা শেখ মুজিব–এর অনুসারীদের দেখামাত্র যে মেরে ফেলত তাতে কোনোই সন্দেহ ছিল না।

ভারতে পলায়ন

৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব ছিল শেখ মুজিবর রহমান, আওয়ামী বাকশালী ও ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সাধারণ সিপাহী-জনতা এই বিপ্লবে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানকেই নেতা মনে করেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী বাকশালীরা বা শেখ মুজিবের অনুসারীরা কে যে কোথায় লাপাত্তা হয়ে গেল তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না। অবশ্য শেখ মুজিবের সহ পার্টি বা আওয়ামী বাকশালী নেতাদের একটা বিরাট অংশ মুজিব হত্যাকারীদের সাথে হাত মেলালো এবং হত্যাকারীদের নেতা খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের নেতৃত্বে সরকার গঠন করল। আর আমরা গুটি কয়েক ছাত্রনেতা-কর্মী রাজনৈতিক তৎপরতা চালাবার বা মুজিব হত্যার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছিলাম, তারা ১৯৭৫–এর ৭ই নভেম্বর বিক্ষুব্ধ সিপাহী-জনতার বিদ্রোহ দেখে ভয়ে পালিয়ে দেশ ত্যাগ করলাম।

ছাত্রনেতা রবিউল আল চৌধুরী বর্তমানে সরকারি আমলা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মুক্তাদির চৌধুরী–এর নেতৃত্বে আমরা দশজন ছাত্রনেতা-কর্মী কুমিল্লার লাকসাম-কসবা দিয়ে পালিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় গিয়ে উঠলাম। ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলা ছিল ২নং

সেক্টর। আমরা যারা ২নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম তাদের কাছে আগরতলা ছিল পূর্ব পরিচিত শহর। এই আগরতলা শহরের এমবিবি (মহারাজা বীর বীক্রম) কলেজের ভিপি সঞ্চয় পালের বাড়িতে আমরা সবাই উঠলাম। সঞ্চয় পালের কাছ থেকে শুনলাম শেখ মুজিবরের আমলে আওয়ামী লীগের তৃতীয়/চতুর্থ সারি নেতা, পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং শেখ হাসিনা আমলে কিছুই না এস, এম ইউসুফ আগরতলা থেকে কলকাতায় চলে গেছেন এবং যাওয়ার সময় বলে গেছেন তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আবার আগরতলায় আসবেন। অন্যদিকে সাবেক ডাকসুর ভিপি বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাবেক মুজিব বাহিনী নেতা আওয়ামী যুব লীগের সাবেক চেয়ারম্যান বর্তমানে গণ ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা মোস্তাফা মোহসীন মন্টু, সাবেক ছাত্রনেতা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি, বর্তমানে জাতীয় পার্টির প্রাক্তন এমপি শাহ মোঃ আবু জাফর, সাবেক ছাত্রনেতা ইসমত কাদির গামা, শেখ মুজিবের মন্ত্রী মোল্লা জালালের ছেলে সাবেক ছাত্রনেতা রুমি, কবি নজরুল সরকারি কলেজের তুখোড় ছাত্রনেতা সৎ ও প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব বিএনপি সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭৯নং ওয়ার্ড চেয়ারম্যান বর্তমানে জাতীয়তাবাদী দল ৭৯নং ওয়ার্ড সভাপতি জননেতা মোঃ ফরিদ উদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাঈদ, রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস, এ মালেকসহ শ'তিনেক নেতা-কর্মী পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় পালিয়ে যায়। বলা যায় না বুঝে শুনে আমরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যাই। যা ছিল নাবালকসুলভ রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা। আমার ধারণা দেশত্যাগ করে ভারতে যাওয়া আমাদের সংখ্যা হাজার তিনেকের বেশি হবে না। তবে দেশ থেকে পালিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেয়া হাজার তিনেক নেতা-কর্মীর উদ্দেশ্য ছিল একটাই। আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত সরকারের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের মতো রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতা চালানো। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সরকার আমাদের সাহায্য করা দূরে থাক। পাত্তাই দেয়নি।

(১) গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজ ছাত্র সংসদ এর জিএস পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, (২) ছাত্রলীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক নেতা বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংক–এর কর্মকর্তা ও নেতা মোবারক হোসেন সেলিম, (৩) টাঙ্গাইলের ছাত্রনেতা বর্তমানে ব্যবসায়ী বাবর আলী, (৪) টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রনেতা বর্তমানে এ্যাডভোকেট লিয়াকত হোসেন জাহাঙ্গীর, (৫) যুবনেতা নজিবর রহমান নিহার, (৬) ছাত্রনেতা বর্তমানে ব্যবসায়ী নওশের আলী নসু, (৭) যুবকর্মী বর্তমানে ভারতের নাগরিক

জ্যোতির্ময় বিশ্বাস, (৮) সাবেক ছাত্রনেতা বর্তমানে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা গোপালগঞ্জের আব্দুর রওফ শিকদার, (৯) সাবেক যুবনেতা দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকে বিদেশীনিকে বিয়ে করে, ঘর-সংসার করে, দুই সন্তান জন্ম দিয়ে অবশেষে বিদেশী কালচারের সাথে মানিয়ে নিতে না পেরে বিদেশী বধু এবং সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে বর্তমানে ব্যবসারত গ্রীন রোড কাঠালবাগানের এস, এ কাইয়ুম খসরু এবং (১০) আমি স্বয়ং বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ–এর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সস্ত্রীক অবাঞ্ছিত ঘোষিত।

আমরা এই দশজন এবং আমাদের নেতৃত্বদানকারী রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোক্তাদির চৌধুরীসহ মোট এগারজন আগরতলা এমবিবি কলেজের ভিপি সঞ্জয় পালের বাড়ির সাথে ময়লা নিষ্কাশনের ড্রেনের উপর পুরোনো টিন দিয়ে একটি চালা বানিয়ে তার নিচে একটি বড় চৌকি ফেলে থাকতে লাগলাম। অবশ্য রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোক্তাদির চৌধুরী সঞ্চয় পালের সঙ্গে ওদের ঘরে ঘুমাতো। আর দশজন ড্রেনের উপর ভাঙ্গা টিনের চালার নিচে রাখা ঐ এক চৌকিতেই ঘুমাতাম। একজনের পাশে একজন করে নয়জন পাশাপাশি ঘুমাতো। আর আমি ঘুমাতাম সকলের পায়ের ধারে। কারণ পাশাপাশি দশজনের জায়গা ঐ চৌকিতে হতো না। তাই আমি সকলের পায়ের ধারে যে জায়গা সেই জায়গায় ঘুমাতাম। ঘুমতো না, কোনো রকমে শুয়ে থাকা। একে তো প্রচণ্ড মশা, তার উপর আবার চতুর্দিক খোলা, তারপর আবার ড্রেনের উপর, তাও আবার মশারি ছাড়া। মশারি নেই। এখানে দিনের বেলাতেই মশা ধরত। এই অবস্থায় ঘুমানোর তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আমাদের ঘুমানোর জন্য দুই-তিনটা কম্বল দেয়া হয়েছিল। সবাই কম্বল বিছিয়ে আর একটি কম্বল দিয়ে গা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ে শুয়ে থাকত। আর আমি কম্বল না পেয়ে লুঙ্গি দিয়ে শরীর ঢেকে শার্টের ভিতর মুখ-মাথা ঢুকিয়ে রাখতাম। আমি আর মোবারক হোসেন সেলিম অধিকাংশ রাত গল্প করে আর মশা মেরে কাটিয়ে দিতাম। মশা মেরে দুই বন্ধু মিলে আবার গুনতাম কত হাজার কত শ' মশা মারলাম। এইভাবে রাত পার করে দিয়ে সকালে পায়ের ধারে শুয়ে পরতাম। যতখানি বেলা সম্ভব ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পার করে দিতাম। কারণ আমাদের কপালে সকালের নাস্তা খাওয়া ছিল না। তাই রোজা রাখার মতো শুয়ে শুয়েই বেলা পার করে দিতে চাইতাম। ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্ত দুপুরের খাওয়ার জন্য ভারতীয় এক টাকা দশ পয়সা এবং রাতে খাওয়ার জন্য এক টাকা, তাও আবার রুটিন মাফিক নিয়মিত দিতেন না। সপ্তাহে দু'একদিন বা তারও বেশি দিন তো বাদ যেতোই।

অর্থাৎ কখনো সপ্তাহে লাগাতারভাবে, আবার কখনোও সপ্তাহের মধ্যে দু'তিন দিন কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্ত টাকা দিতেন না। আমাদেরকে টাকা দেয়ার জন্য রাধু গুপ্তের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তিনি টাকা যোগাড় করতে পারতেন না, তাই আমাদের দিতে পারতেন না। আর যখন টাকা দিতে পারতেন না, তখন আমাদের না খেয়ে থাকা ছাড়া আর বিকল্প কিছু ছিল না। রাধু গুপ্ত রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোক্তাদির চৌধুরীর কাছে টাকা দিতেন। রবিউল দিতেন শংকর বোর্ডিং–এ এবং শকার বোর্ডিং–এ বলা ছিল দুপুরে একটাকা দশ পয়সা, রাতে এক টাকার বেশি কাউকে খেতে দেয়া হবে না। দুপুরে এক টাকার ভাত দশ পয়সার ভাজি। কাঁচা মরিচ, পিঁয়াজ ও ডাল ফ্রি। রাতে নব্বই পয়সার ভাত, দশ পয়সার ভাজি। এই ছিল আমাদের বরাদ্দ। আমরা দুপুরে এক টাকার ভাত খেয়ে হোটেলে ক্যাশ থেকে দশ পয়সা ফেরত নিয়ে ঐ দশ পয়সা দিয়ে বিড়ি কিনে খেতাম। কাপড়-চোপড়ে আমরা এমনই ফিটফাট যে, কেউ চিন্তাও করতে পারতো না যে আমাদের পেটে ভাত নেই, পকেটে পয়সা নেই।

আসন্ন শীতের কথা চিন্তা করে আমি আমার ডবল বেইজ স্যুটটা বাসা থেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন ডবল বেইজ স্যুটটা পড়ে আগরতলার রাস্তায় বের হতাম তখন সাড়া আগরতলার নরনারী আমার দিকে মানে আমার ডবল বেইজ স্যুটের দিকে তাকিয়ে থাকত। সারা আগরতলা শহরে আমার ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ডবল বেইজ স্যুট ছিল না। মেয়েরা তাকিয়ে থাকত আকর্ষণীয়ভাবে এবং ছেলেরা তাকাত ঈর্ষান্বিতভাবে। কতজন জিজ্ঞেস করেছে এটা কোথা থেকে বানিয়েছি? বলতে হয়েছে কলকাতা থেকে বানিয়েছি। কারণ আমরা যে বাংলাদেশ থেকে এসেছি এটা ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস সেক্রেটারির নির্দেশে গোপন করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা যে মুসলমান এটাও গোপন করতে হয়েছে। আমাদের পরিচয় গোপন করে মিথ্যে পরিচয়ে থাকতে হয়েছে। বলতে হতো আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি এবং আমরা সকলেই হিন্দু। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে হিন্দু নাম ছিল। এস, এম ইউসুফের নাম ছিল সরজ দা, রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোক্তাদির চৌধুরীর নাম ছিল রবিরায় চৌধুরী ওরফে রবি দা, আমার নাম ছিল অনন্ত দাস গুপ্ত ওরফে অনন্ত দা।

আমরা ভারতীয় হিন্দু নাগরিকের মিথ্যে পরিচয়ে ভারতের আগরতলায় থাকতে লাগলাম। আমাদের স্মার্ট-ফিটফাট পোষাকের পকেট থেকে পাতার বিড়ি বের করে ধুমপানের জন্য আগুন ধরাতাম তখন মানুষ অবাক হয়ে চেয়ে থাকত, মনে করত এটা আমাদের এক ধরনের সৌখিনতা বা ফ্যাশন। আসলে আমাদের যে বিড়ি

খাওয়ারও পয়সা নেই। এটা আগরতলার মানুষ বুঝত না। পেটের ক্ষুধার কি জ্বালা তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। মাঝে মাঝেই কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্ত টাকা দিতে পারতেন না। এই টাকা দিতে না পারার ঘটনা পরপর দুই তিন দিনও হয়ে যেত। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমরা কাতরাতে থাকতাম। আমি বলতাম, আমরা কাজ করে খাই, প্রয়োজনে মুজুরের কাজ করে আমাদের আহার জোটাই। কিন্তু না, আমাদের কাজ করাও মানা। আমাদের পিছনে ভারতের গোয়েন্দা লেগে থাকত, যে কোনো মুহূর্তে আমাদের গ্রেফতার করতে পারে। তাই কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্তের কথার বাইরে একচুলও চলা যাবে না। ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে থাকতাম, ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে শংকর বোর্ডিং এ গিয়ে হোটেলে মালিক দাদাবাবুকে মিনতির সাথে বলতাম, দাদাবাবু, এই বেলাটা আমরা খাই। পরের বেলায় দুইবেলার পয়সা একবারে নিয়ে নিয়েন।

শংকর বোর্ডিং এর মালিক দাদাবাবুর এক জবাব, আগে পয়সা পরে খাওয়া, সোজা বের হন।

হোটেলের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বেহায়া বেলাজের মতো দেখতাম লোকে মাছের মাথা, মুরগির মাংস খাসির মাংস আরো কত কি দিয়ে খাচ্ছে। দাদাবাবু ধমক দিয়ে বলত, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? যান পথ ছাড়ুন।

এক সময় ধীরে ধীরে হোটেলের দরজা থেকে সরে আসতাম। রাস্তার কল থেকে পেট ভরে পানি খেয়ে উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটতে থাকতাম। এইভাবে চলতে থাকল আমাদের দিন। আমরা মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তীর নায়ক বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দেয়ার অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলাম।

স্বেচ্ছায় সকল দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিলাম। একদিন বত্রিশ ঘন্টারও অধিক সময় অভুক্ত থেকে ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে টাঙ্গাইলের বাবর আলী ওরফে দীপকের সাথে ফন্দি করলাম, আজ দু'জন হোটেলের মালিক দাদাবাবুকে কিছু না বলে অন্য কাস্টমারদের মতো সোজা খেতে থাকব, তারপর যা হবার হবে। পেট থেকে তো আর খাওয়া বের করতে পারবে না। ফন্দি মতো দু'জনে সোজা শংকর বোর্ডিং এ খাওয়ার টেবিলে বসে পরলাম। হোটেলের প্রথম বয় যথারীতি আমাদের সামনে কাসার থালা দিয়ে গেল। দ্বিতীয় বয় গরম পানি দিয়ে আমাদের হাত এবং থালা ধুয়ে দিয়ে গেল। তৃতীয় বয় বালতি করে ভাত আর বাটি নিয়ে আমাদের সামনে এসে বালতি থেকে বাটি মেপে আমাদের থালায় যেই ভাত দিতে যাবে অমনি দাদাবাবুর হাঁক, এই পয়সা কই? আমি বললাম রবি দা (রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোক্তাদির চৌধুরী) নিয়ে আসছে। দাদাবাবু হাত দিয়ে ইশারা করল, বয় চলে গেল। সব কাস্টমার খাচ্ছে। আমরা দুই বন্ধু খালি থালা সামনে নিয়ে বসে আছি।

সবাই খাচ্ছে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছি, তাও আবার সামনে খালি থালা নিয়ে। এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না। আমরা তো জানি রবি দা আসবে না, তারপরও রবি দা এখনো আসছে না কেন? চলতো গিয়ে দেখি – বলতে বলতে এক সময় দুজনে হোটেল থেকে বেড়িয়ে এলাম। তখন দুপুরবেলা আমরা যেখানে থাকি সেই পাড়ার এক বাড়িতে ডেকোরেশন হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, দাদা এখানে কী হবে?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, সন্ধ্যায় কীর্তণ হবে।

শুনে আমরা তো মহাখুশি। কীর্তণ হবে। মানে কীর্তণের প্রসাদ হিসেবে নিশ্চয়ই খিচুড়ি খাওয়াবে। বেজায় আনন্দ নিয়ে দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখন সন্ধ্যা হবে, কখন কীর্তন হবে, কখন আমরা খিচুড়ি খাব। দু'জনে যুক্তি করছি, আমরা আগে খাব তারপর অন্য বন্ধুদের খরব দেবো। নইলে আবার কোন ভেজাল বেধে যায়। রবি দা আবার যদি কীর্তণে আসা, খিচুড়ি খাওয়া আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করে। তাই ঠিক করলাম আমাদের খাওয়ার আগে কাউকে জানাবই না।

সন্ধ্যার আগেই আমরা দুই বন্ধু এসে হাজির হলাম। তখনো কেউ আসেনি। বাড়ির বাইরের লোকদের মধ্যে আমরাই সবার আগে এসেছি। বাড়ির গৃহকর্তা ইশারায় সামনে বিছানো হোগলায় বসতে বললেন। আমরা বসে পড়লাম। আমরা কোনো কথা বলছি না। কীর্তণ শুরু হলো। হরে রামো, হরে রামো, হরে কৃষ্ণ, হ ... রে হ ... রে। কীর্তণ শেষে গৃহকর্তী মা আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে প্রসাদ মানে খিচুড়ি খাওয়ালেন। আমরা খুব খেলাম। যত দিলেন ততই খেলাম। নিষেধ করলাম না। যে যত্ন করে খাওয়ালেন মনে মনে ভয় পেলাম, যদি টের পায় আমরা মুসলমান, তাহলে আর দেহে প্রাণ থাকবে না। দেহটাও থাকে কিনা সন্দেহ। সবাইকে খবরটা দিলাম। পরি কি মরি করে দৌড়ে গেল সবাই। পরদিন দুপুরে পুকুরপাড়ে গেলাম চান করতে, চান মানে গোসল। আমরা তো সবাই হিন্দু তাই গোসলকে চান বলতে হচ্ছে। পানিকে জল বলতে হচ্ছে। এর কোনো ভুল-ভ্রান্তি হলে সর্বনাশ, উপায় থাকবে না। শান বাঁধানো পুকুর, পুকুরপাড়ে বসে আছেন সেই গৃহকর্তা। আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল প্রসাদ খেয়েছিলে?

আমরা বললাম, জ্বী খেয়েছি।

ব্যস! বৃদ্ধ গৃহকর্তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। বার কয়েক আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর দ্রুত চলে গেলেন। আমি ভয় পেলাম। মনেমনে খুঁজতে লাগলাম কি ক্রটি হলো। কিন্তু কোনো ক্রটিই খুঁজে পেলাম না। আমরা তাড়াতাড়ি চলে এলাম। ঐ রাস্তায়ই আর গেলাম না। কাউকে কিছু বললামও না। আমাদের মধ্যে যে সত্যিকার হিন্দু বন্ধু ছিল জ্যোতির্ম ওকে একদিন ঘটনাটা বলায় জ্যোতির্ময় বলল, বেঁচে গেছিস, ধরা পড়ে গিয়েছিলি তোরা হিন্দু না।

কীভাবে?

ঐ যে জ্বি খেয়েছি বলেছিস।

তাহলে কী বলতে হবে?

বলতে হবে আজ্ঞে খেয়েছি। জ্বি বলা যাবে না। জ্বি'র স্থলে আজ্ঞে বলতে হবে। জ্বি মুসলমানরা বলে।

বাঘা সিদ্দিকীর কাছে যাওয়া

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬। রাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সেক্রেটারি রাধু গুপ্ত এসে বললেন, আগামীকাল সকালে কাদের সিদ্দিকীর কাছে যাওয়ার জন্য তোমরা তৈরি হও।

শুনে আমরা তো মহা আনন্দিত। যাক, আল্লাহপাক এই কর্মহীন ক্ষুধার্ত জীবন থেকে বাঁচালো। রাধু গুপ্ত বাবু আমাদের হাতে আগরতলা টু ধর্মনগর বাসের দশটি টিকিট এবং ত্রিশটি এ্যাডোমিন (বমি বন্ধ হওয়ার) ট্যাবলেট দিলেন। আমরা হতবাক হয়ে বলে উঠলাম, ত্রিশটা এ্যাডোমিন!

রাধু বাবু বললেন, দোকানে আর ছিল না তাই বেশি দিতে পারি নাই, তোমরা সকালে যাওয়ার সময় আরো কিছু এ্যাডোমিন নিয়ে নিও। কথা শুনে আমরা সবাই হেসে দিয়ে বললাম, এতো এ্যাডোমিন ট্যাবলেট দিয়ে কী হবে? রাধু গুপ্ত হেসে হেসে বললেন, কাছে রেখ কাজে লাগবে।

তারপর আমাদের দুই হাজার টাকা দিয়ে বললেন, খুব চেপেচেপে খরচ করবে, মনে রাখবে ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না। সবশেষে কাদের সিদ্দিকীর কাছে যাওয়ার রাস্তা সম্পর্কে বললেন, প্রথমে ধর্মনগর রেলওয়ে জংশন। সেখান থেকে ট্রেনে করে আসাম রাজ্যের রাজধানী গোহাটি হয়ে ধুবরী, তারপর বাসে এবং হেঁটে মহেন্দ্রগঞ্জ বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) ক্যাম্পে যেতে হবে। এবং সেখান থেকে বিএসএফ আমাদেরকে কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম–এর কাছে পৌঁছে দেবে।

পরদিন সকাল ০৭:৩০ টায় আগরতলা টু ধর্মনগর বাসে উঠে বসলাম। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ০৭:৩০ মিনিটে বাস ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলো। বাসের সুপারভাইজার বলল, আপনারা সকলেই বমির ট্যাবলেট এ্যাডোমিন খেয়ে নিন। কারো দরকার হলে আমাদের কাছ থেকে ট্যাবলেট নিতে পারেন।

বাস চলতে শুরু করল। মিনিট বিশেকের মধ্যেই আমাদের বাস উঁচু পাহাড়ে উঠলে লাগল। কী অদ্ভুদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! চারদিকে শুধু গাঢ় মনোরম সবুজের সমারোহ। উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ। পৃথিবী যেন নীল আর সবুজ এই দু'রঙ–এ বিভক্ত। উপরে নীল আকাশ, তারই নিচে গাঢ় সবুজ পৃথিবী। মনোরম গাঢ় সবুজের ভিতর দিয়ে আমাদের বাসটি চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের উপর উঠে

যাচ্ছে। আবার ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই বাসের মহিলা যাত্রীদের বমি শুরু হয়ে গেছে। সেই সাথে কিছু পুরুষ যাত্রীও বমি করা শুরু করছে। বাসের তীর্ব ঘূর্ণনের ফলে আধাঘন্টার মধ্যেই মহিলা যাত্রী সকলে বমি করে ফ্লাট। মহিলাদের গায়ের কাপড়-চোপড় বেসামাল। পুরুষ সঙ্গীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও মহিলাদের কাপড় গায়ে রাখতে পারছে না। এরই মধ্যে পুরুষ যাত্রীদের অর্ধেক বমিতে শামিল হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের কয়েকজনও আছে। এ্যাডোমিন ট্যাবলেট খাচ্ছে আর বমি করছে। এতক্ষণ পুরুষেরা শাড়িপড়া মহিলাদের কাপড় সামলানোর বৃথা চেষ্টা করেছে। আর এখন কে কাকে সামলায়। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমি আর টাঙ্গাইলের বাবর আলী ছাড়া বাসের মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সকল যাত্রীই বমি করে ফ্লাট। কাপড়-চোপড় বেসামাল মহিলাদের দিকে তাকিয়ে দেখা তো দূরে থাক, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকা মহিলার দিকেও তাকাবার কেউ নেই। কারো সামর্থ্য নেই। আমার অবস্থাও কাহিল। চতুর্দিকের গাছের গাঢ় সবুজ রঙ আর নীল রঙ যে কত পীড়াদায়ক তা আগড়তলা টু ধর্মনগর এই রাস্তায় যে যায়নি সে কখনই বুঝবে না। ঘন্টা দুই পর পাহাড়ের একটা চওড়া প্রশস্ত মাঠের মতো জায়গায় বাসটি থেমে গেল। বাবর আলী আর আমি বাস থেকে নেমে এলাম। এখানেও সেই পীড়াদায়ক গাঢ় সবুজ আর নীল ছাড়া অন্য কোনো রঙ নেই। নেই অন্য কোনো কিছু। বাসে সুপারভাইজার জানালেন, এখানে আধাঘন্টা রেস্ট।

বাস থামতে আর এক দুই মিনিট দেরি হলেই আমিও বমি করে দিতাম। সুপারভাইজার বলল, তাড়াতাড়ি এ্যাডোমিন ট্যাবলেট খেয়ে নিন। বমি শুরু হয়ে গেলে আর খেয়ে লাভ হবে না। আমরা চট করে এক সঙ্গে দুটো করে এ্যাডোমিন খেয়ে নিলাম। সুপারভাইজানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের বমি হয় না?

উত্তরে বলল, প্রথম প্রথম হতো এখন হয় না। প্রতিদিন যাওয়া আসা করি তো সয়ে গেছে, তাছাড়া আমরা রাত থেকেই ট্যাবলেট খেতে থাকি। রাতে দুটো খাই। সকালে খালি পেটে দুটো, নাস্তার পর দুটো খাই, তারপর বাসে উঠি।

আমি আর বাবর আলী ঘাসের উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ি। বাসের অন্যান্য যাত্রীরাও শুয়ে পড়ে। আধা ঘন্টা পড়ে বাসের চালক যাত্রীদের বাসে উঠার জন্য হর্ণ বাজাতে থাকে। আমরা সবাই বাসে উঠে পড়ি। বাস চলতে থাকে। ঘন্টা তিনেক পর ধর্মনগর এসে বাস থামল। আমরা বাস থেকে নেমে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে গোহাটি হয়ে ধুবরী যাওয়ার টিকিট কাটলাম। ধর্মনগর রেলওয়ে জংশন ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনের চাইতেও বেশ বড়। ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে কলকাতাসহ সমস্ত ভারতের এটাই হচ্ছে স্থলপথে একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্টেশনে লুচি বিক্রি হচ্ছিল। আমার খুবই লুচি (পুরী) খেতে ইচ্ছে করছিল। মজিবর রহমান নিহার

(বর্তমানে পরলোকবাসী। রংপুরের কুড়িগ্রাম–এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের আঠারজনের এক সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের চৌদ্দজন নিহত হয়। এই নিহতদের মধ্যে নজিবর রহমান নিহার একজন) এর কাছে রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে সরকারি আমলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোক্তাদির চৌধুরী) আমাদের সকলের টাকা একসঙ্গে দিয়েছিল। আমি নজিবর রহমান নিহারের কাছে লুচি (পুরী) খাওয়ার জন্য টাকা চাই। কিন্তু নিহার আমাকে টাকা নষ্ট করা যাবে না বলে বিমুখ করে। আমি অনেক বলি, অনেক বার বোঝাবার চেষ্টা করি যে, আমার লুচি (পুরী) খেতে খুবই মন চেয়েছে। আমি এও বলি রাতের খাবারের পরিবর্তে আমি লুচি খাব, আমাকে দুই টাকা দেয়া হোক। কিন্তু কিছুতেই নজিবর রহমান নিহার আমাকে লুচি খাওয়ার জন্য দুই টাকা দেয়নি। আমার আজও এই বিশ-বাইশ বছর পরও মনে হয় নিহার আমাকে লুচি খাওয়ার জন্য টাকা না দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। অন্যায় করেছে। বোধহয় এরই নাম দিন যায় কথা থাকে। আমরা সকলে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন ছেড়ে দিলো। ট্রেন একসময় আসামের রাজধানী গৌহাটি স্টেশনে থামল। আমরা ট্রেনে বসেই মনমুগ্ধকর মনোরম পাহাড়িয়া শহর গৌহাটিকে দেখলাম। সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলায় ভরপুর পাহাড়িয়া গৌহাটি শহর। দেখে মনে হয় থেকে যাই। গৌহাটি স্টেশন থেকে ট্রেন পাল্টিয়ে আমরা ধুবরীর ট্রেন–এ উঠলাম। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য পাড়ি দিয়ে, আসাম রাজ্যের পুরো রেলপথ অতিক্রম করে আমরা ধুবরী এসে ট্রেন থেকে নেমে বাসে করে খুব সম্ভবত বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদীর ভারতীয় অংশের পাড়ে এলাম। ইঞ্জিন চালিত নৌকায় বিশাল চওড়া এই নদী পার হয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে প্রবেশ করলাম। তারপর মেঘালয়ের পাহাড়িয়া জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকলাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে এলো। সেই দুপুর থেকে হাঁটতে শুরু করেছি, এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। ক্লান্ত বিষণ্ন ক্ষুধার্ত দেহ আর চলতে চায় না। কিন্তু না চলে উপায় কী? ঘুটঘুটে অন্ধকার, মাঝে মাঝে জঙ্গলের জীব-জন্তুর জ্বল জ্বলে চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এর মধ্যেই আমরা দশজন তরুণ একই উদ্দেশ্যে অজানা পথ চলছি। আরো কিছুদূর এগুতেই অন্ধকারে ছায়ার মতো মনে হলো ঐটা বিএসএফ ক্যাম্প হতে পারে। উচ্চস্বরে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম– এ ভাইয়া, ইয়ে বিএসএফ ক্যাম্প হ্যায়?

বলতে বলতে আর একটু এগুতেই “হোল্ড হ্যান্ডসাফ” বলে বিএসএফ সেন্ট্রি তেড়ে উঠল। আমরা সবাই হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিন-চারজন বিএসএফ আমাদের দিকে টর্চ মেরে হাতে অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলো। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, তুম লোক কোন হ্যায়?

আরো পাঁচ-সাত জন বিএসএফ এসে আমাদের ঘিরে ফেলে বলল, হাত নামাইয়ে।

আমরা হাত নামালাম। একজন বিএসএফ ‘তুম লোক ইহা ঠেরো হাম আরা হায়’ বলে ক্যাম্পের ভিতরে চলে গেল। আমরা বললাম, হাম লোক ইধার ব্যাঠ ছেকতা হ্যায়?

বিএসএফ বলল, ব্যাঠে ব্যাঠে।

আমরা মাটিতে বসে পড়লাম। প্রথমে একটু হাতের উপর ভর দিয়ে বসলাম,তারপর মাটিতে শুয়ে পড়লাম। দেহের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। বিএসএফ–র ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। তারপর কড়া পাহারায় আমাদের ক্যাম্পের ভিতর নিয়ে গেলে একজন মেজর আমাদের সাথে কথা বলল। তাকে আমরা বিস্তারিত বললাম এবং আমাদের খেতে দেয়া ও বিশ্রাম নিতে দেয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য আবেদন করলাম। তিনি দশজন বিএসএফ দিয়ে বললেন, উনলোককা সাথে যাইয়ে।

বিএসএফ–এর সাথে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। রাত্রি শেষ হলো আমাদের হাঁটা শেষ হলো না। পূর্বাকাশ রঙ্গিন করে সূর্য উঠল। আমরা চলতেই থাকলাম। পাঁচ-ছয় মাইল দূরে আরেকটা বিএসএফ ক্যাম্পে এসে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলে নতুন বিএসএফ দল আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আমরা তাদের কাছেও খাওয়ার আবেদন করলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। বেলা বারোটার দিকে অন্য একটা ক্যাম্পে আমাদের এনে দুটা রুটি আর বুটের ডাল খাওয়ানো হলো। পেটে প্রচন্ড খিদে মুহূর্তের মধ্যে রুটি শেষ হয়ে গেল। আমাদের খাওয়ার জন্য আধা ঘন্টা সময় দেয়া হয়েছিল। আধা ঘন্টা পর আবার আমাদের নিয়ে বিএসএফ হাঁটা শুরু করল। একটার পর একটা ক্যাম্প আর দল বদলের মাধ্যমে আমরা হাঁটতেই লাগলাম। এইভাবে দুই দিন দুই রাত এক নাগারে বিরামহীন হেঁটে আমরা মহেন্দ্রগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে পৌছালাম। এখানে বিএসএফ–এর একজন ব্রিগেডিয়ার আমাদের পৃথক পৃথকভাবে সারারাত জিজ্ঞাসাবাদ করে। ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে আমাদের মনে হলো আজ রাত বারোটার পরই তো একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান শহীদ দিবস। সিদ্ধান্ত নিলাম শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করার। ছয়টি টিন (তৈল বা মুড়ির টিন) আর গায়ের চাদর দিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের মাঠে আমরা তৈরি করলাম অস্থায়ী কৃত্রিম শহীদ মিনার। রাত বারোটা এক মিনিটে (১) গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, (২ মোবারক হোসেন সেলিম, (৩) আব্দুর রউফ শিকদার, (৪) এস, এ কাইয়ূম খসরু, (৫) নজিবর রহমান নিহার, (৬) নওশের আলী নসু, (৭) বাবর আলী, (৮) লিয়াকত হোসেন জাহাঙ্গীর, (৯) জ্যোর্তিময় বিশ্বাস

এবং (১০) আমি মতিউর রহমান রেন্টু, আমরা এই দশজন লাইন ধরে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত, শহীদ আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক অমর গান "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি" গাইতে গাইতে মাঠ প্রদক্ষিণ করে আমাদের তৈরি শহীদ মিনারে পুষ্প-অর্পণ করি। মহেন্দ্রগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের প্রায় সকল সদস্য গভীর কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধার সাথে এ দৃশ্য অবলোকন করেছে।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম–এর পক্ষ থেকে সাভারের মাহাবুবুর রহমান মাহাবুব মহেন্দ্রগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে প্রথম আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দিন দশেক পর আমাদেরকে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জাতীয় মুক্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার চান্দুভূইতে নেয়া হয়। চান্দুভূই নামক স্থানে দুই পাহাড়ের মাঝখানে যেখানে দিনে সূর্য দেখা যায় না, আকাশও দেখা যায় না, জঙ্গলের ভিতর এমন একটি স্থানে খড়কুটো দিয়ে কোনো রকমে বানানো ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো।

আদিম যুগে মানুষ যখন পাহাড়ে-জঙ্গলে বাস করত, তখনো হয়ত মানুষ থাকার জন্য এর চাইতে ভালো ঘর করেছিল।

বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম এর কাছে এলাম। কিন্তু দুঃখ গেল না। দুঃখ সঙ্গেই রয়ে গেল। এখানেও ক্ষুধার যন্ত্রণা। প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় একবার খাওয়া। বেলা বারোটার দিকে নারিকেলের আচার এক আড়া ভাত, সঙ্গে সামান্য ডালের পানি। পরের দিন আবার বেলা বারোটায় ঐ পরিমাণ ভাত। অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা পর পর একবার যৎসামান্য ভাত। চান্দুভূই পৌঁছার তিন দিন পর বাঘা কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। বাঘা সিদ্দিকী আমাদের প্রথম দর্শনেই বললেন, কষ্টের আগুনে জ্বলেজ্বলে অঙ্গার হতে হবে, তারপর দেশ সেবা করতে হবে। যদি পারো, তাহলে তোমরা আমার সাথে থাকো, না পারলে ভাই চলে যাও।

তিনি আরো বললেন, হাসি মুখে কষ্ট করতে না পারলে দেশ সেবা করা যাবে না। দেশ সেবার মানেই হচ্ছে কষ্ট করা। ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের চাইতেও আরো বেশি কষ্ট করতে হবে। আরো বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ১৯৭১–এ আমরা সবকিছুই সহজে পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই জাতির জীবনে আজ এই বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাই বলি ভাই, যদি কষ্ট করতে পারো, যদি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে পারো, তাহলে থাকো, নাইলে চলে যাও।

প্রতি উত্তরে আমরা বললাম, আমরা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবো। তবু আপনার সাথে দেশের কাজ করব। সাথীদের প্রায়ই আমি বলতাম, পৃথিবীতে এমন কোনো

লেখন আছেন, এই জায়গা এই পরিবেশ, এই ঘটনা নিয়ে লিখে মানুষকে বুঝাতে পারবে?

প্রতিবাদ যুদ্ধ

আমরা অধিকাংশই ১৯৭১–এর মুক্তিযোদ্ধা। তাই সামরিক ট্রেনিং–এর বিশেষ প্রয়োজন হলো না। মাসখানেক ট্রেনিং–এর মহড়া দিয়েই আমরা সরাসরি ডিফেন্সে চলে গেলাম। ডিফেন্স মাসে সীমান্ত এলাকায় আমাদের ক্যাম্প। আমরা দশজন বিচ্ছিন্ন হয়ে একেক ক্যাম্পে একেকজন চলে গেলাম। আমি গেলাম ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট সীমান্তের ক্যাম্পে।

সিদ্ধান্ত হলো – গেরিলা যুদ্ধের জন্য দেশের ভেতরে গিয়ে শেখ মুজিব অনুসারী যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে গেরিলা ক্যাম্প গড়ে তোলা।

জি থ্রি অটোমেটিক রাইফেল, পাকিস্তানের তৈরি এই রাইফেল। ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত এই জি থ্রি রাইফেলসহ পাকিস্তানি অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল। এমএমজি (মিডিয়াম মেশিনগান), স্টেনগান, সিক্স ইঞ্চ (ছয় ইঞ্চি) মর্টারসহ আমরা আঠারোজন যোদ্ধ বৃহত্তম সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করি। আমাদের আরো কয়েকটি গ্রুপ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দেশের ভেতরে প্রবেশ করে।

সুনামগঞ্জের অধিকাংশ জায়গা হলো হাওড় অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট হলো হিন্দু এবং মুসলমান পৃথক পৃথক গ্রামে বাস করে। যে গ্রামে হিন্দু বাস করে তার পাঁচ সাত মাইল পর অন্য একটি গ্রামে মুসলমান বাস করে, তার পাঁচ সাত মাইল পর আবার হিন্দু গ্রাম। এখানে সব পরিবারই কৃষিপণ্য নির্ভর। একেক পরিবার পাঁচ-সাতশ, এমনকি হাজার বারশো মণ ধান পায়। তবে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরাই বেশি ধনী। এখানে পনের বিশ মাইলের মধ্যে কোনো পাকা বা পিচ–এর রাস্তা নেই। হাওড় এবং নিম্ন অঞ্চল হওয়ায় প্রচুর ফসল হয়। নগর বা শহর সভ্যতা কী জিনিস এখানকার মানুষ জানে না। এখানে কোনোদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেনি। হিন্দুরা মহা উৎসবে মহা আনন্দে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে। নগর সভ্যতার আলো এখানে পৌঁছায়নি, হয়ত তাই সংখ্যালঘুর দুঃখ, সংখ্যাগুরুর অত্যাচার কোনো কিছুরই লেশমাত্র নেই।

দিনের বেলায় একটি হিন্দু গ্রামে চুপচাপ বসে থাকা খাওয়া-দাওয়া, সন্ধ্যা হলেই অন্য একটি হিন্দু গ্রামের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাত্রা করা। এভাবে একটি হিন্দু গ্রাম থেকে

আট-দশ মাইল কিংবা তার চেয়েও দূরের আর একটি হিন্দু গ্রামে সারারাত ধরে হেঁটে যাওয়া। সারারাত হাঁটার পথে অন্য কোনো গ্রাম পড়ে না তা নয়। কিন্তু সেই গ্রামে ওঠা যাবে না। কারণ ঐ গ্রাম মুসলমানের। আমাদের কমান্ডার রক্ষী বাহিনীর ডেপুটি লিডার সুকুমার সরকার–এর এক কথা – কোনো মুসলমান গ্রামে ওঠা যাবে না। কারণ মুসলমানরা আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে ধরিয়ে দেবে। তাই আমরা কোনো মুসলমান গ্রামে উঠি না। সন্ধ্যা হলেই আমরা হাঁটা শুরু করি। সারারাত হেঁটে এক হিন্দু গ্রাম থেকে আর এক হিন্দু গ্রামে গিয়ে উঠি। এভাবে দিনে খাওয়া-দাওয়া চুপচাপ বসে থাকা এবং সারারাত হাঁটা। দিন দশেক পরেই শরীর কাঁপতে লাগল। প্রথমে আমি ভাবলাম এটা বুঝি আমার কোনো রোগ। পরে দেখি সকলেরই শরীর কাঁপছে এবং সকলেই আমাকে তাদের শরীরের অবস্থা অবহিত করছে।

কিন্তু শরীর যতই কাঁপুক রাতে তো হাঁটতে তো হবেই। হাঁটা ছাড়া আমাদের বিকল্প কিছুই নেই। একদিন সন্ধ্যার পর হাঁটতে শুরু করলাম। নিশিরাত পার হয়, কিন্তু হিন্দু গ্রাম আর আসে না। সামনে আবছা একটা গ্রাম দেখা যায় কিন্তু ঐ গ্রামে ওঠা যাবে না। ওটা মুসলমানের গ্রাম। রাত শেষে ভোর হয় হয় ভাব। আমাদের সকল সাথী বেঁকে বসল। তাদের শরীর আর চলছে না, আর হাঁটতে পরছে না। সকলের এক দাবি। এই গ্রামেই উঠতে হবে। এই গ্রামেই আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু কমান্ডার সুকুমার সরকারের ঐ একই কথা – এটা মুসলমান গ্রাম, এই গ্রামে ওঠা বা আশ্রয় নেয়া যাবে না। এর পরের গ্রাম হিন্দু। সেই গ্রামে আশ্রয় নেয়ার জন্য উঠতে হবে।

এই কথা শুনে সবাই বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। সামরিক ভাষায় যাকে বলে ট্রপস আউট অফ অর্ডার। সুকুমার সরকার আর আমি দাঁড়িয়ে। বাকি সবাই যে যার মতো কুয়াশায় ভেজা ঘাসের উপর শুয়ে-বসে। সুকুমার বাবু আমাকে বললেন, বাচঁতে চাইলে ট্রূপস উঠাও।

আমি শত চেষ্টা করেও কাউকেই উঠাতে পারলাম না। অবশেষে কমান্ডার সুকুমার আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, শালার ভায়েরা আমার কী? বেকটুইন (সকলেই) মরবে, চল এই মুসলমান গ্রামেই উঠি। বলে গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সবাই উঠে হাঁটতে লাগল। সুকুমার বাবু এবার মুসলমান গ্রামের দিকেই চলতে লাগল। মিনিট পনের মধ্যেই আমরা আশ্রয় নেয়ার জন্য মুসলমান গ্রামে উঠে পড়লাম। মূল মাটি থেকে পনের বিশ ফিট উঁচু, সাত আট শত ফুট লম্বা, একশত ফুট চওড়া এবং পঞ্চাশ ষাটটি ঘরের গ্রামে যে যেদিক দিয়ে পারে ঢুকল এবং যে ঘরে

পারে শুয়ে পড়ল। সারাগ্রামে ডাকাত ডাকাত বলে সোর পড়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম, ভাই সব, আমরা ডাকাত না। আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমরা ডাকাত নই। আপনারা হইচই বন্ধ করুন, আমরা ডাকাত নই।

এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে বললাম, আপনারা চুপ না করলে আমরা আপনাদের গুলি করতে বাধ্য হব।

বলেই জি থ্রি অটো রাইফেল তাক করলাম। কিছু লোক কথায় এবং ভয়ে চুপ করল। আমি গ্রামের পুরুষদের বললাম, আপনারা মসজিদে আসেন। ফজরের নামাজের পর আপনাদের সাথে আমাদের কথা আছে। এখানকার গ্রাম দেশের অন্যান্য গ্রামের মতো নয়। এই গ্রাম মূল মাটি থেকে বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু পাঁচ- সাত শত বা হাজার ফুট লম্বা পঞ্চাশ ফুট চওড়া করে মাটি ফেলে তার উপর পরিকল্পিতভাবে দুই সারিতে ঘর, এক কোণায় মসজিদ, পাঠশালা তৈরি করা। মসজিদে ফজরের আযান শেষে নামাজ হলো।

আমাদের কে যে কোন ঘরে কোথায় ঘুমিয়ে নাক ডাকছে তার কোনো হদিস নেই। একমাত্র আমি গ্রামের মানুষের ভীড়ে উপচে পড়া মসজিদের বারান্দায় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি। ভাই সব, আমরা ডাকাত নই। আমরা যদি ডাকাত হতাম, তাহলে এতক্ষণে আপনাদের জানমাল ধনসম্পদ লুট করতাম। কিন্তু কই, আমরা তো আপনাদের কিছুই লুট করছি না। কারণ আমরা ডাকাত নই। আমরা হলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সৈনিক। আপনারা হয়ত জানেন না জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আর তাই ঐ হত্যার প্রতিবাদে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। আমরা ডাকাত নই। আমরা শেখ মুজিবের সৈনিক। আমরা বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি এবং এই যুদ্ধের প্রয়োজনেই আমরা আজ আপনাদের কাছে আশ্রয়ের জন্য এসেছি। আমরা আপনাদের সন্তান। আপনারা আমাদের পিতা-মাতার মতো। শুধু আজকের দিনের জন্য একটুখানি আশ্রয় আমরা আপনাদের কাছে চাই। আমার বক্তৃতা শুনে গ্রামের এক মহিলা বলল, উমা ডাকাত দেখি ভালো ভালো কথা বলে।

তোতা পাখির মতো আরো কত কিছুই না বোঝালাম। গ্রামবাসিও বুঝল। আমি মসজিদের বারান্দায় অস্ত্রটা বুকের ভিতর জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। গ্রামবাসীর ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গল।

গ্রামবাসী আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, স্যার, আসেন আপনাদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি বললাম, আপনি যান আমি আসছি।

তিনি বললেন না, আমার সাথেই যেতে হবে। আপনাদের জন্য আমরা খাসি জবাই করেছি।

আমি উনার সাথে যেতে থাকলাম। একটা ঘরে আমাকে আমার আরো তিনজন সাথীসহ খাওয়াতে বসানো হলো। খেতে বসে দেখলাম সত্যি সত্যিই খাসির মাংস দিয়ে খেতে দিয়েছে। মনে মনে নিজেই নিজের বক্তৃতার প্রশংসা করতে লাগলাম, আর গর্ববোধ করতে লাগলাম। আমার বক্তৃতার এমনই যাদু এবং আমি মানুষকে এমনভাবেই বুঝাতে পারি যে, গ্রামের মানুষ খাসি জবাই দিয়ে আমাদের খাওয়ায়। আহ্, কি আমার যোগ্যতা!

খাসির মাংস দিয়ে পুরো পেট ভাত খাওয়া শেষে এলো দুধ। পেটে জায়গা না থাকায় দুধ ভাত খেতে অক্ষমতা জানালাম। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান–এর ভক্ত গ্রামের মানুষেরা নাছোড়বান্দা। দুধভাত খেতেই হবে। তাদের অনুনয়ের কাছে নতি স্বীকার করে দুধভাত খেতে বসলাম। লোকমা দুধভাত তুলে যেই মুখে দিতে গেলাম। অমনি আচমকা গুলি শুরু হলো। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বাঁশে বেড়া ভেদ করে ঘরে ঢুকতে লাগল। বা'হাতে থাকা জি থ্রি রাইফেল নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। মুহূর্তের মধ্যেই পাল্টা গুলি করতে করতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা আমাদের তিন দিক থেকে ঘেরাও করে হামলা করেছে। এতক্ষণে বুঝলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ভক্ত, অনুরাগী সমর্থক সহজ-সরল গ্রামের মানুষের খাসি জবাই করে ও দুধভাত খাওয়ানোর প্রকৃত রহস্য। তিনচার শত লোকের বাস এই গ্রামে। গ্রামে কোনো মহিলা নেই, শিশুও নেই, এমনকি পুরুষও নেই। রয়েছি শুধু আমরা আর আমাদের সামনে, ডান দিকে এবং বাম দিকে – এই তিন দিক ঘেরাও করা আর্মির সৈন্যরা।

আমাদের পিছনে হাওড়। হাওড় মানে কুল-কিনারাবিহীন এক বিশাল জলাশয়। আমাদের ত্বরিৎ পাল্টা আক্রমণে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ফজরের নামাজের পর গ্রামের মানুষদের আমাদের সম্পর্কে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝানোর পর আমরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন গ্রামে মানুষেরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল (পরবর্তীকালে ডিজিডিএফআই, মেজর জেনারেল এবং রাষ্ট্রদূত চীফ অফ বাগদাদ জেনারেল মাহামুদুল হাসান নন) মাহামুদুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং জেনারেল (ঐ সময়ের কর্নেল) মাহামুদুল হাসানের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের খাওয়ার জন্য খাসি জবাই করে মাংস এবং দুধভাত খাওয়ার আয়োজন করা হয়। আমরা ঘুমে থাকতেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য রেখে গ্রামের বাকি মহিলা, শিশু এবং পুরুষ সকলকেই অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। হিসেবটা এই রকম ছিল, আমরা খাসির মাংস

আর দুধভাত খেতে ব্যস্ত থাকব, আর মাহামুদুল হাসানের সৈন্যরা তিন দিক থেকে ঝটিকা আক্রমণ করে আমাদের জীবিত ধরে নিয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে থাকা অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সম্পর্কে মাহামুদুল হাসানের সঠিক ধারণা ছিল না। তিনি আমাদের আন্ডার ইস্টিমেট করেছিলেন। অস্ত্রসস্ত্রে দূর্বল মনে করেছিলেন। ফলে প্রায় তিন শতাধিক সৈন্য নিয়ে, তিন দিক থেকে ঘেরাও করে আক্রমণ করেও আমাদের কাবু করতে পারেননি। আমরা ত্বরিৎ পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে মাহামুদুল হাসানের আক্রমণ প্রতিহত করে দেই। জেনারেল মাহামুদুল হাসান হেলিকপ্টারের সাহায্যে অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। আমরা হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে সিক্স ইঞ্চ মর্টার থেকে গোলা নিক্ষেপ করলে হেলিকপ্টার পালিয়ে যায়। কিন্তু ইতোমধ্যেই জেনারেল মাহামুদুল হাসান তার সৈন্যবল ও অস্ত্রবল বিপদজনক মাত্রায় বৃদ্ধি করে। প্রচণ্ড গতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লক্ষ্য আমাদের জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় পরাস্ত করা। আর আমাদের লক্ষ্য প্রাণে বাঁচা। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে আমাদের অবস্থান ছিল অনেক সুবিধাজনক। কারণ আমরা ছিলাম গ্রামে অর্থাৎ উঁচু জায়গায়। আর সেনাবাহিনী ছিল ধান ক্ষেতে অর্থাৎ নিচু জায়গায়। যুদ্ধে আমাদের মিডিয়াম (এমএমজি) মেশিন গান চালক উপজাতীয় গাড় তরুণ আশু মারাক ও তার অল্পবয়সী তরুণ সহকারী চালক দিনবন্ধু মারাক ফিলিমের নায়কের মতো অভূতপূর্ব সাহসিকতার সাথে একশত রাউন্ড গুলির এক চেইন বিশিষ্ট এমএমজি মিডিয়াম মেশিনগান) চালাতে থাকে। এমএমজি–এর সামনে দুটি পা আছে। এই পা দুটি মাটিতে রেখে, শুয়ে থেকে তার পর এমএমজি চালাতে হয়। কিন্তু আশু মারাক এই রীতি বা প্রশিক্ষণের তোয়াক্কা না করে একশত রাউন্ড গুলির এক চেইন এমএমজি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে সিনেমার নায়কের মতো শত্রুকে ঘায়েল করতে লাগল। আর তার সাথে তাল মিলিয়ে কিশোর তরুণ যুবক দিনবন্ধু চেইনে দ্রুত একশত রাউন্ড গুলি ভরে চেইন এমএমজিতে ফিট করে দিতে লাগল। সিনেমায় যেমন নায়ক একের পর এক শত্রু নিধন করে যায় কিন্তু নায়কের গায়ে গুলি লাগে না, বাস্তব যুদ্ধেও আশু মারাক ঐ রকম একের পর এক শত্রু নিধন করে যেতে লাগল। কিন্তু আশু মারাকের গায়ে শত্রুর গুলি লাগল না। আমরা প্রকৃত অর্থে চারদিক থেকেই ঘেরাও। আমাদের পালাবার কোনো পথ নেই। কারণ তিন দিকে সেনাবাহিনী আর এক দিকে কুল-কিনারাবিহীন হাওড়ের বিশাল জলরাশি। পালাবার কোনো পথ নেই। জেনারেল মাহামুদুল হাসানের ধারণা ছিল আমরা আর কতক্ষণ যুদ্ধ করব? এক ঘণ্টা, দুই ঘন্টা, পাঁচ ঘন্টা, দশ ঘন্টা, চব্বিশ ঘন্টা, একদিন, দুইদিন? তারপর কি? হয় মৃত্যু, না হয় বন্দী। আসলেও তাই, আমাদের তো

পালাবার কোনো পথই নেই। প্রচণ্ড যুদ্ধ কেউ কারো নাহি ছাড়ে সমানে সমান। আমি চিন্তিত হলাম। ক্রলিং করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে নিজেদের সর্বশেষ অবস্থানটা দেখে নিলাম। যুদ্ধ শুরু হয়েছে দুপুর বেলা, এখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। মনে মনে শেলফ্ ডিসিশনটা কী নেব ভাবতে লাগলাম। ধরা পড়ব, না আত্মহত্যা করব। ঠিক এমন সময় আমাদের কমান্ডার সুকুমার বাবু ঠিক এই ভাষায়, "কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যত" বলেই আমাকে বললেন, ঐ উত্তর দিকে হিজল গাছগুলোর আড়ালে যে সৈন্যগুলো আছে, তাদের যদি এক ঝটিকা আক্রমণে নিহত বা সরিয়ে দিতে পার তাহলেই কেবল আমরা বাঁচতে পারি।

কারণ ঐ একটিই মাত্র পথ আছে পালাবার। কমান্ডারের কথাটা শুনে এতক্ষণ মনে মনে যে শেলফ ডিসিশনের কথা ভাবছিলাম তার সুরাহা হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, হয় সেনাবাহিনীদের নিহত বা তাড়িয়ে দেবো অথবা নিজেই মরব। তিনজন সাথী বন্ধুকে ইশারায় কাছে ডাকলাম। আমিসহ চারজনের একটা সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করলাম। যদিও পরিস্থিতি ও পরিবেশে আমরা সকলেই সুইসাইড স্কোয়াড মেম্বার হয়ে গেছি, তারপর একটা সামান্য আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে একে অপরের সাথে করমর্দন করে গুলি করতে করতে হিজল গাছের বাগানের দিকে ঝটিকা আক্রমণ করলাম। নিজেদের গায়ে গুলি লাগতে পারে সেই পরোয়া করলাম না। শুধু আক্রমণ আর সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। যুদ্ধের ধরণ গেল পাল্টে। এতক্ষণ আমরা শুধু শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে আত্মরক্ষার্তে পাল্টা আক্রমণ করেছি। শত্রুর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আমাদের দিকে আসছে। এতে আমাদের কোনোই ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা তো মরার জন্যই এসেছি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা হিজল বাগান দখল করে ফেললাম। আর্মির হেলমেট, বুট এবং জায়গায় জায়গায় রক্ত দেখে অনুমান করলাম এখানে সেনাবাহিনীর বেশ সদস্য হতাহত হয়েছে। যার ফলে হতাহত সৈন্যদের নিয়ে বাকি সৈন্যরা এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান নিয়েছে। হিজল বাগান আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আমরা কমান্ডারের অপেক্ষায় রইলাম। সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নেমে এলো। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যুদ্ধের তেজ কমে এলো। এখন এমনই একটা সময় যখন আকাশে চাঁদের ভগ্নাংশ ওঠে রাত দশটা এগারোটায়। আকাশে চাঁদ ওঠার আগেই এই অন্ধকারেই আমাদের পালিয়ে যেতে হবে। কতক্ষণ জানি না, তবে অনেক্ষণ হলো আমাদের কমান্ডার এবং অন্য সাথীদের অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। চাঁদ উঠলে আমাদের পালানো কঠিন হয়ে পড়বে। চাঁদের আলোয় আমাদের দেখলেই গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। পালাতে পারা তো দূরের কথা, চাঁদ উঠলেই আমাদের হয় পজিশনে থাকতে হবে, নইলে মারা

যেতে হবে। এখনও কমান্ডার এলো না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ, তুমি আজ মেঘে চাঁদ ঢেকে রাখ। নইলে আমরা মারা যাব।

অনেক্ষণ হয়ে গেল। আমাদের কমান্ডার ও অন্য সাথীরা এখনও এলো না। আবার সেলফ ডিসিশন নিলাম এবং সাথের তিন সাথীকে জানালাম আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। এর মধ্যে কমান্ডার ও অন্য সাথীরা না এলে আমরা পালিয়ে যাব। কারণ আকাশে চাঁদ উঠলে আর পালাতে পারব না। পালাতে হলে চাঁদ ওঠার আগেই পালাতে হবে। এই হিজল বাগানের পরেই ধান ক্ষেত। সেই ক্ষেতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা পজিশনে আছে। আকাশে চাঁদ উঠে গেলে চাঁদের আলোয় হিজল বাগান থেকে ধান ক্ষেতে যাওয়া মাত্রই পজিশনে থাকা সৈন্যরা আমদের দেখতে পাবে, আর দেখা মাত্রই সৈন্যরা গুলি করে আমাদের ঝাকরা করে দেবে। অতএব কিছুক্ষণের মধ্যেই পালিয়ে যেতে হবে। কিছুক্ষণ পরে বললাম, আমি এখন পালিয়ে যাব, তোমরা যদি যেতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পার। চারজন মিলে পালাতে লাগলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার নিজেকেই নিজে দেখা যায় না। আমরা চারজন একে অপর থেকে যাতে বিচ্ছিন্ন না হই সেই জন্য গায়ে গায়ে মিশে পথ চলতে লাগলাম। হিজল বাগান থেকে ধানক্ষেতে এসে পড়লাম। ধানক্ষেতে কিছুক্ষণ চলার পর আমরা দাঁড়িয়ে পরলাম। এত অন্ধকার যে, আমরা কি সোজা হাঁটছি, না জায়গায়ই ঘুরছি কিছুই বুঝি না। তবে এইভাবে যে পালাতে পারব না তা বুঝতে পারলাম। হয়ত সারারাত হেঁটে দেখা যাবে আমরা যেই জায়গায় ছিলাম সেই জায়গাতেই ঘুরপাক খাচ্ছি। সাথী তিনজন ঘাবড়ে গেল, আমিও ঘাবড়ে গেলাম। একজন জিজ্ঞেস করল, এখন উপায় কী?

বললাম, দাঁড়িয়ে তো থাকা যাবে না। হাঁটতেই হবে তাতে যা হয় হবে। তবে সকলেই খেয়াল রাখবে গ্রামের মানুষ যে পথে চলে সেই পথের ঘাস উঠে সাদা মাটির পথ হয়, সেই পথ অন্ধকারেও আবছা দেখা যাবে। আমরা হাঁটতে থাকে সেই পথ পেলে একটা উপায় হবে।

আমাদের এক সাথী বিমল বলল, দাঁড়ান আমার পায়খানা পেয়েছে।

আমরা দাঁড়ালাম। বিমল পায়খানা করতে বসেই বলল, পেয়েছি পেয়েছি, পথ পেয়েছি।

আমরা দেখলাম, হ্যাঁ, এই তো গ্রামের মানুষের পায়ে চলার পথ। বিমলের পায়খানা শেষে খুঁজে পাওয়া পথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। মনে অনেক ভয়, এই পথ না হারায়। সাথী নওশের আলী নসু বলল, দাঁড়ান, আমার শরীর কেমন ভারি হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, ভারি হোক আর হালকা হোক, দাঁড়াবার সময় নেই বন্ধু।

এর মধ্যেই দেখলাম একটা লোক ধানক্ষেতে বসে বিড়ি বা সিগারেট খাচ্ছে। প্রতি টানে টানে ফুলকি দিয়ে স্পষ্ট আগুন দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত হলাম এই লোক বেসামরিক লোক, মানে পাবলিক। কেননা কোনো সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক এই সময়ে, এই রাতে, এই যুদ্ধ ময়দানে বিড়ি বা সিগারেট খেতে পারে না। সামরিক প্রশিক্ষণকালেই যুদ্ধ ময়দানে রাতের বেলায় বিড়ি বা সিগারেট খাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বিশেষ তামিল দেয়া হয়।

সাথী বন্ধুদের বললাম, এই লোককে ধরে গান পয়েন্টে নিয়ে পালাবার পথ বের করে নিতে হবে। এই লোককেই গান পয়েন্টে আমাদের সাথে নিয়ে পালাতে হবে। আপনারা বিড়ির আগুন লক্ষ্য করে ক্রলিং করে ঐ লোকের দু'তিন হাত সামনে গিয়ে অবস্থান নেবেন। আমি ক্রলিং করে পেছন দিক দিয়ে ঐ লোককে গান পয়েন্ট করব। যাতে ঐ লোক চিৎকার অথবা দৌঁড়ে পালাতে না পারে। আমাদের কোনো প্রকাশ শব্দ করা চলবে না এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে। আমরা ক্রলিং করে যাওয়া শুরু করলাম। আমি ঠিক পিছন দিক দিয়ে ঐ লোকের পিঠে হাত রেখে বললাম, কেডা?

লোকটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমি, আমি।

আমি ধমকের স্বরে বললাম, চুপ।

এরপর ধীরে ধীরে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কী?

ভদ্রলোক বললেন, জিতেন হাজং।

নামটি আমার চেনা চেনা লাগল তবুও জি থ্রি রাইফেলের ব্যারেল (নল) পিঠে ঠেকিয়ে বললাম, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন। নইলে গুলি করে মেরে ফেলব। আমরা কাদেরিয়া বাহিনীর লোক।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের জন্যই তো আমি নৌকা নিয়ে এসেছি।

নৌকা কোথায়?

ঘাটে।

চলুন আগে ঘাটে যাই।

জিতেন হাজং হলেন কমরেড মনি সিং—এর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। সংগ্রামী আর বিপ্লবীদের সাহায্য করাই তার ধর্ম। সুনামগঞ্জ সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা। চীরকুমার জিতেন হাজং চিরকাল মানুষের সেবা করেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এই সুনামগঞ্জ অঞ্চলের মোটামুটি সমস্ত মানুষ জিতেন হাজংকে চেনে। তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ তেভাগা আন্দোলন, লাঙ্গল যার জমি তার এবং জমিদারী প্রথা বাতিল

আন্দোলনের বিপ্লবী যোদ্ধা ছিলেন। যৌবন বয়সে তিনি কমরেড মনি সিং—এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহে তীর-ধনুক নিয়ে বৃটিশ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। একাত্তর সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে তেমন একটা যুদ্ধ না হওয়ায় তিনি যুদ্ধ করতে পারেননি বলে দুঃখিত।

আন্দোলন, সংগ্রাম, যুদ্ধ জিতেন হাজং-এর কাছে নেশার মতো লাগে। সীমান্তে আমাদের ঘাঁটিতে তিনি একবার এসেছিলেন। যোদ্ধাদের জিতেন হাজং ভালোবাসেন। নিজের বিপদ উপেক্ষা করে যোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে তিনি দারুণ আনন্দ পান। তাই আমরা যখন সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে ঢুকি তখন থেকেই নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি আমাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। এই অঞ্চল তার এতোই নখদর্পণে যে, আমরা যখন রাতে রওনা হতাম তিনি সহজেই অনুমান করে নিতে পারতেন আমরা এক রাতে পায়ে হেঁটে কত দূরে এবং কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে পারি। পরের দিন তিনি আবার আমাদের কাছাকাছি কোনো জায়গায় অবস্থান নিতেন। কিন্তু সরাসরি আমাদের কাছে আসতেন না। এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই তাঁর সমাদর ছিল। ঘর-সংসার ত্যাগী চিরকুমার এই পুরুষের কাজই ছিল আজ এই গ্রাম কাল অন্য গ্রাম ঘুরে বেড়ানো। ঘাটে এসে দেখলাম সত্যিই একটা বড় জেলে নৌকা রয়েছে। সঙ্গে তিনজন মাঝি। জিতেন হাজংসহ আমরা চারজন নৌকায় উঠে বসলাম। আমাদের চারজনের একজন হলো কমান্ডারের ছোট ভাই অরুণ সরকার। নৌকায় উঠেই অরুণ সরকার বলল, দাদারে (কমান্ডার সুকুমার সরকার) ছাড়া যামু না। দাদারে আনার ব্যবস্থা করেন।

জিতেন হাজং বললেন, তোমরা নৌকায় বহ আমি কমান্ডারকে খুঁইজা আনি।

জিতেন হাজং কমান্ডার সুকুমার বাবু এবং অন্য সাথীদের খুঁজে আনতে গেল। আমরা চারজন নৌকা থেকে নেমে শুয়ে পজিশন নিয়ে থাকলাম। এক সময় অন্ধকারে দেখলাম খুবই কাছাকাছি একদল সৈন্য সারিবদ্ধভাবে লাইন দিয়ে আমাদের দিকে আসছে। আমরা চারজন পজিশনে চুপ করে শুয়ে থাকলাম। সৈন্যরা আমাদের দু'তিন হাত দূর দিয়ে নৌকার দিকে এগিয়ে গেল। এরপর কমান্ডার সুকুমার বাবু আস্তে আস্তে কোকিলের কণ্ঠে কু কু করে ডাক দিলেন। আমরা বুঝতে পারলাম এই সৈন্যদল আমাদেরই সাথী। আমরাও পাল্টা কু কু ডাক দিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকার দিকে গেলাম। সার সার দ্রুত সবাই নৌকায় উঠে পড়লাম। নৌকা ছেড়ে দিলো। অতিরিক্ত বৈঠা ও মাস্তুল দিয়ে আমরাও নৌকা বাইতে লাগলাম। আকাশে চাঁদ ওঠার আগেই অন্তত দু'তিন মাইল দূরে চলে যেতে হবে। দ্রুতগতিতে নৌকা চলতে লাগল। দুই তৃতীয়াংশ ক্ষয় হয়ে যাওয়া চাঁদ চতুর্দিকে হালকা রূপালী আলো ছড়িয়ে

আকাশে উঠল। চাঁদের মিষ্টি পরিষ্কার আলোতে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কূল-কিনারাবিহীন বিশাল জলরাশির মাঝে একটা নৌকায় আমরা সবাই বসে আছি। এতক্ষণে আমাদের মুখে কথা ফুটল। আমরা সবাই আশ্চর্যজনকভাবে বিধাতার কৃপায় সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে এসেছি। এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। মনের আনন্দে মনে হলো উচ্চ কণ্ঠে গান হাই। আমাদের এই বাঁচার পিছনে যার একক অবদান, তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন মানুষের সেবায় উৎসর্গকৃত প্রাণ জিতেন হাজং। জিতেন হাজং–এর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ঋণের শেষ নেই। কোনো দিন কি এমন আসবে, যেদিন জিতেন হাজং–এর ঋণ শোধ করার অন্তত চেষ্টা করা যাবে? ভোর হলো, নৌকা তীরে ভিড়ল। আমরা সবাই নৌকা থেকে নেমে পড়লাম। জিতেন হাজংকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিলাম। আবার পথ চলতে শুরু করলাম। এবার পথ চলার লক্ষ্য হলো সীমান্তের দিকে। উদ্দেশ্য সীমন্তের নিকটবর্তী জায়গা দিয়ে আমরা ঘুরতে থাকব। জনগণের অবস্থা খুব একটা ভালো দেখলাম না। আমাদের হাতে অস্ত্র আছে বলেই জনগণ আমাদের কিছু বলেনি। কিন্তু মনে হয়েছে পারলে জনগণ আমাদের ধরে ফেলে।

জনগণকে এতো বুঝাচ্ছি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এই দেশের স্রষ্টা, তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা .... ইত্যাদি। কিন্তু জনগণ গ্রহণ করছে না। কেবলই প্রত্যাখ্যান করছে। মনটা ভীষণ খারাপ। তাহলে কি শেখ মুজিবর রহমানের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোটার চেয়েও নিচে নেমে গেছে। জনগণ যদি আমাদের আশ্রয় না দেয়, তাহলে আমরা গেরিলা যুদ্ধ করব কীভাবে? জনগণ আর গেরিলা যোদ্ধার সম্পর্ক হতে হবে, পানি আর মাছের, মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচে না, গেরিলা যোদ্ধাও জনগণ ছাড়া বাঁচে না। পানি যদি মাছকে আশ্রয় না দেয় তাহলে মাছের যেমন নিশ্চিত মৃত্যু হবে, ঠিক জনগণ যদি গেরিলা যোদ্ধাকে আশ্রয় না দেয়, তাহলে গেরিলা যোদ্ধারও নিশ্চিত মৃত্যু হবে।

মনে নানান প্রশ্ন, শেখ মুজিবর রহমান কি মানুষের কাছে এতোই অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়েছিল? তাকে এইভাবে খুন করা হলো, আমরা তার প্রতিবাদে যুদ্ধ করতে এলাম, অথচ জনগণ আমাদের গ্রহণই করছে না। আসলে সশস্ত্র প্রতিবাদই শেষ কথা নয়। আমরা যারা শেখ মুজিবরের অনুসারী, আমাদের নিজেদের কর্ম দ্বারা এবং জনগণকে বুঝানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবার শেখ মুজিবের প্রতি মমত্বশীল করে তুলতে হবে এবং শেখ মুজিবর রহমান–এর হারানো জনপ্রিয়তা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা সশস্ত্র যুদ্ধ বা নিরস্ত্র লড়াইয়ে বিজয়ী হতে পারব। এছাড়া আমাদের অন্য কোনো বিকল্প নেই। জেনারেল মাহামুদুল হাসানের সৈন্যরা জনগণের মাধ্যমে আমাদের গতিবিধির খবরাখবর নিয়ে পথে পথে এ্যাম্বুশ

করতে থাকল। এ্যাম্বুশ মানে আগে থেকেই ফাঁদ পেতে বসে থাকা। আমরা এক সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেনারেল মাহামুদুল হাসানের এ্যাম্বুশে ফাঁদে পা দিলাম। সন্ধ্যায় এক আখক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আগে থেকেই এ্যাম্বুশ করে ফাঁদ পেতে বসে থাকা বাংলাদেশ আর্মির সৈন্যরা অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করল। আমরা আখক্ষেতের ভেতর আশ্রয় নিয়ে পাল্টা জবাব দিলাম। প্রথমে তীব্র লড়াই শুরু হলো। তারপর রাতভর থেমে থেমে সংঘর্ষ চলতে লাগল। রাত পোহালো। ভোর হলো। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাবাহিনীর সৈন্যরা দুর্বার গতিতে পুনরায় আক্রমণ শরু করল। আমরা তার যথাযথ জবাব দিতে লাগলাম। যতই বেলা বাড়তে লাগল আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ ততই বাড়তে লাগল। আমরা যে আখক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছিলাম গুলিতে সেই ক্ষেতের আখ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। আমাদের গুলি ক্রমশ ফুরিয়ে যেতে লাগল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে লাগল। ধীরে ধীরে আমাদের অস্ত্রগুলো একের পর এক থেমে যেতে লাগল। যখনই আমাদের একটা অস্ত্র থেকে যায় তখনই বুঝতে পারি আমাদের সাথী যোদ্ধার গুলি হয় শেষ, অথবা আহত, কিংবা নিহত হয়েছে। সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের একের পর এক প্রায় সকল অস্ত্র থেমে গেল। অর্থৎ আমাদের প্রায় সকল সাথীর গুলি শেষ অথবা আমাদের প্রায় সাথীই নিহত। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই অবস্থা বেগতিক দেখে আমি ক্রলিং করে আখক্ষেত থেকে বেরিয়ে ধানক্ষেতে ঢুকে পড়ি। সারারাত ক্রলিং করার পর যখন সকাল হয়, তখন আমি কোথায় তা আমি জানি না। ধান গাছের পাতা আর শীষের ধারে আমার সমস্ত শরীর কেটে ফালি ফালি হয়ে সারা দেহ থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত বের হতে থাকে। দীর্ঘ সময় ক্রলিং করার ফলে আমার দু'হাঁটু, হাতের দুই কনুই এবং বুক চিরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা দেহে বল নেই।। দেহ আর চলে না। দেহ নিস্তেজ। জীবনের মায়া ত্যাগ করে ধানক্ষেতেই পড়ে রইলাম। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম, না জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম জানি না। যখন হুঁশ ফিরে এলো তখন দেখি একটি কুকুর আমার নাক শুকছে। ধপ করে উঠে বসতেই কুকুরটি তিন-চার হাত পিছনে সরে গেল। আমার পাশেই পড়ে আছে আমার জীবন রক্ষাকারী জি থ্রি অটো রাইফেল, আর দুটো ম্যাগজিন। আমার কিছুই মনে নেই। কেন আমি এই অবস্থায় এখানে। পেটে শুধু প্রচণ্ড ক্ষুধা। ক্ষুধার জ্বালায় আমি অস্থির। চিন্তা করছি আমি কি স্বপ্ন দেখছি না বাস্তব। ধীরে ধীরে আমার সমস্ত কিছু মনে হতে লাগল। আমি আবার ভয় পেয়ে গেলাম। শত্রুর ভয়। মৃত্যুর ভয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মরণের সাথী, বাঁচার সাথী প্রিয়তমা জি থ্রি অটো রাইফেলটা আর ম্যাগজিন দুটো হাতে তুলে নিলাম। এখনও একটা ম্যাগজিন পুরো গুলি ভর্তি অন্যটা অর্ধেক ভর্তি, আর জি থ্রি'র সাথে ফিট করা ম্যাগজিনে বিশ রাউন্ড গুলির মধ্যে তিন রাউন্ড গুলি আছে। কিন্তু গুলির ব্যাগটা কোথায় জানি না। এখন সকাল না দুপুর না বিকাল কিছুই বুঝি না।

হাতের ঘড়িটা গুলির ব্যাগের মতো কোথায়ও পড়ে গেছে। পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোনো মানুষের কাছে যাওয়া যাবে না। কোনো গ্রাম বা লোকালয়ে যাওয়া যাবে না। মানুষেরাও আমাদের শত্রু। আমাদের অবস্থা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো। ১৯৭১–এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের যে অবস্থা হয়েছিল এখন আমাদেরও সেই একই অবস্থা হয়েছে। মানুষ আমাদের সাহায্য করবে না। মানুষের কাছে যাওয়া যাবে না।

ক্ষুধার জ্বালায় ধান গাছের কচি ডগা আর কচি ধানে দুধ চুষতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম, এখনই অন্যত্র রওনা হব না সন্ধ্যা হলে রওনা হব। এখন রওনা হলে শত্রুর কবলে পড়ার বিপদ আর সন্ধ্যার পর রওনা হলে অন্ধকারে পথ হারাবার বিপদ। কোন বিপদটা গ্রহণ করব। পানির পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পর পানির পিপাসায় এমনিই মরতে হবে। ফুল প্যান্টটা ভাঁজ করে নেংটির মতো বানালাম। সার্টটা খুলে কোমরের সাথে বেঁধে জি থ্রি রাইফেলটা বা হাত দিয়ে শরীরের সাথে মিলিয়ে ধরলাম, যাতে দূর থেকে বোঝা না যায় আমার কাছে অস্ত্র। তারপর সোজা পানির খোঁজে হাঁটা শুরু করলাম। কিছু দূর হাঁটতেই একটা পানির ডোবা পেয়ে পানি খেলাম। এক লোক পায়খানা করে ঐ ডোবায় সৌচ করতে এসেছে। আমি ঐ লোককে গান পয়েন্ট করে আমাকে সোজা সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। নইলে প্রাণে মারার হুমকি দিলাম। সীমান্তের কাছাকাছি আসতেই দূরে থেকে ভারতের পাহাড় নজরে এলে আমি ঐ লোকের হাত ধরে তাকে জোর করে নিয়ে আসার জন্য ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দিলাম। তারপর ভারতের পাহাড় লক্ষ্য করে দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। সীমান্তে পৌঁছতে আমার সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো। আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের হাইডাউট বা ক্যাম্পে পৌঁছে দিখে আমার যুদ্ধের সাথী বৈদ্যনাথ কর মুমূর্ষ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। বৈদ্যনাথ কর–এর সারা শরীরে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র। সেই সকল ছিদ্র দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত বেরিয়ে আসছে। উপজাতীয় সাথী ডাক্তার জন হেনরি এবং রাধা রমন রায় ঝান্টু (১৯৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি হালুয়াঘাট থানার বেতগুড়া গ্রামে এক সম্মুখ যুদ্ধে রাধা রমন রায় ঝান্টু ও ডাক্তার জন হেনরি নিহত হলেন।) বৈদ্যনাথ করকে চিকিৎসা করেছে।

বৈদ্যনাথ কর সুস্থ হওয়ার পর জানতে পারলাম, সে আখক্ষেত থেকে ক্রলিং করে পালিয়ে একটি কচুরীপানা ভরা পঁচা জলাশয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই পঁচা জলাশয়ে ছিল অনেক দিন না খাওয়া রক্তচোষা জোঁক। রক্তচোষা জোঁক বৈদ্যনাথকে পেয়েই কিলবিল করে ঘিরে ধরে রক্ত চুষে খেতে থাকে। বৈদ্যনাথ কর প্রস্রাব–এর রাস্তা আর পায়খানার রাস্তা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে বসে থাকে। যাতে জোঁক পায়খানা বা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পেটের ভিতরে ঢুকতে না পারে। বৈদ্যনাথ করের

পালাবার কোনো পথ ছিল না। কারণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোকেরা ঐ পুকুর পাড়ে সজাগ পাহারায় ছিল। পালাবার চেষ্টা করলেই ধরা পড়তে হবে। তাই সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার চাইতে জোঁককে রক্ত দেয়াই শ্রেয় মনে করেছে বৈদ্যনাথ কর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঐ পুকুর পাড় থেকে সরে যেতে যদি আর এক দুই ঘন্টা দেরি করত, তাহলে রক্তচোষা জোঁক বৈদ্যনাথ করের শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে খেয়ে ফেলত। রক্তশূন্যতার কারণে এখনও যে কোনো সময় বৈদ্যনাথ কর মারা যেতে পারে। ঐ দিনের যুদ্ধে আমি আর বৈদ্যনাথ কর ছাড়া আমাদের বাকি সতের জন সাথী নিহত হয়। জনসাধারণের চরম অসহযোগিতা এবং বিরোধিতার কারণে একই পরিণতি হয় বগুড়ার রেজাউল বাকি এবং দুলাল দে বিপ্লব ও তার সাথীদের। কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লব যুদ্ধে প্রচন্ড মার খেয়ে আহত অবস্থায় নৌকায় করে পালিয়ে আসার সময় তীব্র যন্ত্রণায় তার টুআইসি মোঃ হিরুকে নির্দেশ দেয়, "হিরু তুমি আমাকে গুলি করে মেরে ফেল।" এই নির্দেশ পালনে টুআইসি হিরু অক্ষমতা প্রকাশ করলে পুনরায় দুলাল দে বিপ্লব একই নির্দেশ দেয়। কিন্তু হিরুও নির্দেশ পালনে পুনরায় অক্ষমতা প্রকাশ করে। এইভাবে কয়েকবার কমান্ডারের নির্দেশ পালনে টুআইসি হিরু অক্ষমতা প্রকাশ করার পর কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লব অপর সাথী মদনকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে, "মদন আমি কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লব তোমাকে নির্দেশ দিতেছি, আমার টুআইসি হিরুকে আমি যে নির্দেশ দিব, হিরু যদি সেই নির্দেশ পালন না করে তাহলে তুমি হিরুকে গুলি করে মেরে ফেলবে।" বলেই টুআইসি হিরুকে নির্দেশ দিলো, "আমাকে গুলি করে মেরে ফেল।" তখন অনন্যোপায় হয়ে টুআইসি হিরু কমান্ডারের নির্দেশে কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লবকে হত্যা করতে উদ্যোত হলো। টুআইসি হিরু কমান্ডার দুলাল দে বিপ্লবকে টেনে নৌকার গোলুইয়ের বাইরে মাথাটা ঝুলিয়ে দিলো। দুলাল দে বিপ্লব "তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা" কবিতাটি পড়তে লাগল আর ফ্যাল ফ্যাল করে হিরুর দিকে তাকিয়ে থাকল। হিরু জি থ্রি রাইফেল এর ব্যারেল–(নল) টা দুলাল দে বিপ্লবের মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করে দিলো। "তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা" কবিতা পড়তে পড়তে একটা ঝাকুনি দিয়ে দুলাল দে বিপ্লবের দেহ নিথর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল।

অপরদিকে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার বাসিন্দা ঢাকা কলেজের ছাত্রনেতা মেধাবী ছাত্র মোঃ ইউনুস যুদ্ধের শুরুতেই গুলিবিদ্ধ হয়। সারাদিন রক্তক্ষরণের পর নাকে-মুখে ছেনড়ি উঠে ইউনুসের দেহ নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় ইউনুরেস দেহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত সাব্যস্ত করে ইউনুসকে ফেলে অন্য সাথীরা পালিয়ে যায়।

বছর চারেক পরে ঘনিষ্ঠ এক প্রতিবেশীর বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে ঐ যুদ্ধের কথা উঠলে অনুষ্ঠানে আগত এক ভদ্রমহিলা রাগান্বিত ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমাকে গালাগালি দিয়ে বলেন, আমার ভাইকে তোমরা আহত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলে।

ঐ ভদ্রমহিলার কাছে জানতে পারলাম তিনি নিহত বলে ধরে নেয়া মোঃ ইউনুসের বড় বোন। ইউনুসের বড় বোনের কাছে আরো জানতে পারলাম, যে যুদ্ধে ইউনুস আহত হয়েছিল সেই যুদ্ধে ইউনুসদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে একজন সুবেদার মেজর ছিল ইউনুসের ফুফাতো ভাই। সেই সুবেদার মেজর ইউনুসের চেহারা এবং ইউনুসের ডান হাতের কব্জিতে থাকা কালো জট দেখে ইউনুসকে চিনতে পেরে জেনারেল মাহামুদুল হাসাদের কাছে ইউনুসকে বাঁচিয়ে রাখলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে ইউনুসকে বাঁচিয়ে রাখার প্রস্তাব করেন। জেনারেল মাহামুদুল হাসান তৎক্ষণাৎ হেলিকপ্টারে করে ইউনুসকে কম্বাইন্ড মিলেটারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন। ইউনুসকে ওপেন হার্ট সার্জারিসহ গলা থেকে নাভি পর্যন্ত চিরে অপারেশন এর মাধ্যমে সুস্থ করে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইউনুস গলা থেকে নাভি পর্যন্ত অপারেশনের এক বিরাট কাটা চিহ্ন নিয়ে দশ বছর জেল খেটে মুক্তি পায়। অন্যদিকে টাঙ্গাইলে এক ব্রিজ ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় বিশ্বজিৎ নন্দী। সামরিক আদালত বিশ্বজিৎ নন্দিকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়। বিশ্বজিৎ নন্দী ফাঁসির প্রকোষ্ঠে (ডেথসেল বা কনডেম সেল) একে একে প্রায় পনেরটি বছর মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে। ফাঁসি দেয়ার নিয়ম অনুযায়ী সূর্য ডোবার পর এবং সূর্য উদয় হওয়ার আগে ফাঁসি কার্যকর হতে হবে। যখনই সূর্য ডুবে যেত, সন্ধ্যা হতো, বিশ্বজিৎ নন্দী অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকত, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকত। আজ রাতেই আগামী সূর্যোদয়ের আগেই ফাঁসি হবে। আর পৃথিবীর সূর্য দেখবে না। পৃথিবীর আলো বাতাস ভোগ করবে না।

এই সুন্দর ধরণী থেকে চিরবিদায় নিতে হবে। সারারাত কাঁদতে থাকত আর প্রাণভরে ভগবানকে ডাকত। জীবনের শেষ ডাকা। আর কখনই ভগবানকেও ডাকতে পারবে না। এ ডাকাই শেষ ডাকা। এই তো জল্লাদ এসে গেছে, এখই ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। এখই মৃত্যু। ফাঁসির অন্ধ প্রকোষ্ঠের বাইরের দেয়ালে হঠাৎ রোদের ঝলক। এমনি হাসি। অট্টাহাসি। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ আমার ফাঁসি হয়নি। আমি মরিনি। আমি অন্তত আরো একদিন বেঁচে গেলাম। আরো একদিন পৃথিবীতে থাকব। পৃথিবীর বাতাস গ্রহণ করব। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি মরিনি, আমি মরিনি। আমি আজ বেঁচে গেছি। ফাঁসির অন্ধকার প্রোকষ্ঠে সারদিন হাসি আর আনন্দ। দিন শেষে সূর্য যখন ধীরে ধীরে ডুবতে শুরু করল। সন্ধ্যা নেমে এলো, আবার অঝোর নয়নে কান্না আর ঈশ্বরকে স্মরণ করা। এই বুঝি জল্লাদ এলো, ফাঁসির দড়ি গলায় ঝুঁলিয়ে দিলো। মৃত্যু হলো। এভাবে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস, প্রতি বছর। প্রায় পনের বছর। সারা দিন

হাসি। সারা রাত কান্না। বিশ্বজিৎ নন্দী হিন্দু হওয়ায় ভারতের পশ্চিম বাংলার জনগণের সমর্থন এবং ভারত সরকারের চাপের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয় না। পরবর্তীতে বিশ্বজিৎ নন্দীকে প্রায় পনের বছর পর নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়।

নজিবর রহমান নিহার ও শাহাদাৎ হোসেন সুজার যৌথ নেতৃত্বে ১৭ জনের একটি গ্রুপ ১৯৭৬ সালের আগস্ট–এ সুজার নিজ জেলা গাইবান্ধা দখল খরে। গাইবান্ধা দখলের প্রথম লড়াইয়ে সহযোদ্ধা আলমগির নিহত হয়।

০৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৬ বেঙ্গল এবং রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৬ বেঙ্গল–এর সৈন্যরা পুরো গাইবান্ধা ঘেরাও করে নিহার ও সুজাদের আক্রমণ করলে নিহার-সুজারা পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে পিছু হটতে থাকে।

লড়াই-পিছু হটা, লড়াই-পিছু হটা করতে করতে নিহার-সুজারা গোবিন্দগঞ্জ থানায় চলে গেলেও সেনাবাহিনীর ঘেরাও ভাঙ্গতে পারেনি। ০৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ বিকেল পাঁচটায় গোবিন্দগঞ্জের কামাদিয়া গ্রামে নিহার-সুজাদের আট জন সাথী যোদ্ধা নিহত হয় এবং গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় ও আহত হওয়ায় নিহার সুজা হুমায়ুনসহ আটজন সাথী বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে (১) নজিবর রহমান নিহার, (২) আবু বক্কর সিদ্দিকী, (৩) রেজাউল করিম রেজা এবং (৪) বিকাশ এই চার জন যোদ্ধা আহত অবস্থায় বন্দী হয়।

সুজা, হুমায়ুন, মুন্না ও রফিকুল এই চারজন অক্ষত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়। বন্দী হওয়ার ঘন্টাখানেক পর আহত নিহার, বক্কর, রেজা ও বিকাশকে সেনাবাহিনীর লোকেরা সুজা, হুমায়ুন, মুন্না ও রফিকুলের সামনেই ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলে এবং জীবিতদের ঘন্টা দুই পরে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় একমাস ব্যাপী নানা ধরনের নির্যাতন ও জবানবন্দী শেষে কর্নেল আজিজের ৫নং মার্শাল কোর্টের বিচারে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে রংপুর কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লার কারাগারে একটানা দশ বছর জেল খেতে সুজা, হুমায়ুন, মুন্না ও রফিকুল মুক্তি পায়।

সীমান্তে ফিরে এসে আমাদের জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর আব্দুর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম ওরফে বাঘা সিদ্দিকীকে রণ কৌশলগত কারণে আমাদের গেরিলা যুদ্ধ করা সম্ভব নয় এবং উচিত নয় বলে আমার অভিমত ব্যক্ত করে পিছনে শত্রু না রেখে রণকৌশল নির্ধারণের কথা বলি। দেশের মানুষের অবস্থা, আমাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা, সর্বোপরি শেখ মুজিবর রহমান–এর জনপ্রিয়তা ইত্যাদি বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ করে কাদের সিদ্দিকী সরাসরি সম্মুখ সমরের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, যুদ্ধে যত সময়ই লাগুক না কেন, আমরা সামনা-

সামনি যুদ্ধ করব। প্রয়োজনে এক ইঞ্চি, এই ইঞ্চি করে ভূমি মুক্ত করব। তবু পিছনে কোনো শত্রু রাখব না।

আমরা বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাটি স্থাপন করলাম এবং বেশ বড় এলাকা জুড়ে মুক্ত অঞ্চল তৈরি করলাম। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিডিআর এর সাথে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ চলতে লাগল। সেনাবাহিনী, বিডিআর তারা চাইত আমাদের সীমান্তের ওপারে অর্থাৎ ভারতে তাড়িয়ে দিতে। আমরা চাইতাম আমাদের মুক্তাঞ্চল আরো বাড়াতে।

আমাদের সাথীরা ময়মনসিংহ জেলার কমলাকান্দা থানা আক্রমণ করে থানার ওসি আশরাফ উদ্দিনকে সস্ত্রীক ধরে মুক্ত অঞ্চলে নিয়ে আসে। পরে আমরা ওসি আশরাফ উদ্দিনকে চলে যেতে বললে তিনি চলে না গিয়ে আমাদের সাথে একাত্ত হয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। বছরখানেক পর আমাদের সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী আমাদের পক্ষে রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার চালানোর জন্য ওসি আশরাফ উদ্দিনকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি সস্ত্রীক ফিরে যান এবং কথামতো ঠিখই রেডিও-টেলিভিশনে তার সাক্ষাৎকারে আমাদের কথা প্রচার করেন। লন্ডন থেকে প্রখ্যাত ও সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী বাংলার ডাক নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে আমাদের কথা প্রচার করেন। এছাড়া আমাদের আর কোনো প্রচার ছিল না। ভারতের এসএসবি (সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ব্রাঞ্চ) খুবই গোপনে আমাদের সাহায্য করত। তারা অত্যন্ত সংগোপনে আমাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করত। এসএসবি এতই সতর্কতা ও গোপনীয়তার সাথে আমাদের সাহায্য করত যে, তা ভারতীয় বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) সহ অন্যান্য সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত জানত না। ভারতীয় এসএসবি বা সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ব্রাঞ্চকে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতেন।

যুদ্ধে পরাজয়

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি পরাজিত হলে মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। ইন্দিরা গান্ধির পরাজয় এবং মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আমরা শংকিত হই। এমনিতেই সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। একমাত্র ইন্দিরা গান্ধি ছাড়া গোটা ভারতের রাজনীতিও ছিল আমাদের বিপক্ষে। আমাদের একমাত্র সমর্থক এবং সাহায্যকারী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি এখন ক্ষমতাচ্যুত। সামনের দিন আমাদের ভালো হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই প্রথমে আমাদের সকল সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল

জিয়াউর রহমান এবং ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই উভয়ই ছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন লবির লোক। ফলে সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের পরামর্শে ভারত এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে আক্রমণ করে আমাদের পরাস্ত করার চুক্তিবদ্ধ হয়।

সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের দখলে থাকা মুক্তাঞ্চল এবং আমাদের ঘাটিগুলো বরাবর ভারত ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। অপরদিকে বাংলাদেশও অনুরূপভাবে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। আমরা সামনে বাংলাদেশ ও বিডিআর এবং পিছনে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিএসএফ দ্বারা সাড়াঁশি কায়দায় চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পরি। আমাদেরকে বাংলাদেশ ও ভারতের সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করার ফলে আমরা এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি হেডকোয়ার্টার থেকেও। আমাদের এক ঘাটি থেকে আর এক ঘাটির যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর সাথেও আমাদের সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

আমরা এক ঘাটির সাথীরা অন্য ঘাটির সাথীরা কী করছে, কী অবস্থায় আছে কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু বাংলাদেশের আর ভারতীয় আর্মিদের মাইকের আওয়াজ। একদিকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী মাইকে বলছে আটচল্লিশ (৪৮) ঘন্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ (সারেন্ডার) কর। নইলে আক্রমণ করা হবে। অন্যদিকে পিছনের দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী মাইকে বলছে আটচল্লিশ ঘন্টাকা আন্দার হাতিয়ার ডালদো।

আমাদের ঘাটি ছিল ময়মনসিংহ জেলার দূর্গাপুর থানার ভবানীপুর। আমার ঘাটির সামনে ছিল বেশ বড় সমেশ্বর নদী। নদীর অপর পাড়ে ছিল জেনারেল মাহামুদুল হাসান, মেজর সামাদ, মেজর মঈন—এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং পিছনে ভারতীয় সেনাবাহিনী। আমরা উভয় দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আমাদের অস্ত্রের ভান্ডার মোটামুটি খারাপ না। যদিও গোলাগুলির পরিমাণ কম। পেছন থেকে ভারতীয় বাহিনী আমাদের সহজে কাবু করতে পারলেও সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণেই বাংলাদেশ বাহিনী আমাদের সহজে কাবু করতে পারবে না। আমার ধারণা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও এডভান্স হয়ে আমাদের ঘাটি দখল করতে আসবে না। ভারতীয় বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে আমাদের ঘায়েল করতে চাইবে। আর আমাদের ঘাটির সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণে আমরা অনেক সুবিধা ও সুদৃঢ় অবস্থানে আছি। বাংলাদেশ বাহিনীর পক্ষে নদী অতিক্রম করে আমাদের ঘাটি দখল করা এক দূরূহ ব্যাপার। এই অবস্থায় একমাত্র বিমান হামলা করা ছাড়া আমাদের পরাস্ত করা কঠিন। আমরা সম্ভাব্য হামলা মোকাবেলা করার জন্য আগে

থেকেই মাটি কেটে শাল বনের বিশার বিশাল শাল গাছ দিয়ে তার উপর সমেশ্বর নদীর পাথর, বালি আর মাটি দিয়ে দূর্বোধ্য মজবুত বিশালকায় বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চ তৈরি করেছি। আমরা মাটির উপর না উঠে মাটির নিচ দিয়ে বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে অনায়াসে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারি এবং যুদ্ধ করতে পারি।

আমাদের আত্মসমর্পণের (সারেন্ডারের) জন্য বেঁধে দেয়া আটচল্লিশ ঘন্টা সময় অতিক্রম হওয়ার পর, জেনারেল মাহামুদুল হাসান নিজে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের ঘাটির উপর বার ঘন্টাব্যাপী মর্টারের প্রায় শতাধিক শেল নিক্ষেপ করে। সেই সময় পিছন দিক থেকে ভারতীয় বাহিনীও আমাদের উপর অবিরাম গোলা ও গুলি নিক্ষেপ করে।

ভারতীয় বাহিনীর গোলাগুলি ও বাংলাদেশ বাহিনীর মর্টারের শেলিং চলাকালে আমরা বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চে বসে বাংলাদেশ বাহিনীর দিকে সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ছাড়া এক রাউন্ড গুলিও করিনি। তখনও ভোর হয়নি। অন্ধকার কাটেনি, আবছা অন্ধকারে হঠাৎ দেখা গেল বিশ-ত্রিশ নৌকা বোঝাই হয়ে জেনারেল মাহামুদুল হাসানের বাহিনী নদী অতিক্রম করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আক্রমণ করলে তারাও মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। তাদের সমর্থনে সেনাবাহিনীর অন্য একটি দল কভারেজ এ্যাটাক করে। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে যায়। ঘন্টা তিনেক তীব্র সংঘর্ষের পর জেনারেল মাহামুদুল হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ বাহিনী প্রচণ্ড মার খেয়ে পিছু হটে যায়। এইভাবে সপ্তাহখানেক জেনারেল মাহামুদুল হাসানের আক্রমণ প্রতিহত করতেই আমাদের গোলা-বারুদ ফুরিয়ে যায়। আমাদের অস্ত্রের যে মজুদ আছে তা দিয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর আক্রমণ বছরের পর বছর প্রতিহত করা যাবে। কিন্তু গোলা-বারুদের ভান্ডার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তার চাইতেও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে খাদ্য সংকট। তিন দিন থেকে আমাদের কোনো খাদ্য নেই। ক্যাম্পে তিন-চারটি গরু জবাই করে পুড়িয়ে পুড়িয়ে আমরা খেয়েছি। আজ তাও নেই। আমরা যারা একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা, আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শুধু অস্ত্রের সংকটে পড়েছি। কিন্তু খাদ্য সংকটে কখনো পড়িনি। গোটা বাঙালি জাতিই আমাদের খাদ্য সরবরাহ করেছে। প্রয়োজনে বাঙালি নিজে না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছে। কোনো মুক্তিযোদ্ধাই খাদ্যে কষ্ট করেনি। এদেশের মানুষ আগে মুক্তিযোদ্ধার খাওয়া জুগিয়েছে তারপর নিজের খাওয়া জুগিয়েছে। একাত্তরে যুদ্ধে আমি খাদ্য সংকটেও পড়িনি এবং যুদ্ধে অস্ত্র ও গোলা-বারুদের মতো খাদ্যও যে একটা বিরাট ভাইটাল ফ্যাক্টর তাও বুঝিনি।

এখন অস্ত্র আছে, কিন্তু গোলা-বারুদের সংকটে পড়েছি। তার চাইতেও বেশি সংকটে পড়েছি খাদ্যের। আমাদের অস্ত্রপ্রতি পাঁচ-সাত রাউন্ড গুলি ও গোলা রয়েছে মাত্র। যা পাঁচ-দশ মিনিটও টিকবে না। আমার মনে এখনো আশা শেষ মুহূর্তে ভারত

হয়ত সদয় হতে পারে। আবার সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের কয়েকজন বন্ধু পালিয়ে যেতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মাইকে আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগল। আর বলতে লাগল, কোনো অসুবিধা নেই, সবাই চলে আসেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুই দিন কোনো পক্ষেরই কোনো যুদ্ধ নেই। গোলাগুলিও নেই। চতুর্দিকে নীরব। আমাদের কেউ বাঙ্কারে, কেউ উপরে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। আমাদের কোনোই খাদ্য নেই। অস্ত্র আছে, কিন্তু নেই যুদ্ধ করার গুলি। সর্বোপরি নেই যুদ্ধ করার মতো বিন্দুমাত্র মানসিক শক্তি। আমি একটি ছোট কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি জেনারেল মাহামুদুল হাসান তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে নৌকা করে আমাদের তীরে এসে নামলো। পাশে থাকা আমার অস্ত্রটা একবার তাকিয়ে দেখলাম। হয়ত মনের ভুলেই দেখলাম। কিন্তু হাতে তুলে নিলাম না।

জেনারেল মাহামুদুল হাসান তার বাহিনীকে নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে মেজর মঈন, মেজর সামাদসহ কয়েকজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের ঘাটিতে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মোলায়েম এবং ভদ্রকণ্ঠে আমাকে বললেন, দিন, আপনার অস্ত্রটা আমার হাতে দিন।

আমি শেষ বারের মতো আমার অস্ত্রটা দেখলাম। তারপর আলতো হাতে জেনারেল হাসানের হাতে তুলে দিতে দিতে মনে মনে বললাম, বিদায় হে বন্ধু, বিদায়।

এরপর জেনারেল হাসান বললেন, চলেন আপনাদের ঘাটিটা একটু ঘুরে দেখি।

তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। আমাদের সাথীরা যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কারো অস্ত্র হাতে, কারো অস্ত্র মাটিতে। মেজন মঈনকে অস্ত্রগুলো কালেকশন করতে বলে, আমাদের সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করালেন। এরপর নিয়ে গেলেন দূর্গাপুর সেনাবাহিনীর একটি ঘাটিতে। সেখানে নিয়ে জেনারেল মাহামুদুল হাসান আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনাদের চিন্তার বা ঘাবড়াবার কোনোই কারণ নেই। আমার সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান—এর কথা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কথা দিয়েছেন আপনাদের সকলকেই ছেড়ে দেয়া হবে। শুধুমাত্র ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের আগে যদি কারো বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির আওতায় মামলা থেকে থাকে তাহলে তাকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হবে। দূর্গাপুরে কয়েক দিন রাখার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় নূরুদ্দিন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো ময়মনসিংহ রেসিডেন্সিয়াল মডেল গার্লস স্কুলের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

এই ক্যাম্পে আমাদের ইন্টারোগেশন শুরু হয়। প্রতিদিন আমাদের আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখিত ও মৌখিকভাবে নেয়া হতো। আমাদের মাঝ থেকে আমাদের সাথী চট্টগ্রামের জননেতা মৌলভী সৈয়দ আহাম্মেদকে ঢাকা ম্যান্টনমেন্টে নিয়ে টর্চার (নির্যাতন) করে মেরে ফেলা হয়। এই সংবাদসহ আমাদের প্রতি ভারতের মোরারজি দেশাই সরকারের বর্বরোচিত অমানবিক আচরণের সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে, কংগ্রেস বিরোধী মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা, ইন্দিরা গান্ধির পতনের মূল নায়ক, যার বদৌলতে মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের সেই প্রবীণ সর্বদলীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বিক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মোরারজি দেশাইয়ের পদত্যাগ দাবি করেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্য হলো, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়া ভারতের নৈতিক দায়িত্ব এবং চিরকালের ঐতিহ্য। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এই নৈতিক দায়িত্ব পালন না করে এবং চির-ঐতিহ্য রক্ষা না করে বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকার নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার হারিয়েছেন। সুতরাং আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। নইলে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে।

সর্বদলীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতনের কার্যক্রম শুরু করলে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকার আমাদের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীসহ ভারতে থাকা কয়েকজনকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার দেয়া কথানুযায়ী ভবিষ্যতে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজে জড়িত হবে না – এই মর্মে মুচলেকা (বন্ড) নিয়ে আমাদের নিঃশর্ত মুক্তি দেন।

মূলতঃ আমাদের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকারের অমানবিক ও অনৈতিক আচরণের ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বদলীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ জনতার মোর্চা ভেঙ্গে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতন ঘটান।

হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা

কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েই হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবর রহমানের জনপ্রিয়তা পুনরায় উদ্ধারের এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ি। একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ও তার কয়েকজন সাথী ছাড়া অন্য কেউ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় না পাওয়ায় এস, এম ইউসুফ, মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর (বর্তমানে জাতীয় পার্টির নেতা), মোস্তাফা মোহসীন মন্টু

(বর্তমানে গণফোরাম নেতা), রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোক্তাদির চৌধুরী), ফরিদপুরের রুমি (শেখ মুজিবের মন্ত্রী মোল্লা জালাল উদ্দিনের ছেলে), আবু সাঈদ (বর্তমানে শেখ হাসিনার তথ্য প্রতিমন্ত্রী) ডাঃ এস, এ মালেক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা) সহ শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর যে সকল নেতাকর্মী ভারতে গিয়েছিল তারা সকলেই একে একে দেশে ফিরে আসেন।

হেদায়েতুল ইসলাম কাজল (শেখ মুজিব ও এরশাদের মন্ত্রী কোরবান আলীর ভাগ্নে ১৯৯৬–এ সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত), গোলাম মোস্তাফা খান মিরাজ, আব্দুস সামাদ পিন্টু, মোবারক হোসেন সেলিম (বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংক কর্মকর্তা ও নেতা), শামীম আফজাল (বর্তমানে বিচারপতি), রাজশাহীর বজলুর রহমান ছানা (বর্তমানে সহকারী এটর্নি জেনারেল) এবং রানাসহ আরো কিছু সাথী বন্ধু মিলে সারা দেশের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং অঞ্চলে নতুন করে দ্রুত সংগঠন গড়ে তুলতে থাকি। বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে আমি ঢাকা শহরের সব কয়টি কলেজ এবং মহল্লায় সংগঠন গড়ে তুলি। আমরা শুধু ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলেই ক্ষান্ত হতাম না। যুবলীগ, কৃষক লীগ এমনকি মূল সংগঠন আওয়ামী লীগও আমরা গঠন করে দিতাম। আমাদের কর্ম সৃষ্টি এবং কর্মী সংগ্রহ অভিযান দ্রুত গতিতে চলতে থাকে এবং আমরা দারুণভাবে সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে থাকি। আব্দুর রাজ্জাক, এস, এম ইউসুফ, শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, রবিউল আলম চৌধুরী ও শফিকুল আজিজ মুকুল (আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা, নামকরা তাত্ত্বিক, দৈনিক বাংলার বাণীর সহ সম্পাদক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক নিবেদিত প্রাণ, চিরকুমার) এবং আমাদের মধ্যে একটা অঘোষিত চেইন অফ কমান্ড তৈরি হয়। অন্যদিকে কিশোরগঞ্জ থেকে আসা মঞ্চ কাঁপানো ও ব্যাপক সাড়া জাগানো বক্তা ও সবচাইতে জনপ্রিয় ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান (ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, প্রাক্তন এমপি, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ থেকে শেখ হাসিনা কর্তৃক বহিস্কৃত) –এর জ্বালাময়ী বক্তৃতা এবং সেই সাথে অভিজ্ঞ ও তুখোড় সংগঠক খ, ম, জাহাঙ্গির এমপি, শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভার প্রতিমন্ত্রী) এর সাংগঠনিক দক্ষতা এইসব মিলে ১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবের সাথে নিহত হয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এবং সংগঠন নতুন প্রাণ পেতে থাকে। প্রকাশ্যে ফজলু জাহাঙ্গীরদের বক্তৃতা-বিবৃতি এবং আমাদের নীতি ও আদর্শের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং কর্মী সৃষ্টি এই দুয়ে মিলে রাজনীতিতে এবং দেশে নতুন পোলারাইজেশন বা মেরুকরণ শুরু হয়। জহুরা তাজুদ্দীন আওয়ামী লীগের আহ্বায়িকা। আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগের চালিকা শক্তি। ১৯৭১–এ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যা পেয়েছিলাম এবং

স্বাধীনতার পর আমরা যা হারিয়েছি, সেই ন্যায়-নীতি, আদর্শ, ত্যাগ সর্বোপরি মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা, ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ, দেশ ও মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার হারিয়ে যাওয়া চেতনা আবার ফিরে আসতে লাগল।

হোটেল ইডেনে শেখ মুজিবরের মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সম্মেলন হলো। প্রথম সম্মেলনে জহুরা তাজুদ্দীনকে আহ্বায়িকা করে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হলো। দ্বিতীয় সম্মেলনে কর্মীদের আপত্তি ও ঘোরতর বিরোধিতা সত্ত্বেও সৈয়দা জহুরা তাজুদ্দীনকে বাদ দিয়ে আব্দুল মালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আব্দুর রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদক করা হলে আমরা কিছুটা চিন্তিত হই এই ভেবে যে, মালেক উকিল আদর্শবান ব্যক্তিত্ব নন। মালেক উকিল প্রেসিডেন্ট হলেও পার্টির চালিকা শক্তি থেকে যায় সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকের হাতেই। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠন এবং মূল শক্তি ছাত্রলীগের সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সারা দেশের ছাত্র প্রতিনিধিদের ফজলু–জাহাঙ্গীর প্যানেলের একক দাবি থাকলেও অজ্ঞাত কারণে কাদের–চুন্নু প্যানেল করা হয়। ওবায়দুল কাদের (শেখ হাসিনার যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী) কে সভাপতি ও বাহালুল মজনুন চুন্নুকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। পরে জানা যায় মালেক–রাজ্জাক নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কাদের–চুন্নু প্যানেল করে। এতে আমরা যারা আদর্শের জন্য নিবেদিত প্রাণ তারা খুবই মর্মাহত হই।

বাহালুল মজনুন চুন্নু নিজ শ্রম ও ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার এর মাধ্যমে নিজেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মানিয়ে নিতে পারলেও সভাপতি হিসেবে ওবায়দুল কাদের কখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা তো দূরের কথা একজন সাধারণ ছাত্রনেতা হিসেবেও দাঁড়াতে পারেনি।

ঢাকসুর নির্বাচনে তিন তিনবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিবারই ভোট পেয়েছে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার সামান্য কিছু উপরে। কিন্তু বাহালুল মজনুন চুন্নু সাধারণ ছাত্র সমাজের কাছে একজন বিনয়ী কর্মঠ ছাত্রনেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছেন।

১৯৭৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগ সরাসরি নিজ দলের প্রার্থী না দিয়ে গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট (গজ)–এর নামে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিপরীতে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে। ঐ নির্বাচনে মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান মূলতঃ আওয়ামী লীগের প্রার্থী জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জনগণের প্রত্যক্ষ

ভোটে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পরে জানা যায়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ঐ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব, অর্থবহ ও বৈধতা দেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে গোপন শলা-পরামর্শ ও যোগশাজসের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিল।

রাজনীতিতে শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগে মালেক উকিল এবং ছাত্রলীগে ওবায়দুল কাদের এর মতো স্থুল, আপোষকামী ও অযোগ্য লোক নেতৃত্বে আসায় নিবেদিত কর্মীদের মাঝে হতাশা ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই হতাশা ও ক্ষোভের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাকের চরিত্র ও ভূমিকা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে। এরই মধ্যে আসে '৭৫ পরবর্তী আওয়ামী লীগের তৃতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজ্জাক এবং তোফায়েল উভয় গ্রুপ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দখলে অর্থাৎ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দখলের তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মালেক উকিল রাজ্জাকের সঙ্গে থাকলেও তোফায়েল গ্রুপ নেতৃত্ব দখলের প্রশ্নে কোনো প্রকার ছাড় না দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এতে আওয়ামী লীগ ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। এমনিতেই মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি ক্ষুদ্র অংশ আগেই দল থেকে বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন আওয়ামী লীগ তৈরি করেছে। নেতৃত্ব দখলের লড়াইয়ের মাঝেই আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে দলের ভিতরের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করার জন্য আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ মুজিবের মেয়ে শেখ হাসিনাকে এই ভেবে নিয়ে আসেন যে, শেখ মুজিব পরিবারের এই অরাজনৈতিক মহিলা সব সময়ই তার (আব্দুর রাজ্জাকের) মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তাঁর ছেলে শেখ কামাল, ভাগ্নে শেখ মনি, শেখ সেলিম এবং কখনো কখনো শেখ জামাল রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বা নাক গলালেও শেখ হাসিনা কখনই রাজনীতির ধারে কাছেও ঘেষেনি। যদিও সাম্প্রতিককালে এক সময়ে শেখ হাসিনা ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ভিপি ছিলেন বলে প্রচার চালানো হলেও শেখ হাসিনা নিজে কখনোই এমন দাবি করেননি। শেখ হাসিনার ভিপি থাকার প্রচারণা চালোনো হলেও কবে কখন বা কোন সালে ভিপি ছিলেন তা প্রচার করা হয় না। বরং শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও ছিলেন না – এটা তিনি (শেখ হাসিনা) ছাত্রলীগের প্রায় অনুষ্ঠানেই বলেন।

তাছাড়া শেখ হাসিনা মহিলা, আবার দেশের বাইরে রয়েছেন। কখনো দেশে এলেও রাজনৈতিক অনভিজ্ঞ ও অরাজনৈতিক মহিলা হওয়ার কারণেই আব্দুর রাজ্জাক

যেভাবে চালাবেন, শেখ হাসিনা সেইভাবেই চলবেন। এই ধারণা থেকেই আব্দুর রাজ্জাক গং শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি করেন।

অতীতে মালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ওবায়েদুল কাদেরকে ছাত্রলীগের সভাপতি করায় সংগঠনের নীতি ও আদর্শবান, ত্যাগী নেতাকর্মী বাহিনীর আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যায় এবং শেখ মুজিবের মেয়ে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ায় স্বস্তিবোধ করে।

সেনাবাহিনী এবং জেনারেলরা রাজনীতিতে বেআইনী ও অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং জনগণের উপর প্রভুত্ব ফলাতে থাকলে আমরা '৭১ ও '৭৫–এর যোদ্ধারা সেনাবাহিনীর বিকল্প শক্তি তৈরির চিন্তা করতে থাকি। ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণকালে ছাত্ররা সেনাবাহিনীর চাইতেও শক্তিশালী বাহিনী বলে ধারণা দেয়া হতো। ছাত্রদের বুঝানো হতো সশস্ত্র কিন্তু অশিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে সেনাবাহিনী। নিরস্ত্র কিন্তু শিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে ছাত্রবাহিনী। সেনাবাহিনী বাস করে ক্যান্টনমেন্টের ব্যারাকে এবং ছাত্ররা বাস করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে।

সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং জনতার স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে। ছাত্ররা জনগণের পক্ষালম্বন করে এবং জনতার জন্য জীবন দান করে। আগামী দিনে লড়াই হবে, সেই লড়াইয়ে শিক্ষিত ছাত্রবাহিনীর কাছে অশিক্ষিত সেনাবাহিনী পরাজিত হবে।

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল শওকত আলী এই দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগে যোগদান করলে রেজাউল বাকি, গোলাম মোস্তাফা খান মিরাজ, আব্দুস সামাদ পিন্টু, মরহুম হেদায়েতুল ইসলাম কাজল, মোবারক হোসেন সেলিম এবং আরো কয়েকজন '৭১ ও '৭৫ এর যোদ্ধা মিলে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম কর্নেল শওকত আলীকে সাথে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সংগঠন করার। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্নেল শওকত আলীকে আহ্বায়ক করে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ নামে '৭১ ও '৭৫–এর যোদ্ধাদের একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলা হলো। আমাদের দৃষ্টি ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

লক্ষ্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রম ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলো। আমরা ছাত্র-যুবকদের আসন্ন সমাজ-বিপ্লবে অংশগ্রহণের ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষা দিতে লাগলাম। ছাত্র-যুবকদের বলে কয়ে জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত করতে লাগলাম। বিপ্লব করতে হলে ব্যক্তি জীবনের ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষতির হিসেব রাখা যাবে না। কেননা, বিপ্লব

ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব রাখে না। বিপ্লব ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ফসল এনে দেয়। যা মূলতঃ ভবিষ্যত বংশধরদের নিশ্চিত সুন্দর জীবন এনে দেয়। কার্যক্রমের এই পর্যায়ে আমাদের সাথে যোগ দেয় '৭৫ সালে ০৩রা নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফ–এর নেতৃত্বে সংগঠিত ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার। যোগদানকারী সামরিক অফিসারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেঃ কর্নেল এ, এইচ, এম গাফ্ফার বীর বিক্রম (১৯৭৫–এর ০৩রা নভেম্বরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের দায়ে সামরিক বাহিনী থেকে বরখাস্ত এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের বাণিজ্যমন্ত্রী), মেজর নাসির (পত্রিকার কলাম লেখক এবং বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী লুৎফর নাহার লতার স্বামী) এবং ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লা। কর্নেল গাফ্ফার সব সময় ইংরেজিতে রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। এই ক্লাসে তিনি শিখিয়েছিলেন ভোগে শুধু সুখ আছে, কিন্তু তৃপ্তি নেই। ত্যাগে সুখ এবং তৃপ্তি দুটোই আছে। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অরাজনৈকিত কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দেশে ফিরে এলে আওয়ামী লীগের কর্মী এবং জনতা বিমানবন্দরে শেখ হাসিনাকে নজিরবিহীন সংবর্ধনা দেয়।

এই জিয়া সেই জিয়া নয়

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার তিন-চারদিন পরই তাঁর সাথে আমাদের প্রথম বৈঠক হয়। এই বৈঠকে আলোচনার শুরুতেই শেখ হাসিনা ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের বলেন, আজ থেকে প্রচার চালাতে হবে যে, এই জিয়া সেই জিয়া নয়।

অর্থাৎ বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়াউর রহমান নয়। শেখ হাসিনা হিটলারের তথ্য উপদেষ্টা গেবিয়েলস–এর থিউরি অনুসারে বলেন, তোমরা যদি ভালোভাবে প্রচার করতে পারো, এই জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া নয়, তাহলে দেখবে একদিন মানুষ এটাই বিশ্বাস করবে।

আমাদের মাঝ থেকে একজন প্রশ্ন করল, তাহলে এই জিয়াকে কোন জিয়া বলব?

শেখ হাসিনা বললেন, অত কথার দরকার নেই; শুধু বলবে এই জিয়া সেই জিয়া নয়।

এই কথা শুনে আমরা সবাই বিস্মৃত হলাম এবং নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্ ও হাসাহাসি করলাম। কিন্তু আমরা কেউ কোনোদিন শেখ হাসিনার এ শিক্ষা "এই জিয়া সেই জিয়া নয়" প্রচার করলাম না।

রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা

১৯৮১ সালের ২৩শে এবং ২৪শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র তিন তলায় সেমিনার কক্ষে '৭১ ও '৭৫ যোদ্ধাদের এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের গোপন ও জরুরী বৈঠক বসে। এই বৈঠকে কর্নেল শওকত আলী (বর্তমানে আওয়ামী লীগের এমপি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে হত্যার পরিকল্পনা এবং হত্যাকালীন ও হত্যা পরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেন। কর্নেল শওকত আলী বলেন, জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে গেলে চট্টগ্রামের জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম–এর নেতৃত্বে জিয়াকে হত্যা করা হবে এবং এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সভানেত্রী শেখ হাসিনা অবহিত আছেন। সভানেত্রী আমাদেরকে এই হত্যাকাণ্ডে সহায়তা ও ভূমিকা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মাত্র কয়েক দিন হলো দেশে এসেছেন, এর মধ্যেই তিনি এমন একটি নির্দেশ কীভাবে দিতে পারেন? প্রশ্ন করা হলে কর্নেল শওকত আলী বলেন, শেখ হাসিনা দেশের বাইরে (ভারত) থাকতেই এ বিষয়ে অবহিত আছেন। কর্নেল শওকত আলী জিয়া হত্যাকাণ্ডে ও হত্যা পরবর্তী সময়ে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বলেন যে, হত্যাকাণ্ডের সময় আমাদের চট্টগ্রাম ও ঢাকায় থাকতে হবে। আমাদের যারা চট্টগ্রাম থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে জেনারেল মঞ্জুর–এর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় চলে আসা এবং ঢাকায় যারা থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে চট্টগ্রাম থেকে আসা অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় রেডিও-টেলিভিশনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের মধ্যে একজন কবে নাগাদ এই হত্যাকাণ্ড হতে পারে প্রশ্ন করায় কর্নেল শওকত বলেন, এখন থেকে যে কোনো সময় হতে পারে। যখনই জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে যাবেন তখনই তাকে হত্যা করা হবে। কর্নেল শওকত আরো বলেন, জিয়া হত্যা সংঘটন পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম, এরশাদসহ অন্যান্য জেনারেলগণ এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান–এর গার্ড রেজিমেন্টের কর্নেল মাহফুজুর রহমান অভ্যূত্থানের নেতা জেনারেল মঞ্জুরের সাথে থাকবেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে জিয়া হত্যা সংঘটিত হয়ে যাবে সেই মুহূর্ত থেকে এরা বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং দ্বন্দ্ব শুরু হবে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে থাকবে পাকিস্তান প্রত্যাগত (রিপ্রেট্রিয়েট) অফিসার ও জোয়ানসহ ঢাকার জেনারেলগণ। অন্যদিকে জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে থাকবে চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার ও জোয়ানরা। জিয়া হত্যার পর জেনারেল এরশাদের আনুগত্যশীল সেনাবাহিনী এবং জেনারেল মঞ্জুরের অনুগত্যশীল সেনাবাহিনীর লড়াই হবে, যুদ্ধ

হবে। এই যুদ্ধে উভয় গ্রুপেরই ক্ষতি হবে এবং একটি গ্রুপকে পরাজিত ও ধ্বংস করে অপর গ্রুপটি বিজয়ী হলেও খুবই দুর্বল থাকবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা বিজয়ী দুর্বল গ্রুপকে আক্রমণ করে পরাজিত করব। এই হচ্ছে আমাদের হত্যা ও হত্যা পরবর্তী করণীয়।

এই জরুরী গোপন বৈঠকে ০৩রা নভেম্বর, ১৯৭৫–এ সামরিক অভ্যূত্থানকারী কর্নেল গাফ্ফার, মেজর নাসির, ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং আরো কয়েকজন সদস্যসহ প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরজন যোদ্ধা উপস্থিত ছিল। একটি গ্রুপকে চট্টগ্রাম গিয়ে জেনারেল মঞ্জুরের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার দায়িত্ব দেয়া হয়। ত্রিশ-পয়ত্রিশ সদস্যের দ্বিতীয় গ্রুপকে সাড়া দেশ সফর করে জিয়া বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছানো ও যেকোনো মুহূর্তে যেকেনো ধরণের এ্যাকশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে দায়িত্ব দেয়া হয়। বাকি সবাইকে তৃতীয় গ্রুপ হিসেবে চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত করে ঢাকায় রাখা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম পৌঁছলে, জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের কিছু সংখ্যক সেনা অফিসার অভ্যূত্থান করে ৩০শে মে প্রত্যুষে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অতি সহজে, বলা যায় বিনা বাধায় মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করতে পারলেও সেনাবাহিনীর সাধারণ জোয়ান ও জনগণ এই হত্যাকাণ্ড প্রত্যাখান করে।

জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম এর আনুগত্যশীল অফিসারগণ চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশন দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রাখে। এদিকে ঢাকায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ, জেনারেল মীর শওকত বীর উত্তম, জেনারেল রহমানসহ সকল অফিসার ও জোয়ানেরা জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

জেনারেল মঞ্জুরকে মোকাবেলা করার জন্য কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের জিওসি ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানকে এক ব্রিগেড সৈন্যসহ চট্টগ্রামের দিকে পাঠানো হয়। ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান চট্টগ্রাম সড়কের শুভপুর ব্রিজের ঢাকা পারে অবস্থান নেয় এবং শুভপুর ব্রিজের চট্টগ্রাম পারে ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানকে মোকাবেলা করার জন্য জেনারেল মঞ্জুরের প্রতি আনুগত্যশীল ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদ তার সৈন্যসহ অবস্থান নেয়। অন্যদিকে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিবাদে এবং জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে জনগণ ব্যাপক বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করলেও উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জিয়া হত্যার সংবাদ শোনামাত্র প্রাণভয়ে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ)–এ "রোগী সিরিয়াস, কারো সাথে দেখা হবে না" বোর্ড লাগিয়ে ভর্তি

হন। পরে জিয়াউর রহমানের প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান এবং যোগাযোগমন্ত্রী আব্দুল আলীম সিএমএইচ–এ গিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে বলেন, সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদ বলেছেন আপনি এখন রাষ্ট্রপতি।

প্রতি উত্তরে উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার বলেন, আগে সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদকে আনেন।

তারপর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। দৃশ্যত সেনাবাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে শুভপুর ব্রিজে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান নিলেও এবং ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাতের ও জীবননাশের অবস্থা সৃষ্টি হলেও কার্যত জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে আমাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ দেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক জোয়ানরা মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা সমর্থন করে না এবং জিওসি জেনারেল মঞ্জুরের প্রতি আনুগত্য পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে। জেনারেল মঞ্জুরের পক্ষে শুভপুর ব্রিজে আসা ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদ–এর সৈন্যরা, ব্রিজের অপর পারে ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। নন-কমিশন অফিসার এবং সিপাহিরা ক্যাপ্টেন দোস্ত মেহাম্মদকে সরাসরি পরিস্কার বলে দেয়, জেনারেল মঞ্জুর প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করেছে। এখন জেনারেল মঞ্জুর নিজে প্রেসিডেন্ট হবে। আমরা সুবেদার, হাবিলদার, সিপাহিরা যা আছি তাই থাকব। আমরা নিজেরা নিজেদের জীবন নিব না। আপনারা অফিসারেরা অফিসারেরা যুদ্ধ করেন। আমরা যুদ্ধ করব না।

তখন ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদ অবস্থা বেগতিক দেখে ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং আত্মসমর্পণ করে। জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দিতে এবং সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোচনা করতে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে এলে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট তার সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর বিশেষত নন-কমিশন এবং জোয়ানরা মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি এতই আনুগত্যশীল ছিল যে, সুযোগ পাওয়া মাত্র মুহূর্তের মধ্যেই তারা জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে জেনারেল মঞ্জুর ও তার প্রতি আনুগত্যশীল অফিসারেরা আর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যেতে তো পারেইনি বরং পালিয়ে যেতেও পারেনি। পালিয়ে যাওয়ার সময় দৃশ্যত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল কিন্তু প্রকৃত অর্থে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের প্রতি আনুগত্যশীল সৈন্যদের আক্রমণে মঞ্জুর সমর্থিত কয়েকজন অফিসার হতাহত হলেও মেজর খালেদ ও মেজর মুজাফফর পালিয়ে ভারত সীমান্তের দিকে না গিয়ে ঢাকা আসতে সমর্থ হয় এবং

কর্নেল শওকত আলীর সেলটারে (আশ্রয়ে) থাকে। অন্যদিকে জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তমসহ তার আরো কয়েকজন অনুগামী অফিসার জিয়া সৈনিকদের হাতে গ্রেপ্তার হলে, জিয়াউর রহমান হত্যায় নিরাপদ দূরত্ব থেকে জড়িত তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ গ্রেপ্তারকৃত জেনারেল মঞ্জুরকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করান। জেনারেল এরশাদ জিয়া হত্যায় তার সংশ্লিষ্টতা যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেই জন্য জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তমকে গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করান।

জেনারেল মঞ্জুর আমাদের অস্ত্র দিতে ব্যর্থ হলে এবং গ্রেপ্তার হলে ও নিহত হলে আমাদের সাথীরা ঢাকা ফিরে এসে মেজর খালেদ ও মেজর মুজাফফরকে রাজশাহী সীমান্ত দিয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ পৌঁছে দেয়। মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যায় জড়িত এবং গ্রেপ্তারকৃত জেনারেল মঞ্জুরের সাথী বারজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের গোপন সামরিক আদালত (কোর্ট মার্শাল)–এ বিচার শুরু হলে কর্নেল শওকতের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ এবং মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এই তিনটি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন ঐ বিচারের বিরুদ্ধে এবং গ্রেপ্তারকৃত মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয়। উল্লেখিত তিনটি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচী চালিয়ে যেতে থাকে এবং এই সকল কর্মসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতাকে ঐ সময় পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের মুক্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আন্দোলন সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার অভিযোগে সামরিক আদালতের গোপন বিচারে বারজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলো। এদিকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘোষণা করেন এবং তিনি নিজে প্রার্থী হন।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের বিপরীতে ডঃ কামাল হোসেনকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও নির্বাচনের তারিখ পিছানোর দাবি করতে থাকেন। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদ সমর্থিত বিচারপতি সাত্তার সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পিছানোর দাবি অগ্রাহ্য করে। ১৯৮১ সালের ঐ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হলে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্স বা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা)–এর

কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা যে কোনো একজন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে হত্যা করে তাদের নির্বাচন পিছানোর দাবি বাস্তবায়িত করার গোপন নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য যে, একজন প্রার্থী খুন হলে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ঐ নির্বাচন তিন মাসের জন্য স্থগিত হয়ে যাবে। প্রার্থী হত্যায় শেখ হাসিনার গোপন নির্দেশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং সাত্তার সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পিছানোর দাবি মেনে না নেয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় এবং সেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী সমর্থিত বিএনপি প্রার্থী বৃদ্ধ বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি হলেও মূলতঃ ক্ষমতা থেকে যায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের হাতে। জেনারেল এরশাদ যখন যেভাবে খুশি সেভাবেই রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে পরিচালনা করতে থাকেন। প্রকৃত অর্থে জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার হয়ে যান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের নাচের পুতুল।

লেবানন ট্রেনিং

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর যারা কাদের সিদ্দিকী (বাঘা সিদ্দিকী)'র সঙ্গে মিলে ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে যুদ্ধ করেছিল, তাদের কয়েকজন ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ঢাকা সেনানিবাস) দখল করার একটা প্রস্তাব ও পরিকল্পনা জানালে শেখ হাসিনা উক্ত প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সানন্দে গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটা থাকে এই রকম যে, রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কমিটেড পঁচিশ-তিরিশ হাজার যুবককে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে, নির্দিষ্ট একটি দিনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো হামলা করে দখলে নিয়ে নেয়া। আর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নেয়া মানেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ফেলা। শেখ হাসিনা সর্বশক্তি দিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিলেন এবং তার নিজের (শেখ হাসিনার) পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব দেয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

শুরু হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করার জন্য রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করা এবং সাথে সাথে এই কর্মীদের কোথায় সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া যায় সেই স্থান খুঁজে বের করা। কর্মী সংগ্রহের জন্য সারা দেশে গোপনে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শুরু হলো। এই

কর্মীদের মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বড় ধরনের একটা কর্মী বাহিনী তৈরি করা গেল। এই কর্মী বাহিনীর মধ্য থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে বাছাই করে একটা ব্যাচ তৈরি করা হলো সামরিক শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ মিলেটারি (আর্মি) ট্রেনিং–এর জন্য প্রথম ব্যাচ তৈরি করা হলো। কিন্তু সমস্যা হলো সামরিক শিক্ষা দেয়ার জায়গা এবং অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে? রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়া যত সহজ সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া অত সহজ নয়। সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটা নিরাপদ মুক্ত এলাকা। যে এলাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা নিরাপদে অস্ত্র চালনার মাধ্যমে অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করবে। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা ভারতীয় এলাকা নিরাপদে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয় মাত্র বছর কয়েক আগে ভারত তার মাটি থেকে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের মাটি ব্যবহারের কোনোই সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং হিলট্র্যাক্টও সামরিক শিক্ষার জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আমাদের কোনো বন্ধু নেই। আফগানিস্তান কট্টর মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। সেখানেও আমাদের কোনো জায়গা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) এর কোনোই সাড়াশব্দ নেই। এমতাবস্থায় চিন্তা করতে করতে লেবানন এবং পিএলও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন) এর কথা বিবেচনায় এসে গেল। গোপন যোগাযোগ করা হলো পিএলও–এর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি আহমেদ এ, রাজেক এর সাথে। পিএলও–এর ঢাকাস্থ গুলশান এ্যাম্বাসিতে পিএলও প্রতিনিধি আহমেদ এ, রাজেকের সাথে গোপনে কয়েক দফা বৈঠক হলো। আহমেদ এ, রাজেককে খোলাখুলি বলা হলো আমরা সামরিক প্রশিক্ষণ চাই, বিনিময়ে তোমরা যা চাও আমরা দেবো। আহমেদ এ, রাজেক মাসখানেক সময় চাইল।

মাসখানেক পর আহমেদ এ, রাজেক এর সাথে আবার বৈঠক হলো। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো পিএলও আমাদেরকে লেবাননের মাটিতে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দেবে। বিনিময়ে আমাদেরকে পিএলও এর পক্ষে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আমরা রাজি হলাম। আমাদের প্রথম ব্যাচ লেবাননে গেলে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসরাইলের বিপক্ষে পিএলও এর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সরাসরি রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। প্রথম ব্যাচ যুদ্ধ করতে থাকবে, দ্বিতীয় ব্যাচ লেবাননে যাবে। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে রণাঙ্গণে গিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলে প্রথম ব্যাচ বাংলাদেশে ফেরত দেবে। অর্থাৎ আমাদের একটা ব্যাচকে সব সময়ই পিএলও এর হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

আমাদের বিমানে করে লেবাননে নিয়ে যাওয়া এবং ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যয় পিএলও বহন করবে। আমাদের যারা যুদ্ধ করবে তাদের পিএলও বেতন দেবে।

সময়ে সময়ে সকল বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জানানো হলো এবং তার পরামর্শ নেয়া হলো। পিএলও এর সাথে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম ব্যাচকে ১৯৮২ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে লেবাননে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

প্রথম ব্যাচ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ইসরাইল সীমান্তে গিয়ে পিএলও এর পক্ষে যুদ্ধ করতে লাগল। এদিকে দ্বিতীয় ব্যাচ লেবাননে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। এমন সময় ইসরাইল আক্রমণ করে লেবাননই দখল করে নিল। আমাদের সকল যোদ্ধা ইসরাইলীদের হাতে বন্দী হলো। আমাদের সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ভেস্তে গেল। আমাদের যোদ্ধাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজন সবাই কান্নাকাটি শুরু করল। মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা বেমালুম সব ভুলে গেলেন। নিঃশব্দ নীরব থাকলেন। আমাদের ছেলেদের ব্যাপারে কোনোদিন আর কোনো কথা বললেন না। অতঃপর অতি কষ্টে পাকিস্তান রেডক্রস–এর মাধ্যমে ইসরাইলের হাতে বন্দী আমাদের যোদ্ধাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হলো।

এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ

এদিকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম এরশাদকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পুর্ণাঙ্গ আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন।

জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিতে থাকেন। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও সরকার উৎখাত করে সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার চার-পাঁচ দফা গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই ঢাকা সেনানিবাসে সংবাদপত্রের সম্পাদকের বৈঠক ডেকে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘোষণা দেন।

১৯৮২ সালের মার্চের ২৪ তারিখ জেনারেল এরশাদ বিনা বাধায় বিনা বাক্যে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি ভবন বঙ্গভবন থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন এবং পরের দিন আবার কলার ধরে নিয়ে এসে

রেডিও-টেলিভিশনে নিজের অযোগ্যতা ও তার সরকারের দূর্নীতি-স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি কারণে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি (রাষ্ট্রপতি সাত্তার) বিদায় নিলেন এ মর্মে ভাষণ দিতে বাধ্য করে। অশীতিঃপর বৃদ্ধ অথর্ব রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার প্রাণভয়ে কাপুরুষের মতো নিরবে নিঃশব্দে প্রাণ নিয়ে বিদায় নিলেন। সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ দেশে সামরিক আইন জারি করলেন এবং তিনি স্বয়ং হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও বিচারপতি এ, এফ, এম হাসানউল্লা চৌধুরীকে করলেন ক্ষমতাবিহীন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি। শেখ হাসিনার গোপন আমন্ত্রণে ও সহযোগিতায় জেনারেল এরশাদ সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে জগদ্দল পাথরের ন্যায় জনগণের বুকে চেপে বসল।

১৯৮৩–এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র হত্যা

বছর না ঘুরতেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ আর বঙ্গবন্ধু জননেত্রী শেখ হাসিনার গোপন আতাতের মাঝে গোপন বিরোধ সৃষ্টি হলো। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ আলী মিয়ার মহাখালীস্থ আণবিক শক্তি কমিশনের সরকারি বাসভবনে শেখ হাসিনা বলেন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ হাতের মুঠোয় আর থাকতে চাচ্ছে না। আমার হাতের মুঠো থেকে খাটাসটা ক্রমশ বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে হাতের মুঠোয় পোক্ত করে আটকে রাখা দরকার।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য শেখ হাসিনা নামকা ওয়াস্তে ভূয়া এক ছাত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা হাজির করে বলেন, এই ছাত্র আন্দোলনে অবশ্যই ছাত্র নিহত হতে হবে। যে করেই হোক ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যা হতেই হবে।

ছাত্র হত্যা হলে ছাত্র আন্দোলন চাঙ্গা হবে। আর ছাত্র আন্দোলন চাঙ্গা থাকলেই কেবল সিএমএলএ জেনারেল এরশাদকে হাতের মুঠোয় শক্তভাবে রাখা যাবে। শেখ হাসিনা ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার কঠিন নির্দেশ ও পরিকল্পনা দিলেন। কোনো আততায়ী বা অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে ছাত্র হত্যা হলে কাজ হবে না। ছাত্র হত্যা হবে শাসক এরশাদের মেলেটারি অথবা পুলিশের হাতে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, টাকা যাই লাগুক, এটা করতেই হবে। কীভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায় সবাই এ নিয়ে খুব ব্যস্ত এবং চিন্তিত।

যোগাযোগ হলো প্যারা মেলেটারি ট্রুপস আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার (সিনিয়র এসপি) হাফিজুর রহমান লস্করের সঙ্গে। এই হাফিজুর লস্কর পুলিশের

অফিসার হয়েও দীর্ঘদিন যাবত এনএসআই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্ট বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা) এর ডেপুটি ডিরেক্টর পদে ঘাপটি মেরে বসেছিলেন। এরশাদ ক্ষমতায় এসেই হাফিজুর রহমান লস্করকে এই বলে এনএসআই থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করেছেন যে, তুমি পুলিশের লোক হয়ে এখানে কী কর? যাও পুলিশের পোষাক পরে রাস্তায় চোর ধর। বলেই এনএসআই–এর ডেপুটি ডিরেক্টরের পদ থেকে হাফিজুর রহমান লস্করকে সোজা আর্ম পুলিশের তৎকালীন হেডকোয়ার্টার ১৪নং মিরপুরে কোম্পানি কমান্ডার পদে বদলী করে পাঠিয়ে দেয়। এই কারণে আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার (পুলিশের সিনিয়র এসপি) হাফিজুর রহমান লস্কর জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে খুবই চটা ও বৈরী ছিলেন। এর উপর ছিল নগদ অর্থের টোপ। এরশাদের প্রতি ভয়ানক ক্ষেপা ও বিরাগভাজন এবং নগদ অর্থের টোপ দুইয়ে মিলে, ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার প্রস্তাব আসা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে হাফিজুর রহমান লস্কর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এনএসআই–এর মূলতঃ কাজ হচ্ছে কারা সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের লিস্ট বা তালিকা তৈরি করে সরকারকে সরবরাহ করা এবং সরকারের পতন হলে, সঙ্গে সঙ্গে পতন হয়ে যাওয়া সরকারের আমলের তৈরি করা সমস্ত নথিপত্র পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে নতুন সাদা ফাইল নিয়ে নতুন সরকারের কাছে হাজির হওয়া।

৩১শে মে, ১৯৮১ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে এনএসআই–এর কর্মকর্তাগণ জিয়া বা বিএনপি সরকারের আমলে তৈরি করা সমস্ত নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলতে যায়। কিন্তু যেই মুহূর্তে নথিপত্রে অগ্নিসংযোগ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ বিএনপি সরকারই টিকে যায়। ফলে এনএসআই কর্মকর্তাগণ নথিপত্র পুড়িয়ে না ফেলে আবার তা সংগ্রহশালায় যত্ন করে তুলে রাখেন। উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হলেও মূলতঃ ক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনী প্রধান হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের হাতে। সেই সুবাদে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে রেখে এনএসআই–এর নথিপত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। এনএসআই–এর নথিপত্রে জিয়াউর রহমান বা বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধাচারণকারীদের তালিকায় জেনারেল এরশাদের নামও ছিল। ফলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসেই প্রথমেই এনএসআই থেকে হাফিজুর রহমান লস্করদের ঝেটিয়ে বিদায় করে। আর সেই কারণেই এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে হাফিজুর রহমান লস্কর গং জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের পতনের যে কোনো প্রস্তাব বা প্রক্রিয়ায় সামিল হন।

আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার নীল-নকশা চূড়ান্ত হয়। নীল-নকশা অনুযায়ী যে

কোনো প্রকারে কোনো রকমে ছাত্রদের একটা মিছিল বাংলা একাডেমির দক্ষিণে, কার্জন হলের উত্তরে শিশু একাডেমির পশ্চিমে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত নিয়ে আসতেই হবে। বাকি কাজ আর্ম পুলিশ সেরে ফেলবে। অর্থাৎ আমাদের দায়িত্ব ছাত্রদের একটা মিছিল দোয়েল চত্বর পর্যন্ত নিয়ে আসা। তারপর সেই মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যার দায়িত্ব আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করের। এই নীল-নকশা অনুযায়ী মিছিল নিয়ে আসার প্রাথমিক দায়িত্ব পড়ে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের জিএস কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্য নিরঞ্জন সরকার বাচ্চু, সাধন সরকার, যাদব, বিদ্যুৎ, শ্যামল প্রমুখ এর উপর।

জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে একটা মিছিল করার প্রস্তাব নিয়ে ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান, বাহালুল মজনুন চুন্নু, ডাঃ মোস্তফা মহিউদ্দিন জালাল, খ, ম জাহাঙ্গীর, ডাকসুর ভিপি আক্তারুজ্জামান, জিএস জিয়াউদ্দিন বাবলু, ফারুক, আনোয়ার, মিলন, জালাল প্রমুখ ছাত্রনেতাদের সাথে আলোচনা করা হলে সকলেই মিছিলের পক্ষে মত দেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমেই মিছিলের তারিখ নির্ধারণ হলো এবং মিছিল শিক্ষা ভবন পর্যন্ত যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলা ভবন থেকে ছাত্র মিছিল শুরু হলো। এদিকে শিশু একাডেমির কাছে আর্ম পুলিশ নিয়ে মিছিলে গুলি করে ছাত্র হত্যার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হাফিজুর রহমান লস্কর চাতক পাখির ন্যায় অপেক্ষা করতে থাকল।

কিন্তু কিছুতেই মিছিলকে কলা ভবনের আশপাশের বাইরে দেয়া গেল না। অধিকাংশ ছাত্রনেতা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে মুখে অস্বীকার না করলেও, কার্যত মিছিল নিয়ে কেউ কলা ভবনের বাইরে গেল না। ফলে নীল-নকশা ভেস্তে যাওয়ায় আমরা উত্তেজিত হয়ে ছাত্রনেতাদের লাঞ্ছিত করলাম এবং কোনো কোনো ছাত্রনেতাকে শারীরিকভাবে আঘাতও করলাম। আবার ছাত্র মিছিলের নতুন তারিখ নির্ধারিত হলো।

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, ১লা ফাল্গুন ছাত্র মিছিল হবে এবং মিছিল শিক্ষা ভবন অভিমুখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩ সকাল ০৮:০০ টায় ১৪নং মিরপুর আর্ম পুলিশের হেড কোয়ার্টারে এনএসআই–এর সাবেক কর্মকর্তা পুলিশের সিনিয়র এসপি আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করকে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলের চূড়ান্ত কর্মসূচী অবহিত করা হলো এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাত ০৮:০০ টায় হাফিজুর রহমান লস্কর–এর মিরপুর দুই নম্বরের বাসায় আগামীকাল ১৪ই ফেব্রুয়ারি সকাল ১০:০০ টায় যে কোনো কিছুর বিনিময়ে ছাত্র মিছিল শিশু একাডেমি পর্যন্ত নিয়ে

যাওয়ার কর্মসূচী নিশ্চিত করা হলো এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হলে তিনিও (হাফিজুর রহমান লস্কর) ছাত্র হত্যার জন্য প্রস্তুত বলে চূড়ান্তভাবে জানান।

রাত ১১:০০ টাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের এ্যাসেম্বলি বিল্ডিং—এ ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাচ্চুর রুমে সর্বশেষ গোপন বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাচ্চু, মোবারক হোসেন সেলিম, ডাকসুর মহিলা সম্পাদিকা নাহিদ আমিন খান, সাধন সরকার, যাদব, বিদ্যুৎ প্রমুখকে আগামীকাল ১লা ফাল্গুন মোতাবেক ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সকালের ছাত্র মিছিল ও ছাত্র হত্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো ও আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান, বাহালুল মজনুন চুন্নুসহ প্রগতিশীল ছাত্রনেতা ও নেতৃত্বস্থানীয় কর্মীরা কোনো অবস্থাতেই আণবিক শক্তি কমিশনের পরে যাতে মিছিলে না থাকে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আজ ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩। ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক, আজ বসন্ত। ঋতুর রাজা বসন্তের এই সমীরণে আজ সবাই উদ্বেলিত। বাঙালি রমণীরা লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি পরে ভোর হতে না হতেই ঘর থেকে বেড়িয়ে এসেছে বসন্ততে অবগাহণ করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া ও সামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা খুব ভোর থেকেই লাল পেড়ে বাসন্তি রঙয়ের শারি পরে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে। বসন্ত উৎসবমুখর বিশ্ববিদ্যালয়। লাল পাড় হলুদ বর্ণের শাড়ি পরে কোনো কোনো ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছেড়ে মনের মানুষের সাথে বসন্ত উৎসব করতে দূর-দূরান্তে চলে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় লাল পেড়ে হলুদ শাড়ির সমারোহ। আজি এ বসন্তে ... সবাই বসন্তের দোলায় দুলছে। কেউ জানে না একটু পরে কি ঘটতে যাচ্ছে। কে নিহত হতে যাচ্ছে। কোন স্নেহময়ী মাতার বুক খালি হচ্ছে। কোন পিতা সন্তানহারা হচ্ছে। বেলা ১০:০০ টার দিকে কলাভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মিছিলের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা জমায়েত হতে শুরু করে। একটি মোটর সাইকেল ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে শেখ হাসিনা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্ম পুলিশের হাফিজুর রহমান লস্কর এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। মের সাইকেলটি দ্রুত গতিতে ৩২ নম্বরে শেখ হাসিনা ও শিশু একাডেমির পূর্ব পাশে অবস্থানরত আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে যাচ্ছে। বেলা ১১:০০ টা নাগাদ ছাত্র মিছিল শুরু হলো। যেসব ছাত্রনেতা ও কর্মীদের আণবিক শক্তি কমিশনের পরে মিছিলে আর না থাকতে জানিয়ে দেয়ার কথা তাদেরকে তা জানিয়ে দেয়া হলো। সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা মতো মিছিলসহ সব কিছুই ঠিকঠাক চলতে লাগল। ছাত্র মিছিল আণবিক শক্তি কমিশন পর্যন্ত এগিয়ে গেলে কিছু ছাত্রনেতা ও কর্মীরা মিছিলের পিছন থেকে সরে পড়ল। মিছিল এগিয়ে গেল বাংলা একাডেমি ছেড়ে আরো সামনে দক্ষিণের দোয়েল চত্বরের দিকে।

একবারে দোয়েল চত্বরের কাছে এবং মিছিল যেই দোয়েল চত্বর পিছনে ফেলে পূর্ব দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা হাফিজুর রহমান লস্করের আর্ম পুলিশের গুলি গুরুম গুরুম, টাস্ টাস্। মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল কয়েকজন ছাত্র। মোটর সাইকেলটি দ্রুত ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে শেখ হাসিনাকে গুলির সংবাদ দিয়ে আবার ছুটে চলল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ইতোমধ্যে ছাত্ররা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের নিয়ে এসেছে, গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে জয়নাল ও জাফর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী ছেড়ে পরকালে চলে গেছে। জয়নাল ও জাফরের মায়ের কোল খালি হয়েছে। শূন্য হয়েছে পিতার বুক। নীল-নকশা বাস্তবায়িত হওয়ার চূড়ান্ত সংবাদটি নিয়ে মোটর সাইকেলটি চলে গেল ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে। দুজন ছাত্র হত্যার সফলতার সংবাদটি শেখ হাসিনাকে দিয়ে মোটর সাইকেলটি ফিরে এলো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। থেমে গেছে ১লা ফাল্গুনের বসন্তের উৎসব। ছাত্ররা তাদের নিহত সাথী জাফর ও জয়নালের লাশ কলা ভবনের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ ঐতিহাসিক বটতলায় নিয়ে এসেছে। বিকাল ০৩:০০ টায় জানাজা ও শোক সভার কর্মসূচীটা ৩২ নম্বরে দিলে, দুপুর ০২:০০ টা নাগাদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা আসেন এবং তার (শেখ হাসিনার) দীর্ঘ প্রতিক্ষিত নিহত ছাত্রদের লাশ দেখে রুমাল দিয়ে চক্ষু মোছার ভাব করতে করতে কোনো কর্মসূচী না দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করেন। শোকে ম্রিয়মাণ ছাত্রছাত্রীরা বটতলায় সমবেত হতে থাকে এবং ১লা ফাল্গুনে বসন্তের পোষাক লাল পেড়ে বাসন্তি রঙয়ের শাড়ি পরে প্রত্যুষে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া রোকেয়া ও সামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে এসে ছাত্র হত্যার ঘটনায় শোকে বিহ্বল হয়ে বটতলার শোকসভায় সমবেত হয়।

শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে গিয়েই সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে কোনোরূপ আন্দোলনের কর্মসূচী না দেয়ার বিনিময়ে এরশাদের কাছ থেকে কতগুলো গোপন দাবি আদায় করে নেন। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনের কর্মসূচী দেয়া হবে না এই মর্মে শেখ হাসিনার কাছে থেকে নিশ্চয়তা ও আশ্বাস পাওয়ার পর জেনারেল এরশাদ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চতুর্দিক থেকে নজিরবিহীন পুলিশি ও মেলেটারি হামলা চালায়। পুলিশের চতুর্দিক থেকে সাঁড়াশি হামলার মুখে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বটতলায় অনুষ্ঠিত জানাজা ও শোক সভায় সমবেত ছাত্রছাত্রীরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌঁড়াতে থাকে। কিন্তু যেদিকেই দৌঁড়ায় সেদিকেই পুলিশের ও আর্মির বেধরক মার। নিমেষের মধ্যেই বটতলার হাজার হাজার সেন্ডেল-জুতা পড়ে থাকা ছাড়া কোনো মানুষের চিহ্ন থাকে না।

জাফর ও জয়নালের লাশ দুটি অতিকষ্টে ছাত্ররা ধরাধরি করে সূর্যসেন হলে নিয়ে যায় এবং সূর্যসেন হলের গেটের ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়। হলের রুমের ভেতরে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী আর হলে আঙ্গিনাসহ সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু পুলিশ আর সেনাবাহিনী। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ আর আর্মি হলের কেচি গেট ভেঙ্গে রুমের মধ্যে প্রবেশ করবে। অবস্থা বেগতিক দেখে মোটর সাইকেল আরোহী সূর্যসেন হলের দোতলা থেকে এক লাফ দিয়ে পড়ল হলের আঙ্গিনায়। আর অমনি শকুনের দল যেমনি মরা গরু ঘিরে ধরে খায় তেমনি পুলিশের দল মোটর সাইকেল আরোহীকে ঘিরে পেটাতে লাগল। এরই মধ্যে মোটর সাইকেল আরোহী প্রাণপণ বেগে ছুটে চলল সূর্যসেন হলের বাউন্ডারি প্রাচীরের দিকে। মোটর সাইকেল আরোহী দৌঁড়াচ্ছে আগে আগে, পিছনে পিছনে শকুনের কাঁকের ন্যায় দৌঁড়াচ্ছে আর পিটাচ্ছে পুলিশ ও আর্মি। পরি কি মরি করে এক লাফে সূর্যসেন হলের প্রাচীর টপকে কাটাবন আর পলাশির রাস্তায় গিয়ে পড়ল মোটর সাইকেল আরোহী। সেখান থেকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে শেখ হাসিনাকে না পেয়ে আণবিক শক্তি কমিশনের পরিচালক শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার মহাখালীস্থ সরকারি বাসভবনে গিয়ে শেখ হাসিনার পাজেরো জিপ পাওয়া গেলেও শেখ হাসিনাকে পাওয়া গেল না। শেখ হাসিনার প্রিয় এবং বিশ্বাসী বাবুর্চী রমাকান্তর কাছ থেকে জানা গেল তিনি (শেখ হাসিনা) কাউকে সাথে না নিয়ে অপরিচিত একটি প্রাইভেট কার–এ করে অপরিচিত একমাত্র চালক আরোহীর সাথে বোরকা পড়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলের গেট ও দরজা ভেঙ্গে পুলিশ এবং মেলেটারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের বেধরক মারপিট ও গ্রেপ্তার করে সারারাত খোলা আকাশের নিচে বসিয়ে রাখে এবং নিহত ছাত্র জাফর ও জয়নালের লাশ নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, ঐ সময় (১৯৮৩ সালে) বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বিএনপি–এর সাংগঠনিক কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ফলে বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়েও আসেননি। সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদ এবং তার সামরিক আইনের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সহজ সরল প্রাণ এদেশের ছাত্র সমাজের প্রথম আন্দোলন, প্রথম বিদ্রোহ এবং আত্মদান। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং শেখ হাসিনার পাতানো আপোষকামিতার কারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বৃথা হয়ে যায় জাফর ও জয়নালের আত্মদান। সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে, নির্ভাবনায় ক্ষমতায় বসে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে ছাত্র সমাজ দিশেহারা হয়ে নেতিয়ে যায়। এদেশের আন্দোলন সংগ্রাম–এর মূল চালিকা শক্তি

আওয়ামী লীগ এবং তার নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে ম্যানেজ করে দোর্দণ্ড প্রতাপে চলতে থাকে এরশাদের সামরিক শাসন।

সেলিম ও দেলোয়ার হত্যা

বছর ঘুরে এলো ১৯৮৪ সাল। আবার ফিরে এলো ভাষা আন্দোলনের শহীদের মাস, ফেব্রুয়ারি মাস। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নতুন বছরের নির্দেশ, এরশাদের বিরুদ্ধে আবারো ছাত্র আন্দোলন করতে হবে।

০৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সাল। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বিকাল ০৪:০০ টায় বসল এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক। বৈঠকে নেত্রী যে কোনো প্রকারেই হোক ছাত্র আন্দোলন করার কঠোর নির্দেশ দিলেন। শুরু হলো আবার ছাত্র হত্যার নতুন পরিকল্পনা। একদিকে চলতে লাগল ছাত্র হত্যাকারী পুলিশ অফিসার হাফিজুর রহমান লস্করদের ভাড়া করার কাজ। অন্যদিকে চলতে লাগল সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ।

শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে খুবই দ্রুত ছাত্র হত্যাকারী পুলিশ অফিসারদের ভাড়া করার কাজ সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন করার জন্য সংগঠিত করা সম্পন্ন হলো না। নানাভাবে বহু করম চেষ্টা তদবির করেও ছাত্রদের আন্দোলনে শরীক করা গেল না।

গোটা ছাত্র সমাজই এরশাদের বিরোধী। কিন্তু আন্দোলনের প্রশ্নে, আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্নে ছাত্র সমাজ শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করল না। বেগম জিয়া এবং বিএনপি–র তখনো তেমন কোনো অস্তিত্ব অনুভব করা যায়নি। দিন গড়িয়ে যায়, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে হত্যাকারী পুলিশেরা ১৯৮৩–এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংগঠিত ছাত্র হত্যার অনুরূপ পরিকল্পনা ও কর্মসূচী হাতে নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবং গত মধ্য ফেব্রুয়ারির ন্যায় একটা ছাত্র মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসার জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছে। তাগাদা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। দিন যায় কিন্তু আন্দোলনের খবর নেই। এক পর্যায়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা অধৈর্য হয়ে তোমাদের দ্বারা কিছুই হবে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

অনেক চেষ্টা করেও শ'পাঁচেক ছাত্রের একটা মিছিল নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসতে পারলাম না। ফলে গত ১৯৮৩–এর মধ্য ফেব্রুয়ারির ন্যায় ছাত্র হত্যা সম্ভব না হওয়ায় ছাত্র হত্যার ধরণ পাল্টানো হলো।

আর্ম পুলিশের কোম্পানি কমান্ডার পুলিশের সিনিয়র এসপি হাফিজুর রহমান লস্কর ছাত্র হত্যার পরিকল্পনায় আর্ম পুলিশের পরিবর্তে রায়ট পুলিশকে সম্পৃক্ত করে এবং নতুন পরিকল্পনা ঠিক হয় যে, ২০/৫০ জনের একটি মিছিল কোনো রকমে যে কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো দিক দিয়ে বাইরে নিয়ে এলেই রায়ট পুলিশ (যে পুলিশ ২৪ ঘন্টা বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকে) ছাত্র হত্যা পরিকল্পনা সফল করে দেবে। সাধারণ ছাত্র তো দূরের কথা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাই মিছিলে আসতে চায় না।

এদিকে নেত্রীর কড়া নির্দেশ ছাত্রলীগের একটা খন্ড মিছিল নিয়ে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যেতে হবে, নইলে তোমাদের দায়িত্ব থেকে বিদায় নিতে হবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস–এর বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো এবং যথারীতি এই সিদ্ধান্ত জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জানানো হলে শেখ হাসিনার মাধ্যমে এই সংবাদ হাফিজুর রহমান লস্করের মারফত রায়ট পুলিশের ঘাতকদের জানানো হলো।

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, হঠাৎ ৩০/৪০ জন ছাত্রের একটা মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে চানখারপুল হয়ে ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এর দিকে দ্রুত যেতে থাগল। এই মিছিলের পেছনে পেছনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রায়ট পুলিশের একটি লরি আসতে লাগল।

বুঝা গেল এইবার সামনে থেকে ছাত্র হত্যা করা হবে না। হত্যা করা হবে মিছিলের পেছন থেকে। যারা এই পরিকল্পনা অবহিত তারা যতটা সম্ভব মিছিলের সামনে থাকতে লাগল। মোটামুটি মিছিলের অনেকেই জানে পেছন থেকে মিছিলে আক্রমণ করা হবে। রায়ট পুলিশের লরি থেকেই আক্রমণ করা হবে। তবে রায়ট পুলিশের লরি থেকে গুলি করা হবে, না অন্য কোনোভাবে আক্রমণ করা হবে এটা কেউ জানত না। তখন বিকেল ০৫:০০ টা, ক্ষুদ্র ছাত্র মিছিলটি নিমতলী পার হয়ে ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রায়ট পুলিশ তাদের লরিটি বিদ্যুৎ গতিতে মিছিলের উপর তুলে দিলো। মিছিলের পিছন দিকে থাকা সেলিম মুহূর্তের মধ্যে পুলিশের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেল। বাকি সবাই রাস্তার দুই দিকে ছিটকে পড়ে প্রাণে বাঁচলেও দেলোয়ার সোজা দৌঁড়াতে লাগল। প্রাণভয়ে দেলোয়ার দৌঁড়ায় আগে, দেলোয়ারের প্রাণ বধ করতে পেছনে দ্রুত ছুটছে রায়ট পুলিশের লরি।

মিনিট দুয়েক–এর মধ্যেই দেলোয়ারের দেহ চাকায় পিষে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেয় পুলিশের লরি। দেলোয়ারের দেহ এমনভাবে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এটা যে দেলোয়ারের দেহ তা বোঝাতো দূরের কথা, এটা যে একটা মানুষের দেহ তাই বুঝা যাচ্ছে না। আর পেছনে পিচ ঢালা রাস্তার সাথে থেতলে মিশে আছে সেলিমের দেহ।

ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে সংবাদের জন্য অধির আগ্রহে উৎসুক হয়ে বয়ে থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী, সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে রায়ট পুলিশের চাকায় পিষ্ট হয়ে সেলিম এবং দেলোয়ারের নিহত হওয়ার সংবাদটি পৌঁছাল মোটর সাইকেল আরোহী।

ছাত্রলীগের দুইজন নেতার নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে শেখ হাসিনা পুলকিত হয়ে আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, সাবাস।

তারপর গাড়ির ড্রাইভার জালালকে বললেন, জালাল গাড়ি লাগাও আমি বাইরে যাব।

মোটর সাইকেল আরোহী সঙ্গে যেতে চাইলে নেত্রী বললেন, তোমরা এক কাজ করো, আগামীকাল সকালে ৩২ নম্বরে সবাই আসো। আজ সবাই চলে যাও।

পরদিন সকালে ৩২ নম্বরে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে মোটর সাইকেল আরোহী সোজা মহাখালী চলে গিয়ে ড্রাইভার জালাল এবং পাজেরো জিপ দেখতে পেয়ে নিশ্চিত হলো নেত্রী এখানেই আছেন। কিন্তু ঘরে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে বাবুর্চি রমাকান্তের কাছে জানতে পারল নেত্রী অজ্ঞাত গাড়ি চালকের সঙ্গে অজ্ঞাত স্থানে গিয়েছেন অনেক ভোরে। দুপুর ০১:০০ টার দিকে ফিরে এসে নেত্রী খাওয়া-দাওয়া করে সোজা চলে এলেন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে। ছাত্রলীগের বেশ কিছু নেতা বিকাল ০৩:০০ টায় ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে এসে সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ারকে পুলিশের লরির চাকায় পিষ্ট করে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে সামরিক একনায়ক স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করার কর্মসূচী চাইলে সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই বলে ছাত্রনেতাদের শান্তনা দেন যে, আমাদের মূল শত্রু জিয়াউর রহমান এবং তার দল বিএনপি। জিয়া তো শেষ। জেনারেল এরশাদ বিএনপি–এর কাছ থেকে কিছুদিন হলো ক্ষমতা দখল করেছে। আমাদের প্রধান কাজ বিএনপিকে চিরতরে শেষ করে দেয়া। এই মুহূর্তে আমরা জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যাব না। আমাদের মূল শত্রু বিএনপি এটা মনে রাখতে হবে। ছাত্রনেতারা সেলিম ও দেলোয়ারের হত্যার জন্য আবেগ আপ্লুত হলে শেখ হাসিনা বলেন, আবেগপ্রবণ হয়ে লাভ নেই। সময় হলেই এদের পরিবারকে পুষিয়ে দেয়া হবে।

ছাত্রনেতারা কোনো রকম কর্মসূচী ছাড়াই ভগ্ন হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ভবন ত্যাগ করল।

দেশদ্রোহী অসভ্য বাহিনী

০৩রা মে ১৯৮৪–এর এক পড়ন্ত বিকেলে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে বসে গল্প করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েকজন। গল্পে গল্পে

৭১–এর মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রসঙ্গ উঠল। প্রসঙ্গ উঠল **১৯৭১**–এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কথা।

জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে বললেন, এটা একটা সেনাবাহিনী হলো? এটা একটা বর্বর, নরপিচাশ, উচ্ছৃঙ্খল, লোভী, বেয়াদব বাহিনী। এই বাহিনীর আনুগত্য নেই, শৃঙ্খলা নেই, মানবিকতা নেই, মান্যগণ্য নেই, নেই দেশপ্রেম। এটা একটা দেশদ্রোহী অসভ্য হায়েনার বাহিনী। তোমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথা বলো। সাড়া বিশ্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো এত ভদ্র, নম্র, সত্য, বিনয়ী এবং আনুগত্যশীল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কি অসম্ভব সভ্য আর নম্য তারা।

পঁচিশে মার্চ রাতে তারা (পাকিস্তান আর্মি) এলো, এসে আব্বাকে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব) সেলুট করল, মাকে সেলুট করল, আমাকেও সেলুট করল। সেলুট করে তারা বলল, স্যার আমরা এসেছি শুধু আপনাদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। অন্য কোনো কিছুর জন্য নয়। আপনারা যখন খুশি, যেখানে খুশি যেতে পারবেন। যে কেউ আপনার এখানে আসতে পারবে। আমরা শুধু আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। আপনারা বাইরে গেলে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব। কেউ আপনাদের এখানে এলে আমরা তাকে ভালোভাবে তল্লাশী করে তারপর ঢুকতে দেবো। এসবই করা হবে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য। সত্যিই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যা করেছে তা সম্পূর্ণ আমাদের নিরাপত্তার জন্যই করেছে। ২৬শে মার্চ দুপুরে আব্বাকে (শেখ মুজিব) যখন পাকিস্তানি আর্মিরা নিয়ে যায়, তখন জেনারেল টিক্কা খান নিজে এসে আব্বাকে ও মাকে সেলুট দিয়ে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে আব্বাকে (শেখ মুজিবকে) বলে, স্যার আপনাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাকে নেয়ার জন্য বিশেষ বিমান তৈরি (স্পেশাল ফ্লাইট রেডি)। আপনি তৈরি হয়ে নেন এবং আপনি ইচ্ছে করলে ম্যাডাম (বেগম মুজিব) সহ যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে নিতে পারেন। আব্বা মা'র সঙ্গে আলোচনা করে একাই গেলেন। পাকিস্তান আর্মি যতদিন ডিউটি করেছে এসে প্রথমেই সেলুট দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, আমার দাদীর সামান্য জ্বর হয়েছিল। পাকিস্তানিরা হেলিকপ্টার করে টুঙ্গিপাড়া থেকে দাদীকে ঢাকা এনে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে। জয় (শেখ হাসিনার ছেলে) তখন পেটে, আমাকে প্রতি সপ্তাহে সিএমএইচ (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল) নিয়ে চেকআপ করাতো। জয় হওয়ার একমাস আগে আমাকে সিএমএইচ–এ ভর্তি করিয়েছে। **১৯৭১** সালে জয় জন্ম হওয়ার পর পাকিস্তান আর্মিরা খুশিতে মিষ্টি বাটোয়ারা করেছে এবং জয় হওয়ার সমস্ত খরচ পাকিস্তানিরাই বহন

করেছে। আমরা যেখানে খুশি যেতাম। পাকিস্তানিরা দুই জিপ করে আমাদের সাথে যেত। নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিত।

আর বাংলাদেশের আর্মিরা। জানোয়ারের দল, অমানুষের দল। এই অমানুষ জানোয়ারেরা আমার বাবা-মা-ভাই সবাইকে মেরেছে–এদের যেন ধ্বংস হয়।

মসজিদ সরিয়ে ফেলুন

১৯৮৬ সালের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আবার ছাত্র আন্দোলনের জন্য নতুন করে তাগিদ দিতে থাকলেন। বহু চাপাচাপি, ধমকাধমকি এবং তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও যখন আন্দোলনের বিন্দুবিসর্গও হলো না তখন তিনি রেগে মে মাসের মাঝামাঝি তার জন্মভূমি এবং পিতার বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় চলে গেলেন এবং বেশ কিছুদিন টুঙ্গিপাড়ায় থাকলেন। এরই মধ্যে একদিন শেখ বাড়ির (শেখ হাসিনার নিজের বাড়ির) কিছু মুরব্বীসহ টুঙ্গিপাড়া গ্রামের ২০/৩০ জন মুরব্বী এসে শেখ হাসিনার অংশের একটি নারিকেল গাছ দ্বারা শেখ বাড়ির অন্য শরীকের জায়গায় নির্মিত মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে জানিয়ে সেই নারিকেল গাছটি কেটে ফেলার প্রস্তাব করলে, শেখ হাসিনা সরাসরি বলে দেন আমার নারিকেল গাছ কাটা হবে না। দরকার হলে মসজিদ সরিয়ে ফেলেন। তখন সকল মুরব্বী পবিত্র কুরআন পাকে মসজিদ সরানো নিষেধ আছে বলে মসজিদের দেয়াল ও স্থান ঘেঁষে থাকা শেখ হাসিনার জায়গায় অবস্থিত নারিকেল গাছটি কেটে ফেলার জন্য বারবার অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। তখন শেখ হাসিনা বলেন, এই মসজিদ বন্ধ করে দেন। আমি আরো বড় মসজিদ বানিয়ে দেবো।

মুরব্বীরা বলেন, একটু বাতাস হলেই নারিকেল গাছটি মসজিদের গায়ে এবং ছাদে লাগতে থাকে। এইভাবে চললে মসজিদের ছাদ এবং দেয়াল অচিরেই ভেঙ্গে যাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ভেঙ্গে যায় যাক্, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আপনারা লক্ষ বছর কান্নাকাটি করলেও নারিকেল গাছ কাটব না।

১৯৮৬–এর নির্বাচন

১৯৮৪ সালের **২৮**শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ার নিহত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যারপর নাই চেষ্টা করেও আর ছাত্র আন্দোলন করতে পারলেন না। ইত্যবসরে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ পাকাপোক্তভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে

যায়। যদিও এরই মাঝে নিরবে নিঃশব্দে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি উল্লেখযোগ্য একক রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো।

এরশাদ তার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করেই ১৯৮৬—তে সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা ও প্রস্তাব দেন। এরশাদের প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, না করার বিষয় নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহলে ও নেতাদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু হলে বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বিএনপি—এর পক্ষ থেকে এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ হঠাও আন্দোলন করার প্রস্তাব দেয়।

তখন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে গুলশানের জনৈক ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরী (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী)'র গুলশানের বাসায় তৎকালীন ডিজিডিএফআই (ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ডিফেন্স ফোর্স ইন্টিলিজেন্ট) ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানের সাথে গোপন বৈঠক হয়। ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান জেনারেল এরশাদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করেন এবং নির্বাচনী সকল ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিলে শেখ হাসিনা আন্দোলনের অংশ হিসেবে র্নিবাচনে অংশগ্রহণ করার পক্ষে মত দেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিশেষত কমিউনিষ্ট পার্টির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফরহাদের প্রচেষ্টায় বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার মতপার্থক্য এই কৌশলে কমিয়ে আনা হয় যে, নির্বাচনে শুধুমাত্র দুই নেত্রী (খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা) ছাড়া আর কেউ দাঁড়াবে না। অর্থাৎ বামপন্থী নেত্রীবৃন্দ বেগম জিয়াকে এটা বুঝাতে সমর্থ হন যে, বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা দু'জনে দেড়'শ দেড়'শ তিন'শ আসনে নির্বাচনে দাঁড়াবেন, আর বাকি সবাই মিলে দুই নেত্রীকে তিনশ আসনে জিতিয়ে দিবেন। তাহলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে এবং তাতে করে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিভেদ এবং অনৈক সৃষ্টি হবে না।

বেগম খালেদা জিয়া এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়াসে দুই নেত্রী ১৫০+১৫০=৩০০ আসনে নির্বাচনের প্রস্তাবে সায় দেন এবং শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া মুখোমুখি সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন। কিন্তু গুলশানের ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরীর মাধ্যমে দুই নেত্রীর এই গোপন নির্বাচনী কৌশলের কথা এরশাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং এরশাদ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে যে, এক ব্যক্তি পাঁচের অধিক বা বেশি আসনে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে না।

ফলে দুই নেত্রীর দেড়'শ দেড়'শ তিন'শ আসনে নির্বাচন করার কৌশল ভুন্ডল হয়ে যায়। তখন বেগম জিয়া এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ পতনের আন্দোলনের পুরোনো অবস্থানে চলে যান। এদিকে গুলশানের এস, আই চৌধুরীর

বাড়িতে ডিজিডিএফআই ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানের সাথে শেখ হাসিনার আবার বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকে দাবি করা হয় নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে আগে যে পরিমাণ অর্থ ধরা হয়েছে, এখন তার তিনগুণ অর্থ দিতে হবে। ডিজিডিএফআই ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান এক ঘন্টার সময় চেয়ে চলে যান এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে চলে আসেন। ঘন্টা দুই পর সন্ধ্যার দিকে ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরী দুইটি মাইক্রোবাস সঙ্গে নিয়ে ৩২ নম্বরে এসে হাজির। এস, আই চৌধুরী আর শেখ হাসিনার মধ্যে এক-দেড় মিনিট কথা, তারপরই হুকুম হলো তাড়াতাড়ি মাইক্রোবাস থেকে বস্তাগুলি নামিয়ে আনো। সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোবাস থেকে মুখ সেলাই করা মোট নয়টি নতুন বস্তা নামিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের নিচতলায় লাইব্রেরি আর বেডরুমের মাঝে যে মাস্টার বাথরুম সেই বাথরুমে রাখা হলো।

এরপর শেখ হাসিনা আদেশ করলেন সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করতে এবং ডঃ কামাল হোসেনসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে জরুরী ভিত্তিতে আসতে বলার জন্য।

ডঃ কামাল হোসেনসহ যে সকল নেতাদের টেলিফোনে পাওয়া গেল তাদের অনতিবিলম্বে বঙ্গবন্ধু ভবনে আসতে বলা হলো, বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে টেলিফোনের মাধ্যমে এবং সশরীরে গিয়ে জরুরী সংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ জানানো হলো। সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু জানানো সম্ভব হলো না। শুধু বলা হলো জরুরী এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, সংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ডঃ কামাল হোসেনসহ কোনো নেতাই কিছু জানেন না। মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানেন মূলতঃ চার ব্যক্তি (১) শেখ হাসিনা, (২) ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরী, (৩) ডিজিডিএফআই ব্রিগেডিয়র মাহামুদুল হাসান এবং (৪) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেনাবাহিনী প্রধান রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ।

অধিক রাত হওয়া সত্ত্বেও বহু সংখ্যক সাংবাদিক এসে উপস্থিত হলো ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে।

শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের এশানের নির্বাচনে যাওয়ার (অংশগ্রহণ করার) সিদ্ধান্ত জানালেন। নেতারা বললেন, নির্বাচনে যাব ঠিক আছে, কিন্তু একদিন আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি, তারপর সিদ্ধান্ত নেই।

শেখ হাসিনা বললেন, আমাদের সময় নেই, তাড়াতাড়ি করতে হবে। খালেদা জিয়া এবং তার দল বিএনপি'কে ল্যাং মেরে নির্বাচনে যেতে হবে—কাজেই এটা নিয়ে এত আলোচনার দরকার নেই। বাইরে সাংবাদিকরা বসে আছে। এখনই নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। বলেই সরাসরি সংবাদিকদের মাঝে এসে উপস্থিত

হলেন এবং নির্বাচনে যাওয়ার (অংশগ্রহণ করার) ঘোষণা দিলেন। তার পরদিন ছয় ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া পাঁচ তলা (পাঁচ তাক) একটি স্টিলের ওয়ারড্রোব আনা হলো এবং যে বাথরুমে সেলাই করা বস্তাগুলো আসে সেখানে রাখা হলো। তারপর একে একে বস্তা খোলা হতে লাগল আর বস্তার ভিতরে থাকা পাঁচ শত টাকার নতুন বান্ডিলগুলো ঐ স্টিলের ওয়ারড্রোব (আলমারি)–এ সাজিয়ে রাখা হলো। সব টাকা ওয়ারড্রোবে না ধরায় বাকি টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হলো।

শুরু হলো ১৯৮৬–এর সংসদ নির্বাচনী প্রক্রিয়া। দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হলো। এক ভাগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জেনারেল এরশাদের পাতানো নির্বাচনে জড়িয়ে পড়ল। আরেক ভাগ বেগম খালেদা জিয়ার আহ্বানে এরশাদ পতন ও পাতানো নির্বাচন বর্জন ও ঠেকানোর চেষ্টায় রত হলো। শেখ হাসিনা সর্বশক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জোরদার আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় নিতে হবে এবং সামরিক শাসক এরশাদকে বিদায় করতে হবে।

শেখ হাসিনার আহ্বানে স্বতঃস্ফুর্তভাবে জনগণ এগিয়ে না এলেও আওয়ামী লীগের কর্মী এবং সমর্থকরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে এলো। আওয়ামী লীগের কর্মী এবং সমর্থকরা সাড়া দেশেই একটা নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলল। ঐ সময়ই ফিলিপাইনে সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কোস–এর বিরুদ্ধে নিহত জননেতা মিঃ একুইনোর বিধবা স্ত্রী মিসেস কোরাজন একুইনো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সাড়া বিশ্ব ফিলিপাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে বাংলাদেশেও সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ফিলিপাইনের মতোই প্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আছে।

শেরে বাংলা নগরে মানিক মিয়া এভিনিউ–এ আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী জনসভা। বিশাল নির্বাচনী জনসভা। এর মাত্র দুই দিন আগে ফিলিপাইনে নির্বাচন হয়ে গেছে। সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কোস নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দিয়ে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। অপরদিকে মিসেস কোরাজন একুইনো ঐ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। মিসেস কোরাজন এইকুনোর পক্ষে ফিলিপাইনের জনগণ রাস্তায় নেমেছে। আর সেই জনগণকে দমিয়ে দেয়ার জন্য একনায়ক মার্কোস–এর পক্ষে সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। একদিকে জনগণের বিক্ষোভ অপরদিকে সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক। ফিলিপাইনের অবস্থা গত দুই দিন থেকে খুবই উত্তপ্ত। জনগণও ভিক্ষোভে সামিল হওয়ার জন্য জেনারেল মার্কোসের কার্ফু ভেঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। আর সেই জনগণের দিকে তাক করে ট্যাঙ্ক নিয়ে ধেয়ে আসছে সেনাবাহিনী। ফিলিপাইনের দিকে সারা পৃথিবীর

দৃষ্টি যতখানি গভীর বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টি তার চাইতে অনেক বেশি গভীর। ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশেও প্রায় একই ঘটনা, একই অবস্থা। জনগণ বনাম সামরিক বাহিনী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বনাম সামরিক একনায়ক। বাংলাদেশের জনগণ সজাগ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছে ফিলিপাইনের শেষ পরিণতির দিকে। ফিলিপাইনের উত্তাপ বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতিতে লাগছে। এমনি মুহূর্তে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী বিশাল জনসভা চলছে। হঠাৎ মঞ্চের নেতাদের বক্তৃতা বন্ধ করে মাইকে ঘোষণা করা হলো ফিলিপাইনের একনায়ক জেনারেল মার্কোস দেশ (ফিলিপাইন) থেকে পালিয়ে গিয়েছে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। মনে হলো যেন বাংলাদেশ থেকে জেনারেল এরশাদ পালিয়ে গেছে এবং শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছেন। মঞ্চের নেতারা একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন। এ যেন পথের দিশা পাওয়া গেল। বাংলাদেশেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। দুই দিন পর বাংলাদেশে নির্বাচন হলো। জেনারেল এরশাদ জেনারেল মার্কোসের ন্যায় মিডিয়া ক্যু করে ফলাফল পাল্টিয়ে দিয়ে নিজের দল জাতীয় পার্টিকে বিজয়ী ঘোষণা করল। অপরদিকে শেখ হাসিনা ঐ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে ফিলিপাইনের মিসেস কোরাজন একুইনোর মতো নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করলেন। জেনারেল এরশাদ পার্লামেন্ট অধিবেশন ডাকলো শেখ হাসিনাও পাল্টা পার্লামেন্ট ডাকলেন। জেনারেল এরশাদের পার্লামেন্ট অভিবেশন শুরু হলো পার্লামেন্ট হাউজে। শেখ হাসিনার পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু হলো পার্লামেন্টের সিঁড়িতে। এইভাবে কয়েকদিন চলতে লাগল। একদিন সন্ধ্যার পর গুলশানের ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরী ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে তিনটি মাইক্রোবাস নিয়ে এলেন। আগে থেকে অপেক্ষায় থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দৌঁড়ে এলেন এবং এস, আই চৌধুরীকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরিতে বসিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে এসে মাইক্রোবাস থেকে দ্রুত ছালার বস্তাগুলো আগের জায়গায় নামিয়ে রাখতে বললেন। যথারীতি বস্তাগুলো নামিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলো। নেত্রী মাইক্রোবাসের সঙ্গে আসা বঙ্গবন্ধু ভবনের বাইরে থাকা সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের চা খাওয়ানোর কথা বললে এস, আই চৌধুরী আপত্তি করে এখনই চলে যেতে হবে বলে তখনই বিদায় নিলেন। নেত্রী তাকে মাইক্রোবাস এ তুলে দিয়ে ফিরে এলেন।

অনুমান করা গেল নির্বাচনে যাওয়ার আগে নয় বস্তায় দশ কোটি টাকা ছিল। আর এখন তের বস্তায় পনের কোটি টাকা। বাংলাদেশের জনগণের আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল জননেত্রী শেখ হাসিনা ফিলিপাইনের মিসেস কোরাজন একুইনোর মতো আপোষহীন থাকবেন, জনগণকে রাস্তায় বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাবেন।

জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে আসবে, সামরিক একনায়ক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। এরশাদ জনগণ–এর বিপক্ষে সেনাবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক নামাবে। জনতার প্রতিরোধের মুখে সেনাবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক অকার্যকর হবে, সামরিক স্বৈরাচার এরশাদ দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু না, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জনতার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে নীরবে-নিঃশব্দে এরশাদের পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেত্রী হলেন। দেশ থেকে সামরিক শাসন এবং সমর নায়ক স্বৈরাচারী এরশাদ তো গেলই না বরং ১৯৮৬–এর নির্বাচনের পাতানো খেলায় সামরিক একনায়ক জেনারেল এরশাদ পূর্বের চাইতে আরো শক্তিশালী রূপে জগদ্দল পাথরের ন্যায় জনগণের ঘাড়ে চেপে বসল।

এত বড় মাঠ

এরশাদের পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার নিশান পেট্রল জিপের একপাশে জাতীয় পতাকা অন্যপাশে দলীয় (আওয়ামী লীগ) পতাকা লাগিয়ে তার (শেখ হাসিনার) নিজ জন্মভূমি এবং পিত্রালয় টুঙ্গিপাড়ায় এলেন। পরদিন সকালবেলা গ্রামের এক জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকরা তাঁদের স্কুল পরিদর্শনের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এক বিকেলে দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা উক্ত স্কুল পরিদর্শনে যান। গ্রামের পথ, মাটির পথ। সেই পথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যাচ্ছে। মাইল খানেক যাওয়ার পর দেখা গেল স্কুল। একটি মাঠ তার তিন দিকে লম্বা তিনটি বড় টিনের ঘর। তিনটি ঘরের দু'টিই অর্ধেকের বেশি ভেঙ্গে পড়ে আছে। একটি ভালো আছে। এই ভালো ঘরটি বেশি দিন হয়নি তৈরি হয়েছে। আর ভাঙ্গা দু'টি ঘর জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। কেউ নেই দেখার তা বোঝাই যাচ্ছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে এবং শোনা যাচ্ছে স্কুলের মাঠে পাঁচ সাত'শ শিশু-কিশোর এবং বালক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং শ্লোগান দিচ্ছে জয় শেখ হাসিনা। জয় বঙ্গবন্ধু। বলতে গেলে এদের কারো গায়ে জামা নেই। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আছে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। অর্থাৎ গায়ে জামা তো নেই–ই পরনের প্যান্টও নেই। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আর তীব্র কণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে জয় শেখ হাসিনা, জয় জাতীর পিতা শেখ মুজিব।

ভেঙ্গে পড়ে থাকা স্কুল ঘর। আর সেই স্কুল মাঠেই দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ সাত'শ বস্ত্রহীন শিশু-কিশোর আর বালকের দল। এই হচ্ছে শেখ হাসিনার ও শেখ হাসিনার পিতার জন্মভূমির চেহারা। শিক্ষালয় বিধ্বস্ত, গায়ে বস্ত্র নেই, এরা দিনে দিনে আরো বড় হলে অন্ন পাবে কোথায়? দেখে গা শিউরে উঠল। হঠাৎ মনে হলো, আমাদের

মাঝে তো বঙ্গবন্ধু কন্যা এরশাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আছেন। দেখি তিনি কী বলেন!

মাঠের এক কোণায় একটি জীর্ণ টেবিল, একটি চেয়ার আর একটি মাইক লাগানো আছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী ধীরে ধীরে এই টেবিলের সামনে এলেন, কিন্তু চেয়ারে বসলেন না। সরাসরি মাইকে বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি ভাঙ্গা বিধ্বস্ত শিক্ষালয়ের কথা বললেন না, বললেন না বালকদের বস্ত্রহীনতার কথা, বললেন না ভবিষ্যতের অন্ন সংস্থানের কথা। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এসব তিনি কিছুই বললেন না। তিনি বললেন, এত বড় মাঠ! এত বড় মাঠের কথা শহরের ছেলেরা তো চিন্তাই করতে পারে না। মাঠ ভরে গাছ লাগিয়ে দেবেন। অনেক গাছ লাগাবেন।

নেত্রীর সফর সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন বললেন, পেয়ারা গাছ লাগাবেন। ছেলেরা খেতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেত্রী বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়ারা গাছ লাগাবেন। এই ছেলেরা খেতে পারবে। অতঃপর নেত্রী ফিরে এলেন তার নিজ বাড়িতে।

সামরিক একনায়ক জেনারেল এরশাদ একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। জননেত্রী শেখ হাসিনা তার (এরশাদের) রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেত্রী। অপরদিকে গৃহবধু বেগম খালেদা জিয়া আপোষহীন মনোভাব নিয়ে তার সংগঠন বিএনপি'কে শক্ত ভীতের উপর দাঁড় করিয়ে একক আন্দোলনের চেষ্টায় রত।

জনগণের কাছে ধীরে ধীরে বেগম খালেদা জিয়া আপোষহীন নেত্রী হিসেবে ঠাঁই পেতে শুরু করেছেন এবং মাঝে মাঝে আন্দোলনের কর্মসূচী দেয়াও আরম্ভ করেছেন। বেগম জিয়ার আন্দোলনের কর্মসূচীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে শেখ হাসিনাও কৌশলে কর্মসূচী দিয়ে যাচ্ছেন।

আন্দোলন আন্দোলন খেলা

স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেক হাসিনাকে রেখে, বেগম খালেদা জিয়া একক আন্দোলন করলে কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে না ভেবে মোটর সাইকেল আরোহী আন্দোলনের আন্তরিকতার বিষয়ে প্রশ্ন করলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দেন, "আমি (শেখ হাসিনা) আছি ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) পিছনে পিছনে। ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) যে কর্মসূচী দেবে, আমিও (শেখ হাসিনা) সেই কর্মসূচী দেবো। যাতে মনে হয় আমিও (শেখ হাসিনা) আন্দোলনে আছি। আন্দোলন সফল করে তোলার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলিষ্ঠ ভূমিকার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলে দেবে তারা যেন আন্দোলন আন্দোলন খেলা করে কিন্তু আন্দোলন যেন না করে। অর্থাৎ

আন্দোলনের সাথে থেকে আন্দোলনের পিঠে ছুড়ি মারতে হবে। ম্যাডামকে (খালেদা জিয়া) ব্যর্থ করে ঘরে বসিয়ে দিতে হবে, আর যাতে রাজনীতিতে নাম না দেয়। জনগণ এবং আওয়ামী লীগের মাঠকর্মীরা এরশাদ পতনের আন্দোলনের জন্য এতই উদগ্রীব যে, আন্দোলন প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা (আওয়ামী লীগ কর্মীরা) আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকে। যখন আওয়ামী লীগের কর্মীদের কাছে জননেত্রী শেখ শেখ হাসিনার আন্দোলন না করার গোপন নির্দেশ পৌঁছানো হলো, তখন আওয়ামী লীগ কর্মীরা সভানেত্রী শেখ হাসিনার মুখ থেকে সরাসরি এই নির্দেশ শুনতে চাইল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পক্ষে সরাসরি এই নির্দেশ দেয়া সম্ভব হলো না। ফলে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকলেন বেগম খালেদা জিয়া আর জীবন দিতে থাকলো নূর হোসেনসহ আওয়ামী লীগ কর্মীরা।

ছিয়াশির পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া

১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর ঢাকায় আওয়ামী যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন বুকে "স্বৈরাচার নিপাত যাক" আর পিঠে "গণতন্ত্র মুক্তি পাক" লিখে বিক্ষোভ মিছিল করার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হলে দেশী এবং বিদেশী বিশেষ করে বহিঃবিশ্বের প্রচার মাধ্যম তা ফলাও করে প্রচার করে।

ফলে সামরিক একনায়ক হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ খুবই অসন্তুষ্ট এবং রাগান্বিত হন। আওয়ামী লীগের কর্মীদের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকায় এরশাদ মনে করেন (ভুল বুঝেন) যে, শেখ হাসিনা তলে তলে কর্মীদের তার (এরশাদ) বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। তিনি (এরশাদ) এই বলে মন্তব্য করেন যে, আমার খাবে আমার পড়বে, আবার আমার সাথে গাদ্দারি। শেখ হাসিনা গাদ্দারি করবে, আমার সাথে বেঈমানি করবে নাফরমানি করবে। আমিই (এরশাদ) শেখ হাসিনাকে বিরোধী দলীয় নেত্রী বানিয়ে মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি; মন্ত্রীর চাইতে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি। দেশ চালনা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই ভাগাভাগি করেছি। আর তলে তলে আমার (এরশাদ) সাথে গাদ্দারি নাফরমানি। আমি (এরশাদ) আর শেখ হাসিনাকে কোনো ভাগ দেবো না, বিরোধী দলের নেত্রীও রাখব না। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসায়ী এস, আই চৌধুরী এবং ডিজিএফআই মাহামুদুল হাসানের মাধ্যমে এরশাদকে আন্দোলনে তার (শেখ হাসিনার) অনাগ্রহ, অনিচ্ছা এবং আন্দোলনের নামে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পিছন থেকে ছুড়ি মেরে আন্দোলনকে ভন্ডুল করে দেয়ার চেষ্টার বিষয়টা অনেক বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এরশাদ নাছোড়বান্দা। তার এক কথা, আন্দোলনের নামে পিছন থেকে

আন্দোলনকে ছুড়ি মারতে হবে না। আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমাকে (এরশাদকে) প্রকাশ্যে সরাসরি সমর্থন দিতে হবে। নইলে আমি (এরশাদ পার্লামেন্টও রাখব না, শেখ হাসিনাকেও বিরোধী দলীয় নেত্রী রাখব না। বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকতে হলে এবং মন্ত্রীর মর্যাদাসহ অন্যান্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে তাকে (এরশাদ) কোনো প্রকার রাখডাক না করে ঢালাওভাবে সমর্থন করতে হবে।

শেখ হাসিনা কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে সরাসরি ঢালাওভাবে জেনারেল এরশাদকে সমর্থন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে অবশেষে এরশাদ ১৯৮৮ সালে মাত্র দুই বছর আগে গড়া তার (এরশাদের) নীল-নকশার পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয় এবং নতুন করে দ্বিতীয়বার তার (এরশাদ) নীল-নকশার পার্লামেন্ট নির্বাচন দিয়ে জাসদের আ, স, ম, রব (বর্তমান শেখ হাসিনার মন্ত্রী)'কে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা বানান।

এরশাদ পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

জনতা স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয় এবং বেগম জিয়া ভেতরে ভেতরে জনতার মাঝে আপোষহীন নেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। অবস্থা বেগতিক দেখে শেখ হাসিনার বেগম খালেদা জিয়ার আন্দোলনের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। আগে থেকেই আওয়ামী লীগের মাঠ কর্মীরা এরশাদ হঠাও আন্দোলনে তাদের বলিষ্ট ভূমিকা বজায় রেখেছে। এখন শেখ হাসিনা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে আসায় আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং দেশনেত্রী খালেদা জিয়া দুই নেত্রীর আন্দোলন প্রসঙ্গে বৈঠক হলো। আন্দোলন তুঙ্গে উঠল। দুর্বার গণআন্দোলন চলতে থাকল। স্বৈরাচারী সামরিক একনায়ক জেনারেল এরশাদ কার্ফ্যু জারি করল। সেনাবাহিনীকে জনগণের বিপক্ষে রাস্তায় নামালো। কিন্তু জনগণকে দমানো গেল না। জনগণ ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য গড়ে জেনারেল এরশাদের কার্ফ্যু ভাঙল। সেনাবাহিনার সাথে সংঘর্ষ শুরু করল। সারাদেশে স্ফুলিঙ্গের মতো আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্র যুবক আর জনতার আন্দোলনের মুখে বিশ্ব বেহায়া স্বৈরাচারী এরশাদের সকল কুট-কৌশল আর শক্তি পরাস্ত হতে থাকল।

জেনারেল এরশাদ ছাত্রনেতাদের ক্রয় করার জন্য শত কোটি টাকা খরচ করল এবং জেলখানা থেকে দাগী অপরাধীদের ছাড়িয়ে এনে কোটি কোটি টাকা আর অস্ত্র দিয়ে আন্দোলন দমানোর ব্যবস্থা করল। এই দাগী অপরাধীরাই ১৯৯০ সালে ২৭শে নভেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির পূর্ব-দক্ষিণ কোণার দূর থেকে গুলি করে ডাঃ মিলনকে হত্যা করল। ডাঃ মিলন নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-জনতার

আন্দোলন দাবানলে রূপ নিল। আন্দোলন নতুন মোড় নিল। ঠিক যেমন ১৯৬৯—এ আসাদ হত্যার পর হয়েছিল। অনির্দিষ্টকালের হরতাল, অনির্দিষ্টকালের কার্ফ্যুতে দেশের সমস্ত কিছু অচল। চলছিল শুধু পিকেটিং—মিছিল—টিয়ার গ্যাস আর গুলি।

এরশাদ পতনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা

সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নূরুদ্দিন খান (বর্তমানে শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী)'কে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারদের একটি গোপন বৈঠক করতে বাধ্য করল এবং সেই বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদকে আর সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত হয়। সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরুদ্দিন খানকে বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিলে তিনি (সেনাপ্রধান নূরুদ্দিন খান) এই দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে নবম ডিভিশনের (সাভার ক্যান্টনমেন্টের) জিওসি মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম (বর্তমানে আওয়ামী এমপি, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান) বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নেন এবং বৈঠক থেকে সোজা ঢাকা সেনাভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারদের বৈঠকে তাকে (এরশাদকে) আর সমর্থন না করার সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

তখন স্বৈরাচারী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং তারপরেই পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ পদত্যাগ করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ উপ-রাষ্ট্রপতি হন। তারপর রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদের কাছে পদত্যাগ করলে উপ-রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন এবং তার নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন দেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম দেশের সবকয়টি রাজনৈতিক দল স্বাধীন, মুক্ত এবং স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ—এর নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া দ্রুত এবং জোরদারভাবে এগিয়ে চলছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে। দেশের জনগণও এই প্রথম মুক্ত স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেয়ার দৃঢ় মনোভাব নিয়ে আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ ভোট দেয়ার স্বতঃস্ফুর্ত সিদ্ধান্ত নেয়। সারাদেশে চলছে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারাভিযান। পোষ্টার আর দেয়াল লিখনে

ভরে গেছে সমস্ত জায়গা। দিবারাত্রি চলছে মিছিল-মিটিং। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি মূলতঃ এই দুটি দলের মধ্যে তীব্র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এই দুটি দলের কোথায় কে জেতে কে হারে বলা কঠিন। এরই মধ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বললেন বিএনপি দশটির বেশি সিট পাবে না। অর্থাৎ বিএনপি তিনশ (৩০০) আসনের মধ্যে দশটি (১০) আসনে বিজয়ী হবে এবং দুইশত নব্বইটি (২৯০) আসনে পরাজিত হবে বলে শেখ হাসিনা বললেন।

স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র নির্বাচনী আলোচনা আর প্রচারণা। এক কথায় নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে।

আজ ১০ই ফেব্রুয়ারি। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের একটি কক্ষে রুদ্ধদার বৈঠক বসল। সামনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচন। এই নির্বাচন উপলক্ষেই আজকের বৈঠক। এই বৈঠকের আলোচনায় মোটর সাইকেল আরোহী যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হবে এবং জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঢাকার দুটি আসনেই পরাজিত হবেন।

বৈঠকে উপস্থিত রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে শেখ হাসিনার পিএস মোক্তাদির চৌধুরী) ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, মিয়া আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না মানে কী? আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতায় গিয়েই আছে। ঐ যে পাশের ঘরে বসে আছে হোম সেক্রেটারি, সংস্থাপন সচিব, পররাষ্ট্র সচিব। অন্য পাশের ঘরে বসে আছে পুলিশের আইজি। একটু আগে এসেছিল সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নূরুদ্দিন খান। তারপরও বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবে না।

মোটর সাইকেল আরোহী বলে সেক্রেটারিরা (সচিবগণ) যতই বসে থাকুক, পুলিশ প্রধান, সেনাপ্রধান যতই সালাম দিয়ে যাক ২৭শে ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে জিতে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, তুমি এখনই বের হয়ে যাও। আর আসবে না।

বের হয়ে যেতে যেতে মোটর সাইকেল আরোহী বলে, নেত্রী, আপনি বের করে দিলে আমি বেরিয়ে যেতে বাধ্য। তবে যা বললাম কদিন পরেই তা আপনিও বুঝবেন।

১৯৯১—এর ২৭শে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নয়, উপ-মহাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নর-নারী নির্বিশেষে জনগণ হাসতে হাসতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করল। ভোট গণনায়

দেখা গেল আওয়ামী লীগ পরাজিত হলো। ঢাকার দুই আসনেই জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা বিপুল ভোটে ব্যক্তিগতভাবে পরাজিত হলেন। বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বিএনপি নির্বাচনে বিজয়ী হলেন। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ভোটে সুক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। আর সুক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমেই তাকে পরাজিত করা হয়েছে। আমি এই ফলাফল মানি না এবং বেগম জিয়া সরকার গঠন করলে আমি এক মিনিটও খালেদা জিয়াকে সুস্থ থাকতে দেবো না।

পদত্যাগ নাটক

হঠাৎ জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করলেন তিনি (শেখ হাসিনা) আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট সকল মহলে এই পদত্যাগের ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করল। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা তো হতবাক! হতবাক কেন্দ্রীয় অফিস নির্বাহীরা। বল নেই, কওয়া নেই, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন তিনি পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করলেন কার কাছে? কোথায় তার (শেখ হাসিনার) পদত্যাগ পত্র? দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মিটিং—এ ও তিনি পদত্যাগ করলেন না। তাহলে তিনি পদত্যাগ করলেন কোথায় এবং কার কাছে? তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণাই বা করলেন কীভাবে? সভানেত্রী শেখ হাসিনার এই পদত্যাগের বিষয় নিয়ে দলের ভেতরে ও বাইরে চলছে জল্পনা-কল্পনা। কেউ বলছেন, না তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করেননি। কেউ বলছেন, না তিনি (শেখ হাসিনা) স্বয়ং পদত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার পদত্যাগ প্রত্যাহার করার দাবিতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের ব্যাপক মিছিল-মিটিং এবং আমরণ অনশন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনার এই নির্দেশে যুবলীগ ছাত্রলীগ কর্মীরা তেমন সাড়া না দিলে এবং পত্র-পত্রিকা পদত্যাগ নাটক নিয়ে হইচই শুরু করলে, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের সাধারণ সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরীকে (বর্তমানে শেখ হাসিনর মন্ত্রীসভার বন ও পরিবেশ মন্ত্রী) সভানেত্রীর পদত্যাগ পত্র ছিঁড়ে ফেলেছেন বলে ঘোষণা দেয়ার জন্য যারপরনাই অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সাজেদা চৌধুরী সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার (সাজেদা চৌধুরী) কাছে পদত্যাগপত্র দিলে তিনি তা ছিঁড়ে ফেলেছেন বলে ঘোষণা দেন এবং পদত্যাগ নাটকের অবসান ঘটান।

মোটর সাইকেল আরোহী পুনরায় ফিরে এলে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তার (শেখ হাসিনার) ব্যক্তিগত পরামর্শকের দায়িত্ব ও মর্যাদা পুনরায় ফিরিয়ে দেন। মোটর সাইকেল আরোহী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন সম্পর্কে এবং নতুন সরকার সম্পর্কে আর কোনো কঠোর উক্তি না করে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়।

টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহাম্মেদের স্থলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাজী মকবুল হোসেন (বর্তমানে আওয়ামী লীগের ধানমণ্ডি মোহাম্মদপুর থানার এমপি এবং মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি)'কে তিরিশ (৩০) লক্ষ টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করেন। অন্যদিকে এরশাদ এবং তার দল জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হন। বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাজী মকবুলকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে রাখলে তার (শেখ হাসিনার) এবং তার দল আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে; ঐতিহ্য নষ্ট হবে ইত্যাদি বুঝিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী করার পরামর্শ দিলে এক পর্যায়ে তিনি (শেখ হাসিনা) রাজি হন এবং বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমির যুদ্ধ অপরাধী '৭১—এর ঘাতক অধ্যাপক গোলাম আযমের সঙ্গে দেখা করে দোয়া নিয়ে আসার জন্য বলেন।

এদিকে হাজী মকবুল হোসেনকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার জন্য বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিলেও হাজী মকবুল প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে গড়িমসি শুরু করে। এক পর্যায়ে হাজী মকবুল হোসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে দেয়া তার তিরিশ লক্ষ টাকা ফেরত না পেলে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে লোক দিয়ে হাজী কমকুল হোসেনকে ডেকে (প্রায় ধরে এনে) প্রথমে ধমকে জিজ্ঞেস করেন, তার (মকবুল) মতো লোকের পক্ষে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হওয়া সাজে কিনা? তারপর বলেন, আমি (শেখ হাসিনা আপনার মতো লোককে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে বিরল সম্মানের ও মর্যাদার অধিকারী করেছি। এটা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তাছাড়া নির্বাচনে

তো জিতবেনই না। রাষ্ট্রপতি তো হতেই পারবেন না। এখন সম্মানের সাথে চুপচাপ বসে পড়েন।

হাজী মকবুল আমতা আমতা করতে থাকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, আপনি যা করেছেন, যা দিয়েছেন ভবিষ্যতে তা মনে রাখব এবং পুষিয়ে দিব। এই নিয়ে আর উচ্চবাচ্চ্য করে ভবিষ্যত খোয়াবেন না। নিঃশব্দে পদত্যাগ করে আমার প্রতি আনুগত্য দেখান। অতঃপর আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী মকবুল হোসেন ভবিষ্যতের আশায় প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

জাহানারা ইমাম ও শেখ হাসিনা

বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেত্রী। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মাঝে সহযোগিতা-সম্প্রীতি দূরের কথা বরং বৈরিতা এবং হিংসা আগের চেয়ে আরো তীব্র হলো।

এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী তাদের নেপথ্যের মূল নেতা যুদ্ধ অপরাধী ঘাতক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীর আমির (প্রধান) বানায়। এর প্রতিবাদে এবং যুদ্ধ অপরাধী ঘাতক গোলাম আযমসহ সকল যুদ্ধ অপরাধীর বিচারের দাবিতে ১৯৯২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তাবায়ন ও '৭১–এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি নামে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন এবং আন্দোলন শুরু করেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই নতুন সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচীতে জনগণ ব্যাপক সাড়া দিলো। নতুন প্রজন্ম শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্ব ও কর্মসূচীতে দারুণ উৎসাহ ও আস্থা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি (শেখ হাসিনা) কেবলই বলতে থাকেন জাহানারা ইমাম নতুন দোকান খুলেছে। নতুন ব্যবসা ধরেছে, নেত্রী হতে চায়, জননেত্রী হতে চায়। ব্যবসার জায়গা পায় না, মুক্তিযুদ্ধের নাম নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে।

মোটর সাইকেল আরোহী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলে, নেত্রী একি বলেছেন আপনি? সমগ্র জাতি জানে জাহানারা ইমাম শহীদ জননী। '৭১–এর মুক্তিযুদ্ধে তাঁর (জাহানারা ইমাম) ছেলে রুমি শহীদ হয়েছে। তিনি শহীদ জননী। আর আপনি একি বলছেন?

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা উত্তেজিত হয়ে বলেন, রাখ তোমার শহীদ জননী! ও কিসের শহীদ জননী! ওর ছেলে রুমি লুটপাট করতে গিয়ে নিজেদের গুলিতেই মারা গেছে। ওর স্বামী ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় আর্মিদের সাপ্লাই করত।

মোটর সাইকেল আরোহী বলে, একি বলছেন নেত্রী। এসব কথা জনসমক্ষে বললে হিতে বিপরীত হবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, এই জন্যই তো দম বন্ধ করে চুপ করে আছি এবং তোমাদের বলে রাখছি, তোমরা এগুলো বাইরে বলবে। ওরা (জাহানারা ইমাম) ধানমণ্ডি বত্রিশের রাস্তায় ঢুকতেই ডান দিকের কোণায় প্রথম ২য় তলা বড়িতে থাকত। আমাদের বাড়ির (ধানমণ্ডি বত্রিশের বঙ্গবন্ধু ভবনের) পূর্ব দিকের প্রথম বাড়িটায় থাকত। জাহানারা ইমামদেরও পাকিস্তানি আর্মিরা পাহারা দিয়ে রাখত। জাহানারা ইমামের জামাই (স্বামী) পাকিস্তানি আর্মিদের সাপ্লাই করত। ঐ সময় প্রচুর টাকা কামিয়েছে এরা। আর এখন এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তাবায়ন করতে। আসলে এ (জাহানারা ইমাম) এসেছে আমার নেতৃত্ব দখল করতে। আমি নির্বাচনে হেরেছি এই সুযোগে তলে তলে খালেদা জিয়ার সাথে লাইন করে জননেত্রী হওয়ার পরিকল্পনায় আছে জাহানারা ইমাম। আর তাই গোলাম আযমের বিচার, যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার, মুক্তযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি নানা কথার আড়ালে নেত্রী হওয়ার খায়েশে আছে। তোমরা এর থেকে সাবধান থাকবে এবং আমাদের সকল কর্মীদের সাবধান রাখবে। কেউ যেন জাহানারা ইমামের খপ্পরে না পড়ে।

মোটর সাইকেল আরোহীর প্রশ্ন, নেত্রী (শেখ হাসিনা) আপনি কী জাহানারা ইমামের ঘাতক, দালাল নির্মূল কমিটির কর্মসূচীতে যাবেন না?

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দেন, সে আমি যাই বা না যাই তোমরা যাবে না। আর আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীকে যেতে দেবে না। বুঝ না, আমার তো ইচ্ছে না থাকলেও অনেক জায়গায় যেতে হয়। জাহানারা ইমামের মুক্তিযুদ্ধের নামে দেয়া কর্মসূচীতে হয়ত আমি (শেখ হাসিনা) কৌশলগত কারণে যাব। কিন্তু তোমরা যাবে না।

গোলাম আযম ও শেখ হাসিনা বৈঠক

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও '৭১–এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়িকা হিসেবে ঘাতক গোলাম আযমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গণআদালত গঠন করেন।

১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে জননী জাহানারা ইমামের সভাপতিত্বে গণআদালত ঘাতক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে ১০টি অভিযোগে

ফাঁসির রায় দেয়। গণআদালতের দেয়া গোলাম আযমের ফাঁসির এই রায় কার্যকরী করার জন্য শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরকারের কাছে আহ্বান জানালে এবং গণআদালতে এই রায় কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচী দিলে যুদ্ধাপরাধী ঘাতক গোলাম আযম শেখ হেলাল উদ্দিন (শেখ হেলাল উদ্দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র আপন ভাই শেখ নাসেরের বড় ছেলে শেখ হাসিনার আপন চাচাতো ভাই। বর্মতানে বাগেরহাটের মোল্লার হাট ও ফকিরের হাত নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের এমপি) এর ইন্দিরা রোডের বাসায় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে গোপন বৈঠক বসে। এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় ঘাতক গোলাম আযম ও তার দল জামায়াতে ইসলামী (জামায়াত) আর বিএনপি'র লেজুরবৃত্তি না করে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে সর্বোচ্চভাবে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাথে মিলে খালেদা জিয়া ও বিএনপি সরকার পতনের আন্দোলন করবে। বিনিময়ে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধী ঘাতক গোলাম আযমের ফাঁসি কার্যকর করার দাবিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণআন্দলন এবং গণআদালত নস্যাৎ ও বানচাল করার দায়িত্ব নেন। সেই থেকে ঘাতক গোলাম আযম আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মাঝে গড়ে ওঠে গোপন নিবিড় ঐক্য ও সম্পর্ক।

১৯৯২–এর হিন্দু–মুসলিম রায়ট

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সার্কের চেয়ারম্যান। সার্কভুক্ত সাতটি রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায়। সাত জাতির শীর্ষ সম্মেলনের দিনক্ষণ স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। সার্কের চেয়ারপার্সন হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে কোনো কোনো রাষ্ট্রের সরকার প্রধানগণ আসতেও শুরু করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এখনো ঢাকায় পৌঁছাননি। এরই মধ্যে ভারতে বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা হিন্দু–মুসলিম রায়ট শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জরুরীভিত্তিতে মোটর সাইকেল আরোহীকে ডাকলেন। মোটর সাইকেল আরোহী ২৯নং মিন্টু রোডে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বাসায় উপস্থিত হলে বাবুর্চি বিমল দৌঁড়ে এসে খবর দেয় যে, আম্মা (শেখ হাসিনা) আপনাকে এখনই ধানমণ্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনে যেতে বলেছেন।

মোটর সাইকেল আরোহী বত্রিশে পৌঁছলে সঙ্গে সঙ্গে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরি রুমে ডেকে বলেন, সারা দেশে হিন্দু-মুসলিম রায়ট (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) লাগিয়ে দাও।

মোটর সাইকেল আরোহী বলে, এটা ঠিক হবে না।

নেত্রী বলেন, ঠিক-বেঠিক তোমার ভাবতে হবে না, রায়ট লাগাতে বলেছি, তুমি লাগাও।

মোটর সাইকেল আরোহী বলে, আপনি এটা বলেন কি? আমি আরো রাত-দিন পরিশ্রম করে পাড়ায়-মহল্লায় যুবকদের সতর্ক করে রেখেছি যাতে করে হিন্দুদের উপর কোনো প্রকার আক্রমণ না হয়। আর আপনি বলছেন রায়ট লাগিয়ে দিতে!

নেত্রী বলেন, হ্যাঁ, আমি বলছি, তুমি রায়ট লাগাও।

মোটর সাইকেল আরোহী বলে, না নেত্রী, এটা নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

নেত্রী রাগান্বিত হয়ে বলেন, রাখ তোমার নীতি-ফিতি। আমি যা বলছি তাই করো। আমি তোমার নেত্রী না তুমি আমার নেতা? আমাকে যদি নেত্রী মানো তাহলে আমি যা বলবো তাই করতে হবে।

মেটির সাইকেল আরোহী বলে, আপনিই তো আমাদের নেত্রী, আপনি যা বলবেন তাই তো শিরোধার্য। তবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করলে হিন্দুরা আর এদেশে থাকবে না। সবাই চলে যাবে। আর এই হিন্দুরা তো আমাদেরই লোক। আমাদেরই রিজার্ভ ভোটার।

নেত্রী বলেন, রাখ, যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নেই। তুমি রায়ট লাগাও।

মোটর সাইকেল আরোহী বলে, হিন্দুরা ভারতে চলে গেলে ভারত থেকে যে মুসলমান আসবে সে মুসলমানের সবাই হবে ধানের শীষ, মানে বিএনপি। এটা ভেবে দেখেছেন নেত্রী?

নেত্রী বলেন, আরে বোকা সার্ক সম্মেলন পন্ড করতে হবে না! কয়েক দিন পরেই সার্ক সম্মেলন। খালেদা জিয়া সার্ক সম্মেলন উদ্বোধন করবে। ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার নরসীমা রাও এখনো আসে নাই। এই–ই সুযোগ, এখনই রায়ট লাগিয়ে দিলে সার্ক সম্মেলন পন্ড হয়ে যাবে। তাছাড়া জাহানারা ইমাম যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তাকেও তো সাইজ করতে হবে। জাহানারা ইমাম আমার নেতৃত্বের প্রতি হুমকি। যেভাবে সে দিনকে দিন মুক্তিযুদ্ধের ধারক-বাহক হয়ে যাচ্ছে তা ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে (জাহানারা ইমাম) আর ছাড় দেয়া যায় না, এই সুযোগ। এই সুযোগেই জাহানারা ইমামকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এক ঢিলে দুই পাখি। সার্ক সম্মেলন পন্ড, জাহানারা ইমাম সাইজ। তুমি রায়ট লাগাও। হিন্দুদের উপর হামলা কর। এদেশের সকল হিন্দুরাই এখন জাহানারা ইমামের পিছনে চলে গেছে।

ঢাকায় রায়ট বা হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা লাগানোর দায়িত্ব দেয়া হলো মোটর সাইকেল আরোহীকে এবং সিদ্ধান্ত হলো ২৯ মিন্টো রোডে বিরোধী দলের নেত্রীর

বাসার এবং ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের টেলিফোন ব্যবহার না করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার চাচাতো চাচা বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের মহাসচিব শেখ হাফিজুর রহমানের বাসার টেলিফোন থেকে ঢাকার বাইরের জেলাগুলোকে হিন্দু–মুসলমান রায়ট লাগানোর নির্দেশ দেয়া হবে। খালেদা জিয়া সরকার যাতে বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা কর্তৃক রায়ট লাগানোর পরিকল্পনা টের না পায় সেই জন্য এই সতর্কতা।

বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত গতিতে হিন্দু–মুসলমান রায়ট লাগানোর জন্য সারা ঢাকা শহরের সকল গুন্ডা-বদমাইশ এবং সন্ত্রাসীর হাতে নগদ পাঁচ (৫) লক্ষ টাকা তুলে দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথমেই যাওয়া হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূর্ব পাশে অবস্থিত শিববাড়ি মন্দিরে। সেখানে দেখা গেল লুটেরা আর সুযোগ সন্ধানীদের জটলা। এই জটলাকারী লুটেরা সুযোগ সন্ধানীদের হাতে সঙ্গোপনে একাধিক একশত (১০০) টাকার কড়কড়ে নোট গুঁজে দিয়েই বলা হলো, ভারতে মুসলমানদের খুন করা হচ্ছে, মুসলমান নারীদের ইজ্জত আর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়া হচ্ছে। আর আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখছি, শুনছি। যান শুরু করেন, নেন, লুট করে নেন। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সুযোগ সন্ধানী লুটেরা হই হই করে মহা উৎসবে শিববাড়ি মন্দিরে লুটপাট শুরু করে দিলো। সেখান থেকে চলে আসা হলো ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। এখানেও উৎসুক সুযোগ সন্ধানী লুটেরার জটলা। এখানেও নগদ টাকা আর একই কায়দায় বক্তৃতা এবং ঢাকেশ্বরী মন্দির লুট। এরপর এলো রামকৃষ্ণ মিশন। নগদ অর্থ আর বক্তৃতায় কাজ হলো। রামকৃষ্ণ মিশনে লুটপাট শুরু হলো। তারপর যাওয়া হলো পুরান ঢাকার তাতিবাজার, শাখারিপট্টি, বাংলাবাজার, মালাকাটোলা, মিলব্যারাক, গুশাইবাড়ি, নারিন্দা, টিকাটুলী, ইসলামপুর ইত্যাদি জায়গায়। কিন্তু না, এটা পুরোনো ঢাকা, এখানে সবাই পরিচিত। এখানে বক্তৃতা করা যাবে না। এখানে শুধু টাকার উপর দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন মস্তান, সন্ত্রাসী ও নেশাখোর গ্রুপকে প্রচুর টাকা দেয়া হলো। টাকায় কথা বলল। পুরাতন ঢাকার হিন্দুদের মোকাম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাড়িঘরে লুটপাট আরম্ভ হলো।

ঘন্টা তিন-চারেক পরে ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সারা শহরে হিন্দু–মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা রায়ট লাগিয়ে দেয়ার সফল সংবাদ দিলে তিনি বেজায় খুশিতে আপ্লুত হয়ে বলে ওঠেন, এই তো কাজের ছেলে। তুমি না হলে কি হয়? তাই তো আমি তোমাকে খুঁজি। সামনের নির্বাচনে তোমাকে আমি মোসেদপুর থেকে (গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর-কাশিয়ানি আসন) এমপি বানাব।

সারা দেশে হিন্দু–মুসলমান রায়ট শুরু হলো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও ঢাকা এলেন না। সার্ক সম্মেলন পন্ড হলো।

১০ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল, বৃহস্পতিবার, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেত্রী শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ডাকে গণআদালত কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবিতে মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে হিন্দু সম্প্রদায় যোগদান করল না।

মাত্র কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া হিন্দু–মুসলমান রায়টের কারণে যুদ্ধাপরাধী ঘাতক গোলাম আযমের ফাঁসির দাবিতে মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে হিন্দু সম্প্রদায় যোগদান করবে না, এটা প্রায় নিশ্চিত ছিল। আর সেই কারণেই ঘাতক দালাল নির্মূল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটির নেত্রী শহীদ জননী জাহানারা ইমাম আগে থেকেই আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করে বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন নিয়ে ১০ই ডিসেম্বরের মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে যোগদান করার আহ্বান জানান। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শহীদ জননীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারিনি।

তাছাড়া হিন্দু–মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি আমাকে মর্মে মর্মে আঘাত করছিল। এ জন্যই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে না জানিয়ে আমার একমাত্র শিশু কন্যা স্বর্ণলতা ও প্রিয়তমা স্ত্রী ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করি। মানব-বন্ধন কর্মসূচীর পরের দিন ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ শুক্রবার দৈনিক ভোরের কাগজ ও দৈনিক আজকের কাগজ–এর প্রথম পাতায় বড় করে আমাদের (আমি, আমার কন্যা এবং আমার স্ত্রীর) ছবি ছেপে লিড নিউজ করে।

ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজের এই ছবি দেখে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভীষণ রেগে যান এবং টেলিফেনের মাধ্যমে আমাকে জরুরী তলব করেন।

সকাল দশটা নাগাদ ২৯ মিন্টো রোড–এ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বাসভবনে পৌঁছে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতালার বেলকনিতে উঠে দেখি বঙ্গবন্ধু কন্যা গম্ভীর হয়ে বেতের চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে দেখেই ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজ পত্রিকা দু'টি আমার দিকে ছুঁড়ে মেরে উত্তেজিত হয়ে বললেন, এই তোমাদের বিশ্বাস! মুখে এক কথা আর কাজে আর এক।

পত্রিকা দু'টি হাতে নিলাম এবং এই প্রথম সপরিবারে পত্রিকায় নিজেদের ছবি দেখে বুঝে ফেললাম ঘটনা অনেক খারাপ। আজ কপালে অনেক খারাবি আছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলতে লাগলেন, নেতৃত্বের প্রতি এই তোমাদের আস্থা, এই বিশ্বাস, এই আনুগত্য। যেখানে আমি নিজে জাহানারা ইমামের

কর্মসূচীতে তোমাদের অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছি এবং অন্য কর্মীরা যাতে অংশগ্রহণ করতে না পারে তার দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছি, সেখানে তুমি নিজেই কোন আক্কেলে বউ-বাচ্চা নিয়ে হাজির হলে? একদিকে থাক। জাহানারা পছন্দ হয় জাহানারা ইমামকে নিয়েই থাক। আমার দিকে আর এসো না।

আমি চুপ করে ভাবছি এখন কি বলা যায়, মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ধীরে ধীরে বললাম, নেত্রী আমি কিছু বলতে চাই।

তুমি আবার কী বলবা, তোমার আবার কী বলার আছে? বলো।

নেত্রী, আমরা তো আসলে মেয়ের (স্বর্ণলতার) জুতা কেনার জন্য এ্যালিফেন্ট রোড যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য একটু আগে ভাগেই বেরিয়েছিলাম এবং প্রেসক্লাব এসে অন্তত তিনশ কর্মীকে কানে কানে জাহানারা ইমামের এই কর্মসূচীতে যোগ না দেয়ার আপনার নির্দেশ জানিয়ে বিদায় করেছি। কিন্তু ফটো সাংবাদিকদের খপ্পর থেকে বাঁচতে পারলাম না। তারা নাছোড়বান্দা, ফটো না তুলে ছাড়লই না। আসলে এটা মানব-বন্ধন কর্মসূচীর ফটো না। কৃত্রিমভাবে তোলা এই ছবি। মাত্র কয়েক দিন আগে রায়ট হয়ে গেল। মৌলবাদীরাও সক্রিয়, দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি আমি বউ-বাচ্চা নিয়ে জাহানারা ইমামের মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে যাব? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমরা শুধু আপনার নির্দেশ পালন করার জন্যই এই ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিয়েছি।

তোমরা তো এই রকমই কাজ করবা, হিতে বিপরীত করবা, তোমাদের নিয়ে যদি একটুও নিশ্চিন্ত থাকা যায়! বুঝ এইবার ঠেলা, সবাই পত্রিকার ছবিতে দেখবে শেখ হাসিনার নিজস্ব লোকেই জাহানারা ইমানের কর্মসূচীতে। এখন আর কাকে নিষেধ করবা না যাওয়ার জন্য। তোমাদের নিয়ে আমার যত জ্বালা।

ফেরি আটকিয়ে ফেলে রাখা

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন ২৯ মিন্টো রোডে দুপুরের খাওয়া খেতে খেতে বললেন, বেশ কিছুদিন হলো টুঙ্গিপাড়া যাই না। চলো আগামীকাল টুঙ্গিপাড়ায় যাই। আইডব্লুউটিএ (অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন)'কে বিশেষ (স্পেশাল) ফেরি রাখার নির্দেশ দিয়ে দাও।

নেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলো কোন পথে যাওয়া হবে? আরিচা দিয়ে না মাওয়া দিয়ে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, আরিচা দিয়ে অনেক ঘুরা হয়, অনেক দেরিও হয়। আর মাওয়া দিয়ে পথ কম। সময়ও কম লাগে। মাওয়া দিয়েই ভালো। মাওয়ার তিন ঘাটে (অর্থাৎ ধলেশ্বর নদীর দুই ঘাটে দুইটি এবং পদ্মা নদীর ঘাটে একটি) তিনটি স্পেশাল

(বিশেষ) ফেরি রাখার নির্দেশ আইডব্লিউটিএ–কে দিয়ে দাও। স্পেশাল মানে হলো ভোর থেকে যতক্ষণ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ফেরি পার না হবেন ততক্ষণ ফেরিওয়ালা জাতীয় পতাকা লাগিয়ে ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই স্পেশাল হয়ে থাকা ফেরিগুলোতে কোনো যানবাহন এবং মানুষ পার করা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা পার না হবেন। ফলে প্রচন্ড যানজট এবং নদী পারাপারের মানুষজট হবে। ঘন্টার পর ঘন্টা এমনকি সারাদিন পর্যন্ত মানুষ এবং যানবাহন ফেরিতে নদী পারাপারের জন্য ঘটে বসে থাকবে। জনসাধারণের এই সীমাহীন দূর্ভোগের কথা ভেবেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো নেত্রী, মাওয়া রোডে তিনটি ফেরি, বিশেষ করে ধলেশ্বরী নদীর দুই ঘাটে দুটি ফেরি স্পেশাল করে রেখে দিলে এই রাস্তায় প্রচন্ড যানজট হবে। মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ হবে। তার চেয়ে আরিচা দিয়ে একটি ফেরি পার হতে হয়, আমরা আরিচা দিয়ে যাই।

উত্তরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, যানজট হবে দুর্ভোগ হবে তাই বলে কি আমি পথ চলা ছেড়ে দিব? আমি মাওয়া দিয়েই যাব। তুমি আইডব্লিউটিএ–কে তিনটি ফেরি স্পেশাল করার নির্দেশ দাও। যেই কথা সেই কাজ। টেলিফোনে আইডব্লিউটিএ–কে মাওয়া ঘাটে তিনটি ফেরি স্পেশাল করার নির্দেশ দেয়া হলো। রাতে মিন্টো রোড থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বললাম, নেত্রী, আমার বাসা থেকে বুড়িগঙ্গা (মৈত্রী সেতু) ব্রিজ অর্থাৎ মাওয়া রোড চার-পাঁচ মিনিটের রাস্তা। আমি মিন্টো রোডের উল্টো রাস্তায় না এসে বুড়িগঙ্গা ব্রিজ থেকে আপনার সাথে একত্রিত হতে চাই।

নেত্রী বললেন, না উল্টো আসবে কেন, তুমি বুড়িগঙ্গা ব্রিজ থেকেই একত্রিত হয়ো। আর সঙ্গে ময়নাকে (ময়না মানে আমার স্ত্রী) নিয়ে নিও।

ঠিক আছে নেত্রী। বলে বিদায় নিলাম।

পরদিন সকাল সাতটায় আমাদের গাড়িতে করে স্ত্রী ময়না আর কন্যা স্বর্ণলতাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুড়িগঙ্গা ব্রিজে পৌঁছে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার অপেক্ষায় রইলাম। জননেত্রী শেখ হাসিনার সকাল সাতটায় রওনা হওয়ার কথা এবং অবশ্যই সাড়ে সাতটা–আটটার মধ্যে বুড়িগঙ্গা ব্রিজে পৌঁছার কথা। সাড়ে আটটা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা ব্রিজে অপেক্ষা করে নেত্রী না আসায় ধলেশ্বর ফেরি ঘাটে অপেক্ষা করব চিন্তা করে চলে এলাম। ধলেশ্বর ফেরি ঘাটে এসে দেখি জাতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে একটি ফেরি ঘাটের পাশে বঙ্গবন্ধু কন্যার জন্য অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে পুলিশ বাহিনীর একটি দল। আর ফেরিঘাটে অলরেডি যানজট শুরু হয়ে গেছে। ঘাটের দুটি ফেরির মধ্যে একটি স্পেশাল হয়ে

আছে। অবশিষ্টটি যানবাহন পার করে কুলাতে পারছে না। বেলা দশটা বেজে গেল। অথচ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আসছেন না; তবে কি কর্মসূচীর কোনো পরিবর্তন হলো? পুলিশ বাহিনীর অফিসারের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। পুলিশ অফিসার বলল, আমরা তো বিরোধী দলীয় নেত্রী এই পথে যাবেন সেই ডিউটিতেই আছি।

এরপর আমি প্রথম ফেরি ঘাট পার হয়ে দ্বিতীয় ফেরি ঘাটে এসে দেখলাম এখানেও একটি ফেরি জাতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে স্পেশাল হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অপেক্ষা করছে। আর পারাপারের অপেক্ষায় থাকা মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেছে। ধলেশ্বর দ্বিতীয় ফেরিও বেলা বারোটা নাগাদ পার হয়ে এলাম। এবার এলাম মাওয়া ফেরি ঘাটে। এখানেও একটা সুন্দর বড় ফেরি সবুজ-লাল জাতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে ঘাটের বাইরে অপেক্ষা করছে। পুলিশের একটি বিশেষ দলও এখানে অপেক্ষা করছে।

আমার স্ত্রী ময়নাকে বললাম, একটা ফেরি এলেই আমরা পদ্মা পার হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা গিয়ে অপেক্ষা করব। কারণ বলা তো যায় না, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আরিচা দিয়ে চলে যেতে পারেন।

ময়না বলল, দূর! তা হয় না। এখানে তিনটা ফেরি অপেক্ষা করছে, জায়গায় জায়গায় পুলিশ বাহিনী অপেক্ষা করছে। নেত্রী আরিচা দিয়ে চলে গেলে অবশ্যই একটা সংবাদ (ইনফরমেশন) দিতেন। যাতে করে উনার (শেখ হাসিনার) অপেক্ষায় থাকা ফেরি এবং পুলিশ স্পেশাল ডিউটি ছেড়ে নরমাল (স্বাভাবিক) ডিউটিতে ফিরে যেত।

একটা বড় ফেরি এলে, আমি ফেরিতে গাড়ি তুললাম। পদ্মা পার হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। আধা ঘন্টাখানেক অপেক্ষায় থাকার পর দেখলাম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জাতীয় পতাকাবাহী গাড়ি ফরিদপুরের দিক থেকে আসছে। অর্থাৎ জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আরিচা দিয়ে এসেছেন। আমাদের দেখে নেত্রী হাত নাড়ালেন। আমরা তার (শেখ হাসিনার গাড়ির বহরের সাথে যোগ দিলাম। চলতে থাকলাম। গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজে বঙ্গবন্ধু কন্যাসহ সকলে এসে থামলাম। জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বললাম, মাওয়া দিয়ে না এসে আরিচা দিয়ে এলেন?

তিনি বললেন, কে জানি বলল মাওয়া রাস্তার কার্পেটিং সুন্দর না, তাই আরিচা দিয়ে এলাম।

মাওয়া রাস্তায় তিন তিনটি ফেরি অপেক্ষা করছে, পুলিশ অপেক্ষা করছে, একটা ইনফরমেশন তো পাঠাবেন! নেত্রী তার সাথে আসা ব্যক্তিদের বললেন, তোমরা ইনফরমেশন দেও নাই? উত্তরে কেউ কোনো কথা বলল না। আমি বললাম, হাজার

হাজার মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় যানজটে নদী পারাপারের অপেক্ষায় কষ্ট করছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, রাস্তায় বইসা থাকা এই তো? এ আর কি কষ্ট! তাছাড়া এদেশের মাইনষের (মানুষের) তো আর তেমন কাজকর্ম নেই। রাস্তায়ই না হয় ঘন্টার ঘন্টা পার করে দিলো, এতে কি আর এমন, তুমি এ নিয়ে বেশি চিন্তা কইরো না।

অতঃপর সন্ধ্যার দিকে শেখ হাসিনার পিত্রালয় এবং পিতার কবর টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছলাম।

শেখ হাসিনা–গোলাম আযম ২য় বৈঠক

৩০শে জানুয়ারি ১৯৯৪ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র ও কমিশনার নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফকে ঢাকার মেয়র পদে মনোনয়ন দিয়েছে।

তোড়জোড়ে নির্বাচনী প্রপাগান্ডা এগিয়ে চলছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে দলের সকল নেতাকর্মীই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের কাছে মেয়র পদে মাছ মার্কায় হানিফের জন্য ভোট চাইছে। অধিক রাত পর্যন্ত চলছে মিছিল এবং নির্বাচনী জনসভা। প্রতিটি পাড়া-মহল্লা, অলি-গলিতে চলছে মেয়র কমিশনার নির্বাচনের কাজ। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত, কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনী কাজে ভীষণ ব্যস্ত। ঢাকায় টানটান উত্তেজনা। নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। ২৫শে জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় ধানমণ্ডি ৮/এ রোডে বঙ্গবন্ধুর চাচাতো ভাই শেখ হাফিজুর রহমান টোকনের বাসায় (শেখ হাফিজুর রহমান টোকন বর্তমানে বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের মহাসচিব) '৭১–এর যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা ঘাতক গোলাম আযমের সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ঘাতক গোলাম আযম মেয়র নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীকে সমর্থন না দেয়ার আশ্বাস দিলে শেখ হাসিনাও রাজনীতিতে জামায়াতকে আক্রমণ না করার আশ্বাস দেন।

নির্বাচন বাতিলের দাবি

আজ ৩০শে জানুয়ারি ১৯৯৪। ঢাকায় প্রথমবারের মতো সরাসরি জনগণের ভোটে মেয়র নির্বাচন চলছে। সকাল আটটা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হবে। গত রাতেই জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন, আজ ৩০শে জানুয়ারি সকাল ০৬:০০ ঘটিকায় ২৯ মিন্টো রোডে

তার বাসায় হাজির হওয়ার জন্য। নির্দেশ মোতাবেক নেত্রীর বাসায় সকাল পৌনে ছ'টায় হাজির হয়েছি। বঙ্গবন্ধু কন্যা ঘুম থেকে উঠলেন, একসঙ্গে নাস্তা করলেন। তারপর সকাল পৌনে সাতটায় তার (শেখ হাসিনার লাল রংয়ের নিশান পেট্রোল জিপ গাড়িতে করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রথমে গেলেন শেরেবাংলা নগরের রাজধানী হাই স্কুলে। তারপর গেলেন ধানমণ্ডি বয়েজ হাই স্কুলে, এরপর গেলেন ধানমণ্ডি বত্রিশে তার (শেখ হাসিনার) পিতার বাড়ি বঙ্গবন্ধু ভবনে। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চা খেয়ে নিজের ভোটার স্লিপ নিয়ে চলে এলেন সিটি কলেজে ভোট দিতে। সিটি কলেজে ভোট দেয়া শেষ করে, আরো কিছু ভোটকেন্দ্র ঘুরে বেলা এগারটা নাগাদ ফিরে এলেন ২৯ মিন্টো রোডে তার সরকারি বাসভবনে। জননেত্রী শেখ হাসিনা মিন্টো রোডের বাসভবনে ফিরে আসার দশ-পনের মিনিটের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক (বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য) নওগাঁর আব্দুল জলিল। সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে আব্দুল জলিল বললেন, নেত্রী আমাদের অবস্থা ভালো না। আমরা নির্বাচনে জিততে পারব না। আমাদের লোকদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে। আপনাকে তো আগেই বলেছি আওয়ামী লীগ হলো হরতাল আর আন্দোলনের দল, নির্বাচনের দল না। আপনি খামাখা নির্বাচনে যান।

আব্দুল জলিলের কথা শেষ না হতেই এসে হাজির হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (বর্তমানে এলজিআরডি মন্ত্রী) জিল্লুর রহমান। জিল্লুর রহমানের পেছনে পেছনে এলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য (বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রী) আব্দুর রাজ্জাকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া সকল নেতৃবৃন্দেরই এক কথা, মেয়র নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হচ্ছে। আমাদের কর্মীদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে। নির্বাচন বাতিলের দাবি করা হোক। আন্দোলন করা হোক ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বললেন, নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে, আমাদের কর্মীদের বের করে দেয়া হচ্ছে, এটা কি আপনারা কেউ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখেছেন?

নেতারা কেউ কোনো উত্তর দিলেন না, কোনো কথাও কেউ বললেন না, সবাই চুপ।

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এটা আবার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখতে হয় নাকি? ওরা তো ভোট কারচুপি করবেই। এখন না করলে একটু পরে করবে। কাজেই আমাদের নির্বাচন বাতিলের দাবি করতে হবে এবং এই ইস্যু নিয়ে বিএনপি সরকার পতন আন্দোলন করতে হবে। খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল টেলিফোন সেট (যে সেট দিয়ে উপস্থিত সকলে

শুনতে পারে) দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা স্বয়ং প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ফোন করলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে না পেয়ে অন্য একজন নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচন বাতিল করার কথা বললে, নির্বাচন কমিশনার বিস্ময়ের সাথে বললেন, ম্যাডাম, নির্বাচন বাতিল তো দূরের কথা, কোনো ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করার মতোও কোনো ইনফরমেশন এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি।

জবাবে জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমার কাছে ইনফরমেশন আছে নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে। আমি বলছি – নির্বাচন বাতিল করেন।

নির্বাচন কমিশনার বললেন, ম্যাডাম আপনি কাইন্ডলি বলেন, কোন কেন্দ্রে কারচুপি হচ্ছে, আমরা অবশ্যই তার ব্যবস্থা নেব।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা 'চীফ্ ইলেকশন কমিশনারকে বলবেন আমাকে ফোন করতে' বলে ফোন রেখে দিলেন। এরপর প্রায় প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন বাতিল করার দাবি জানিয়ে ফোন করা শুরু হলো। বিকাল ০৪:০০ টা নাগাদ একবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচন বাতিলের দাবির জবাবে বললেন, ম্যাডাম আমি ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। সামান্য গোলযোগের কারণে আমি কয়েকটি ভোটকেন্দ্রের ভোগ স্থগিত করেছি।

শেখ হাসিনা পুনরায় নির্বাচন বাতিলের দাবি করলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ম্যাডাম আমি নির্বাচন কমিশনে বসে নেই। আমি সরাসরি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছি। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, যে কোনো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে আমি মোটেই পিছপা হব না।

হ্যাঁ, আপনি নির্বাচন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিন। আমি পরে আবার ফোন করব বলেই জননেত্রী শেখ হাসিনা ফোন রেখে দিলেন। এরপর প্রায় পনের বার ফোন করেও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেল না। কিন্তু রাত দশটার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফোন ধরতেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উচ্চস্বরে বললেন, কি হলো, নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা দিলেন না?

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন, ম্যাডাম আমাদের কাছে যে ফলাফল এসেছে তাতে মেয়র পদে মাছ মার্কায় মোহাম্মদ হানিফ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে। এখন আমরা কি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করব?

শেখ হাসিনা বললেন, জ্বী জ্বী কি বললেন?

হ্যাঁ ম্যাডাম, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মেয়র পদে মাছ মার্কায় মোহাম্মদ হানিফ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে এবং মোহাম্মদ হানিফের মেয়র হওয়া প্রায় নিশ্চিত। আমরা কি এই নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করব?

তাই নাকি, তাই নাকি, না না বাতিল করবেন কেন? আপনি খেয়াল রাখবেন যাতে এই ফলাফল উল্টে না যায়। আমি পরে আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করব।

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা টেবিল টেলিফোন সেট বন্ধ করে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শুনলেন তো হানিফ নাকি মেয়র হয়ে যাচ্ছে। এখন তো আমাদের নির্বাচন বাতিলের দাবি করা ঠিক হবে না, কি বলেন?

জিল্লুর রহমান বললেন, দেখেন এইটা আবার কোন চাল।

আব্দুর রাজ্জাক বললেন, নেত্রী, নির্বাচন কমিশনে আমার একজন ঘনিষ্ঠ লোক আছে। আমি তার কাছে গিয়ে সঠিক খবর নিয়ে আসি।

সভানেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাই যান। আপনারা সকলেই যান, যার যেখানে লোক আছে সেখান থেকেই সঠিক খবরটা সংগ্রহ করেন।

রাত তখন বারটা, সবাই চলে গেল। একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া আর কোনো নেতাই রাতে ফিরে এলেন না। রাত দেড়টার দিকে আব্দুর রাজ্জাক মিন্টো রোডে এসে বললেন, সভানেত্রী কোথায়, হানিফ তে মেয়র হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন দেশি-বিদেশী সমস্ত নিউজ মিডিয়াতে হানিফের মেয়র হওয়ার ফলাফল পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন হানিফ বেসরকারিভাবে ঢাকার মেয়র। সভানেত্রীকে সংবাদটা দিতে হয়।

আপনি বসেন বলে উপরে গেলাম। সভানেত্রী শেখ হাসিনা ডিস এন্টিনায় হিন্দি ফিল্ম দেখছিলেন। তাকে আব্দুর রাজ্জাকের আসার সংবাদ এবং হানিফের বেসরকারিভাবে মেয়র হওয়ার সংবাদ দিলে তিনি বলেন, হানিফের কপাল ভালো। আব্দুর রাজ্জাক দেখা করতে চায় জানালে শেখ হাসিনা বলেন, দূর! ছবিটা জমে উঠেছে এই সময় দেখাটেখা হবে না। তুমি বলে দাও আমি (শেখ হাসিনা) ঘুমিয়ে পড়েছি।

তথাস্তু নেত্রী, বলে নিচে এসে আব্দুর রাজ্জাককে বলা হলো আপনি চল যান, নেত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ আর উঠবেন না।

আব্দুর রাজ্জাক চলে গেলে এরপর ফোন এলো প্রেসিডিয়াম সদস্য (বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী) আব্দুস সামাদ আজাদ এর। সভানেত্রীকে সামাদ আজাদের ফোনের কথা বলা হলে, তিনি ঐ একই কথা বলেন, দূর! সিনেমাটা জমে উঠেছে। বলে দাও ঘুমিয়ে গেছি। এরপর থেকে যেই ফোন করুক বলে দেবে ঘুমিয়ে গেছি।

এরপর থেকে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা যে রুমে বসে ডিস এন্টিনায় হিন্দি ফিল্ম দেখছেন সেই রুম থেকেই হ্যান্ডসেট দিয়ে যেই ফোন করছে তাকেই বলে দেয়া হচ্ছে নেত্রী ঘুমাচ্ছেন। এই নিয়ে আবার জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং উপস্থিত হিন্দি ফিল্ম দর্শকদের মাঝে হাসাহাসির রোল পড়ে গেল।

শেখ হাসিনা এবং মেয়র হানিফ

পরদিন বিকালবেলা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, কিরে, এত লোক আসে যায়, এত ফুলের তোড়া, ফুলের মালা হানিফকে (সদ্য নবনির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ) দেখছি না! এখন পর্যন্ত হানিফ একটা ফোনও করল না। ব্যাপারটা কী? ঠিখ আছে তো, না ভাইগা-টাইগা গেল। এই মেয়র হওয়ার লোভেই কিন্তু হানিফ স্বৈরাচারী জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। এরশাদের কাছে চান্স না পেয়ে হানিফ মেয়র হওয়ার জন্য আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। আমি এক কোটি সাতত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে হানিফকে মেয়র করেছি। তাড়াতাড়ি খোঁজ খবর নাও। ফোন করো এবং একজন হানিফের বাড়িতে গিয়ে দেখ আসল ব্যাপার কী?

সদ্য নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফের বাসায় ফোন করে বলা হলো, জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হানিফ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবেন। জবাবে মিসেস হানিফ বললেন, তিনি অসুস্থ এখন কথা বলতে পারবেন না। সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি (শেখ হাসিনা) বললেন শিঘ্রই হানিফের বাসায় যাও। দেখ গিয়ে ঘটনা খারাপ।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মেয়র হানিফের বাড়ি ছুটে যাওয়া হলো। মেয়র হানিফ তখন দশ-বারজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। সেখানেই শোনা গেল বিকেলে লালবাগের বিএনপি'র পরাজিত কমিশনার প্রার্থী আব্দুল আজিজ গুলি করে সাতজন লোককে হত্যা করেছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা কথা বলতে চেয়েছেন বলায় মেয়র হানিফ বললেন, নেত্রীকে আমার সালাম দিও, বলো আমার শরীরটা খুব খারাপ, আমি কথা বলতে পারছি না। শুধু লালবাগের খুনের জন্য আমি ওনাদের সাথে কথা বলছি।

মেয়র হানিফের বাসা থেকে সোজা মিন্টো রোডে এসে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে লালবাগের বিএনপি কমিশনার প্রার্থী আজিজ কর্তৃক সাতজনকে খুন করার সংবাদ দিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা খুশিতে জিন্দেগি জিন্দেগি গান গাইতে থাকেন আর নাচতে থাকেন।

রুমালে গ্লিসারিন

পরদিন সকালে লালবাগে নিহত সাতজনের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে দেখতে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলতে থাকেন, আমার (শেখ হাসিনা) রুমালে একটু গ্লিসারিন মেখে দাও, ঐ যে নায়িকারা অভিনয়ের সময় গ্লিসারিন দিয়ে চোখের পানি বের করে কান্নার অভিনয় করে। আমার

রুমালে ঐ রকম গ্লিসারিন লাগিয়ে দাও, যাতে আমি লাশ দেখে রুমাল ধরতেই চোখে পানি এসে যায়।

একজন বলল গ্লিসারিনের দরকার নেই, শুধু চোখে রুমাল ধরে রাখবেন, তাতেই মনে হবে আপনি কাঁদছেন। আর আমরা ফটো সাংঘাতিক (ফটো সাংবাদিক) ভাইদের বলে দেবো ছবির নিচে আপনি কাঁদছেন ক্যাপশন লাগিয়ে দিতে।

হাসপাতালের মর্গে নিহত সাতজনের লাশ দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চোখে রুমাল ধরলে সঙ্গে সঙ্গে ফটো সাংবাদিকগণ অসংখ্য ছবি তুলল। ছবি তোলা শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল। তখনও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার চোখে রুমাল। গাড়ির চালক ড্রাইভার জালাল বলল, আপা (শেখ হাসিনা) এখন রুমাল নামান, ফটো সাংবাদিক নেই।

গাড়ির সকল আরোহী হেসে উঠল। জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক মতো দেখেছ তো, কোনো ফটো সাংবাদিক নেই তো?

না নেই।

তাহলে আমি (শেখ হাসিনা) এবার রুমাল নামাই।

আজ আমি বেশি খাব

২৯ মিন্টো রোডের বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ময়না (মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু) খাওয়া-দাওয়া বেশি করে এনেছ তো? লাশ দেখে এসেছি, লাশ। আজ আমি বেশি করে খাব।

তারপর তিনি জিন্দেগি জিন্দেগি গাইতে গাইতে নাচতে লাগলেন। সত্যি সত্যিই তিনি (শেখ হাসিনা) অস্বাভাবিক রকমের বেশি খেলেন। এমনিতেই তিনি (শেখ হাসিনা) বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নিহতদের লাশ দেখে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি খেতেন। কিন্তু আজ খেলেন অস্বাভাবিকের চাইতেও অনেক বেশি।

টাকার ভাগ দিতে হবে

টুঙ্গিপাড়ায় শেখ হাসিনার পিতা আওয়ামী লীগের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কবরে গিয়ে মেয়র মোহাম্মদ হানিফের আনুষ্ঠানিক শপথ নেয়ার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হলো। ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফকে সঙ্গে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যাবেন এবং সেখানে বেসরকারিভাবে হানিফ মেয়র হিসেবে শপথ নেবেন। নির্দিষ্ট দিনে সকালবেলা সকলেই টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মেয়র হানিফ এলেন না। টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়া হলো না। মেয়র হানিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি

বললেন, তিনি অসুস্থ। এরপর মেয়র হানিফ শেখ হাসিনার বাসা, আওয়ামী লীগ অফিস কোথাও এলেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র পদে মোহাম্মদ হানিফ শপথ নিলেন। ঢাকার মেয়রের দায়িত্বভার নিলেন। হট লাইনের রেড টেলিফোনে প্রতিদিন দুই একবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে কথা বলেন। প্রতিদিন না হলেও প্রায় প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন এবং যুক্তি পরামর্শ করে সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও আওয়ামী লীগ অফিসের ত্রিসীমানায়ও আসেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কপাল চাপড়ান আর বলতে থাকেন, নিমকহারাম, বেঈমান, ওরে আমি এক কোটি সাতত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে মেয়র করেছি। বেঈমান নিমকহারাম।

যে আসে, যাকে পান তার কাছেই তিনি (শেখ হাসিনা) এই কথা বলতে লাগলেন।

একজন বলল, ঠিক আছে হানিফ ভাই মেয়র হয়েছে, টাকা কামাবে, টাকা খাবে, খাক, আমরা তো আর ভাগ চাই না। কিন্তু দলের কাজ করবে না কেন?

জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, কেন? একা টাকা খাবে কেন? আমাদের ভাগ দিতে হবে। ওকে এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে মেয়র বানিয়েছি। তোমাদের হাত দিয়েই তো ঐ টাকা খরচ করেছি। হানিফ তো এক পয়সাও খরচ করে নাই। সব আমি খরচ করেছি। এখন হানিফ একা খাবে কেন? আমাদেরও ভাগ দিতে হবে। নইলে আমি শেখ হাসিনা একদিন না একদিন এর উসুল করে ছাড়ব।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কথা বলবেন, কত শতবার ফোন করা হয়, মেয়র হানিফ ফোন ধরে না। আসতে বলা হয়, দেখা করতে বলা হয়। হানিফ আসে না, দেখা করে না। লোক পাঠালে মেয়র হানিফ বলে, যা যা, যেই জায়গায় আছিস সেই জায়গায় যা। ক্ষমতায় যাওয়া লাগব না। যে পর্যন্ত আগাইছস ঐ বিরোধী দল পর্যন্তই থাক, আর ক্ষমতায় যাওয়া লাগব না। আমি তোগো লগে নাই।

জাহানারা ইমাম মরছে, আপদ গেছে

১৯৯৪ সালের ২৬শে জুন সন্ধ্যাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি টেলিফোন করে ২৬শে জুন, ১৯৯৪ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ দিলে, জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আনন্দে নাচতে থাকেন আর বলতে থাকেন মিষ্টি খাও, মিষ্টি। আমার একটা প্রতিদ্বন্দ্বী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। আল্লাহ বাঁচাইছে। নেত্রী হতে চেয়েছিল। আমার জায়গা দখল করতে

চেয়েছিল। জাহানারা ইমাম মরেছে আপদ গেছে। বাঁচা গেছে। আমার জায়গা দখল করতে চেয়েছিল। তোমরা জানো না, ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা এজেন্সি 'র' (ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নাম 'র') আমার পরিবর্তে জাহানারা ইমামকে নেতৃত্বে বসাতে চেয়েছিল। বেটি মরছে, মিষ্টি খাও। ফকিরকে পয়সা দেও।

এর কয়েকদিন পরে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের লাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলে, জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, চল এয়ারপোর্টে যাই, আপদের লাশটা এনে কবরে ফেলি।

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা তার লাল রংয়ের নিশান পেট্রোল জিপে করে বিমানবন্দর–এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যেতে যেতে বলতে লাগলেন, বেটি (জাহানারা ইমাম) আমারে অসম্ভব জ্বালাইছে (জ্বালিয়েছে)। ওর মরা মুখও দেখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু না যেয়ে তো উপায় নেই। পলেটিক্স–এর (রাজনীতি) ব্যবসায় ইচ্ছে না থাকলেও করতে হয়।

শেখ হাসিনার ট্রেনে গুলি

১৯৯৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিমানযোগে যশোর হয়ে খুলনা এলেন এবং বিকেলে শহীদ হাদিস পার্কের জনসভায় ভাষণ দিলেন। রাতে নেত্রীর চাচাতো ভাই শেখ নাসেরের বড় ছেলে শেখ হেলালের বাড়িতে খেলেন এবং থাকলেন। পরদিন ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল নয়টার সময় উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে ট্রেন যাত্রা শুরু করলেন। বেশ লম্বা ট্রেন। অনেক সাধারণ যাত্রী আছে ট্রেনে। সাধারণ যাত্রীরা জানে না বা বুঝতে পারছে না, শেখ হাসিনার রেলপথে সভা করতে করতে যাওয়া এই ট্রেন কবে কখন গন্তব্যে পৌঁছবে। ঠিক সকাল নয়টায় ট্রেন ছাড়ল। প্রতিটি রেল স্টেশনেই ট্রেন থামিয়ে সভা করা শুরু হলো। ট্রেন থেকে নেমে জনসভা আয়োজনের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে আবার ট্রেনে ফিরে আসতে পৌনে এক ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা সময় লাগতে লাগল। এইভাবে প্রতিটা রেল স্টেশনে গড়ে প্রায় এক ঘন্টা সময় ব্যয় হতে থাকল। দিন পেরিয়ে রাত হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা প্রায় ডজনখানেকেরও বেশি সাংবাদিক (বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনার ভাষায় সাংঘাতিক) এই ট্রেনে রয়েছে। ট্রেনের শেষের দিকে একটি ভিভিআইপি স্পেশাল কামরায় বা কম্পার্টমেন্টে (বগিতে) জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। ঐ কম্পার্টমেন্টের সামনে এবং পেছনে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নিরাপত্তায় নিয়োজিত স্পেশাল (এসবি) ব্রাঞ্চ পুলিশের ১২ জন সদস্য। তারপরের কম্পার্টমেন্টে সাংবাদিকগণ। এরপর সবগুলো সম্পার্টমেন্টে বা

বগিগুলোতে সাধারণ যাত্রী। ট্রেনের এই অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ বিলম্বে সাধারণ যাত্রী নারী-পুরুষ আর শিশুদের ত্রাহিমধুসূদন অবস্থা। ছয় ঘন্টার যাত্রা পথ চব্বিশ ঘন্টায়ও না ফুরানোর ফলে অনেক আগেই পানিসহ ট্রেনের সকল খাবার ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলে সাধারণ যাত্রীদের কষ্ট আর দুর্ভোগ সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছে।

তৃষ্ণার্ত-ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্না আর আহাজারিতে অনেক সাধারণ যাত্রীই পরিবার-পরিজন নিয়ে গন্তব্যের আগেই ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে যায়। জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সফরসঙ্গী এবং সাংবাদিকদের জন্য প্রায় প্রতিটি রেলস্টেশন থেকেই অফুরন্ত খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির (মিনারেল ওয়াটারের) পর্যাপ্ত বোতল সরবরাহ করা হতে থাকে।

সারাদিন জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রায় কুড়িটির মতো রেলস্টেশনে জনসভায় ভাষণ দেন। কোথাও কোথাও রেলস্টেশন ছাড়াই উৎসুক জনতা ট্রেন থামালে সেখানেও তিনি বক্তৃতা করেন। প্রতিটি জনসভাতেই ঢাকা থেকে আসা সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করতে থাকেন এবং শেখ হাসিনাও সংবাদিকদের নজরে রাখেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের আর নজরে রাখতে পারেননি। ওদিকে শেখ হাসিনা বারবার একই বক্তৃতা দেয়ায় সাংবাদিকদের তা মুখস্ত হয়ে যাওয়াতে অনেক সাংবাদিকই রাতের অন্ধকারে ট্রেন থেকে নেমে শেখ হাসিনার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করতে যায়নি।

রাত তখন এগারোটা সতের মিনিট। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেন ঈশ্বরদী রেলস্টেশন পৌঁছার কিছু সময় বাকি রয়েছে। এমন সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এত টাকা-পয়সা খরচ করে জামাই আদর করে ঢাকা থেকে যে সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) এনেছি তারা কি সব ঘুমাচ্ছে? জনসভায় এতো লোক হচ্ছে, আমি এতো বক্তৃতা করছি, সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) নজরে পড়ছে না তো। তোমরা একটু সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমার (শেখ হাসিনার) জনসভায় পাঠাও যাতে পত্রপত্রিকায় ভালো নিউজ হয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বেতনভুক্ত ব্যাগ বহনকারী মদন মোহন দাস (যার নামে শেখ হাসিনার লাল নিশান পেট্রোল জিপ গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন করা) বলল, ডাইকা ঘুম ভাঙ্গান লাগব না। পিস্তল দিয়ে দুই রাউন্ড গুলি কইরা দিলেই সাংঘাতিকগো ঘুম কই যাইব, সব লাফাইয়া ট্রেন থাইকা নিচে পইড়া যাইব।

আলাউদ্দিনের প্রদীপ পাওয়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে বাহাউদ্দিন নাসিমকে (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস) বললেন, দে দুই রাউন্ড গুলি করে।

আর উপস্থিত অন্যদের বললেন, তোমরা আমাকে (শেখ হাসিনাকে) হত্যার জন্য ট্রেন–এ গুলি করা হয়েছে বলে সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) মাঝে প্রচার করে

দেবে। ট্রেন ঈশ্বরদী প্লাটফর্মে ঢোকার কয়েক মিনিট আগে বাহাউদ্দিন নাসিম ট্রেনের জানালা দিয়ে সাংবাদিকদের কম্পার্টমেন্ট লক্ষ্য করে পিস্তল দিয়ে তিন (৩) রাউন্ড গুলি ছুড়ল। গুলির শব্দ শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশেরাও পাঁচ-ছয় রাউন্ড গুলি করে। এই সমস্ত গুলির আওয়াজ শুনে পাশের কম্পার্টমেন্টে থাকা সাংবাদিকরা ভয়ে ট্রেনের ভেতরে গড়াগড়ি শুরু করে এবং আমরা পরিকল্পনা মতো সাংবাদিকদের কম্পার্টমেন্টে এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ট্রেনে গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার করতে থাকি। ট্রেন ঈশ্বরদী প্লাটফর্মে থামলে , ঈশ্বরদী রেলস্টেশনের বাইরে জনসভার মঞ্চ থেকেও মাইকে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ট্রেনে গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার চালাতে থাকেন। পরের দিন ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার ট্রেনে বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি গুলি করা হয়েছে বলে জাতীয় পত্রপত্রিকায় সংবাদ বের হলে, বগুড়া সরকারি সার্কিট হাউজের ভিভিআইপি রুমে বসে জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ তার সফরসঙ্গীরা (যারা প্রকৃত ঘটনা জানে) হাসাহাসি করতে থাকে এবং হাসাহাসির এক পর্যায়ে গুলির এই ঘটনা নিয়ে হরতাল ডাকার সিদ্ধান্ত হয়।

ফুল ছিটানো

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস। ১৯৯৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বুধবার। সকাল ছয়টায় বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ২৯ মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে সকলে হাজির হলো। সকাল সাতটায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মিরপুর বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধে রওনা হলেন। আটটা চল্লিশ মিনিটে স্মৃতিসৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করলেন। তারপর গেলেন রায়ের বাজার বদ্ধভূমিতে। সেখানে পুস্পমাল্য দেয়ার পর শহীদ বুদ্ধিজীবি সন্তানদের সংগঠণ প্রজন্ম '৭১—এর উদ্দেশ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তারপর মালিবাগ রেলক্রসিংয়ের ভূঁইয়া ক্লিনিকে তার (শেখ হাসিনার) বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে নকিব আহাম্মেদ মান্নুকে (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিপিএস) দেখে জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাস ভবনে দুপুর নাগাদ ফিরে এলেন। দুপুর আড়াইটায় খাওয়ার টেবিলে একসঙ্গে খেতে খেতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আক্ষেপ করে বললেন, দেখো, আজ বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা। আমি হলাম সেই আলোচনা সভার প্রধান অতিথি। আর মাত্র কয়েক দিন পরেই আমি বিরোধী দলীয় নেত্রীর পদ থেকে (সংসদ সদস্য পদ থেকে) পদত্যাগ করব। এটাই আমার বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে শেষ প্রধান অতিথি

থাকা। তাছাড়া আমি ভাবি প্রধানমন্ত্রী। আবার আমিই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা। সামনে রয়েছে খালেদা জিয়া হঠাও আন্দোলন। এই মুহূর্তে আমার গ্ল্যামার, আমার ভাবমুর্তি বৃদ্ধ করা কত জরুরী প্রয়োজন। আজকের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে আমি যাব এরা নিশ্চয়ই আমার উপর ফুল ছিটানোর কোনো আয়োজন করে নাই। এমনিতেই এরা মানে আওয়ামী লীগ নেতারা আনকালচার্ড, তার উপর এরা হলো ব্যবসায়ী। এদের মন বলতে কিছুই নাই। না বলে দিলে এরা কিছুই করে না। তুমি কি পার বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে গেলে আমার উপর শিশু ও মেয়েদের দিয়ে ফুল ছিটাতে?

নেত্রী, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আপনার উপর ফুল ছিটানো হবে। তখন বাজে সাড়ে তিনটা। আর আধা ঘন্টা পরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা বিজয় দিবসের মঞ্চে উঠবেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে কোথায় পাব শিশু, কোথায় পাব মেয়েদের। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আবদার। অবশেষে তাড়াতাড়ি করে হাইকোর্ট মাজার থেকে ফুল কিনে নিজের স্ত্রী, শিশু-কন্যাদের দিয়েই তার ফুল ছিটানোর আবদার পূরণ করা হলো।

কুকুর পালা

বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবর রহমানের ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস। এর আরো তিন চাচাতো ভাই অর্থাৎ শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবর রহমানের আরেক ফুফাতো ভাইয়ের তিন ছেলে (১) নজিব আহম্মেদ নজিব, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীফ্ সিকিউরিটি। (২) নকিব আহম্মেদ মানু, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিপিএস। (৩) কানিজ আহম্মেদ কানিজ। (মাঝে মাঝেই পাগল হয়ে যেতো আর কানিজকে ভর্তি করা হতো বনানীতে অবস্থিত পাগলদের প্রাইভেট ক্লিনিকে) বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাংলাদেশ মিশনের চীফ প্রোটকল অফিসার। মাদারীপুরের অখ্যাত অজ-পাড়াগায়ে এদের বাড়ি। ভাঙ্গা টিনের ঘর। পূর্ব পুরুষ ধরেই এরা দরিদ্র। এদের বাবা, চাচা এবং এরা দূরদূরান্তে পরের বাড়িতে লজিং থেকে অনেক কষ্ট করে যতটুকুই হোক লেখাপড়া করেছে। ঢাকায় চালচুলা বলে কিছুই নেই। যেখানে রাত সেখানেই কাত। নিকট আত্মীয় বলতে সর্বসাকুল্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ব্যাস আর যায় কোথায়। দলবলে এরা এসেই উঠে পড়ল শেখ হাসিনার বাড়ি। শেখ হাসিনার বাড়িতে থাকে, শেখ হাসিনার খাওয়া খায়। শেখ হাসিনার কাপড় পরে। শেখ হাসিনার দেয়া পয়সায় চলে। আর চাই কি? অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেখ হাসিনার বেহিসেবি পয়সার বদৌলতে এদের ডজন ডজন প্যান্ট, ডজন ডজন শার্ট,

ডজন ডজন জুতা হয়ে গেল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শেখ হাসিনার বদৌলতে অনেক বিত্তশালীও হলো।

এরদের মধ্যে বাহাউদ্দিন নাসিম মনে করত এবং চাইত কেউ শেখ হাসিনাকে কোনো কিছু বলতে পারবে না। সে যেই হোক। হোক না সে দলীয় কেন্দ্রীয় নেতা। অথবা সমাজের গণ্যমান্য কেউ। কিংবা কোনো বুদ্ধিজীবি। সে যেই হোক। কেউই শেখ হাসিনাকে কোনো সংবাদ বা কোনো তথ্য কিংবা কোনো কথা বলতে পারবে না। তা সে সংবাদ বা কথা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন।

শেখ হাসিনাকে কেউ কিছু বলতে চাইলে আগে তাকে (বাহাউদ্দিন নাসিমকে) বলতে হবে এবং সে যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে শেখ হাসিনাকে বলবে। প্রয়োজন মনে না করলে বলবে না। আবার শেখ হাসিনার যদি কেনো নেতাকে, বা কোনো মানুষকে, কিংবা যে কাউকে কিছু বলার থাকে তাহলে (বাহাউদ্দিন নাসিমকে) বলতে হবে। বাহাউদ্দিন নাসিম যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে শেখ হাসিনার সেই কথাটা অন্যকে বলবে। প্রয়োজন মনে না করলে বলবে না। বাহাউদ্দিন নাসিমের এই দুঃসাহস বা স্পর্ধা হয়েছে শেখ হাসিনার কারণেই। বাহাউদ্দিন নাসিমের প্রতি শেখ হাসিনার কোনো দুর্বলতা না থাকলেও দুটি দুর্বলতা ছিল। তার একটি হলো মতিঝিল আদমজী কোর্টের পূর্ব পাশে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবিএল, মতিঝিল শাখা) যে শাখা রয়েছে, এই শাখায় বাহাউদ্দিন নাসিমের নামে শেখ হাসিনার কয়েক কোটি টাকা রয়েছে। উল্লেখ্য শিল্পপতি জহির উদ্দিন হত্যার প্রধান আসামী চিটাগাং– এর আক্তারুজ্জামান বাবু এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান/পরিচালক। অপর দুর্বলতাটি বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার পিতার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে। এই বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার ধানমণ্ডি পাঁচ নম্বর রোডের চুয়ান্ন নম্বর বাড়িতে মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করতে করতে বলত, এই বাড়িওয়ালী তো বেঈমান।, বেঈমানি তো করবেই। ভুইলা তো যাইবেই। মনে তো রাখবেই না। কুত্তা (কুকুর) পাইলা থুইয়া যাইমু, কুত্তা (কুকুর) ভুলব না।

প্রায়ই বাহাউদ্দিন নাসিম এসব বলত। বলতে বলতে একদিন বাহাউদ্দিন নাসিম ঠিকই দুটি কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসে পালতে শুরু করল। ধানমণ্ডি পাঁচ নম্বর রোড-এর শেখ হাসিনার চুয়ান্ন নম্বর বাসায় কুকুরের বাচ্চা দুটি এখন অনেক বড় হয়েছে। এখন আর ওদের কুকুরের বাচ্চা বলা যাবে না। বলতে হবে কুকুর। বাহাউদ্দিন নাসিম এই ধরনের কথা এবং কাজ করবেই বা না কেন। বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার বাড়িতেই থাকত। আর ঐ বাড়িতে বাহাউদ্দিন নাসিমের পিতা, ভাইয়েরা এলে, আশ্চর্য চরিত্রের অধিকারী শেখ হাসিনা দারোয়ান ডেকে কুকুরের মতো দূর দূর করে তাদের তাড়িয়ে দিতেন।

স্বামী-স্ত্রী রাত ও কাটাননি

১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ২৯ মিন্টো রোডের সরকারি বাসা ত্যাগ করে ধানমণ্ডি পাঁচ নম্বর রোডের চুয়ান্ন নম্বর বাড়িতে উঠলেন। ধানমণ্ডি ০৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িটি প্রথম ও দ্বিতীয় তলা শেখ হাসিনার পরিত্যাক্ত স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার নামে। আর তৃতীয় তলা শেখ হাসিনার নিজের নামে। শেখ হাসিনার অবহেলিত ও পরিত্যক্ত স্বামী বৈজ্ঞানিক ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এই বাড়িটি করার সময় দ্বিতীয় তলা করার পর টাকা ফুরিয়ে গেলে শেখ হাসিনার কাছে ধার চান। তখন শেখ হাসিনা তৃতীয় তলা তার নিজের নামে লিখে নিয়ে তারপর ডঃ ওয়াজেদকে টাকা দেন। অবশ্য এই বাড়িতে ডঃ ওয়াজেদ মিয়া আর শেখ হাসিনা একসঙ্গে একটি রাতও কাটাননি। শুধু এই বাড়িতে কেন, ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার পর থেকেই ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (এর পরের অবস্থা জানা নেই যদিও, তথাপি বোঝা যায়, পাঠক যেই দিন পড়বেন, সেই দিন পর্যন্ত ধরে নিতে পারেন) এই ১৬/১৭ বছর এক সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে রাত কাটানো তো দূরের কথা, এক বাড়িতেই কখনো থাকেননি। ১৯৮১ সালে ১৭ই মে বাংলাদেশে আসার পর মাত্র কিছু দিন শেখ হাসিনা ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার মহাখালীস্থ সরকারি কোয়াটারে ছিলেন। শেখ হাসিনা যতদিন ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার সরকারি কোয়াটারে থেকেছেন, তত দিন ডঃ ওয়াজেদ মিয়া তাঁর কোয়াটারে না থেকে সরকারি রেস্ট হাউসে থাকতেন। এরপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে তাঁর পিত্রালয় বঙ্গবন্ধু ভবনে চলে আসেন। বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে যান বিরোধী দলীয় নেত্রীর ২৯ মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে। তখন শেখ হাসিনা এবং তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার ধানমণ্ডি ০৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িটি ভাড়া দেয়া ছিল। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ধানমণ্ডি ০৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িটির ভাড়াটিয়াদের এক প্রকার জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে খালি করা হয় এবং তারপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই বাড়িতে আসেন। এই বাড়িতে থেকেই নানা আন্দোলন-সংগ্রাম এবং নির্বাচনের পর জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন করোতোয়া, বর্তমানে গণভবন এ গিয়ে ওঠেন। শেখ হাসিনার এই দীর্ঘ ১৬/১৭ বছরের জীবনে ডঃ ওয়াজেদ মিয়া একটি রাতও শেখ হাসিনার সাথে কাটাননি। এমনকি এই ১৬/১৭ বছরের জীবনে শেখ হাসিনা আর ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার ১৬/১৭ বারও দেখা পর্যন্ত হয়নি। তবে হঠাৎ হঠাৎ মাঝেমধ্যে কদাচিৎ উদভ্রান্তের মতো ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এসে হাজির হতেন। কিন্তু তিনি (ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার আদর-আপ্যায়ণ পেতেন না। এমন কি সাধারণ সৌজন্যটুকুও শেখ হাসিনা ডঃ

ওয়াজেদ মিয়াকে দেখাতেন না। শেখ হাসিনা যখন বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে ২৯ মিন্টো রোডের সরকারি বাসায় থাকতেন, তখন এক ঈদের দিনে সাধারণ দর্শনার্থীদের মাঝে সাধারণ দর্শনার্থীদের মতোই ডঃ ওয়াজেদ মিয়া শেখ হাসিনার সঙ্গে ঈদ মোবারক জানাতে এলন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগত সকলের সাথে কুশলাদী বিনিময় করলেও তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদের সাথে কোনো প্রকার কুশলাদী বিনিময় দূরে থাক, ভ্রুক্ষেপই করলেন না। এমনকি তাকে (ডঃ ওয়াজেদ মিয়াকে) বসতে পর্যন্ত কেউ বললেন না। ডঃ ওয়াজেদ মিয়া কিছুক্ষণ করুণভাবে ফ্যালফ্যাল করে শেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেড়িয়ে লনে, লন থেকে অসহায়ের মতো হাঁটতে হাঁটতে গেটের বাইরে চলে গেলেন। একমাত্র শেখ হাসিনা আর তার খুবই ঘনিষ্ট কয়েকজন ছাড়া কেউ জানল না, বুঝল না এই ব্যক্তিটি কে।

অনেক বার অসুস্থ হয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে মাসাধিক কাল পড়ে থাকলেও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একটি বারের জন্যও তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়াকে দেখতে যেতেন না।

শেখ হাসিনার দেহে আঘাত

শেখ হাসিনার দেহে অনেক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই আঘাতের ব্যথায় মাঝে মাঝেই কাতরাতেন তিনি। এমনকি কেঁদে ফেলতেন। কাঁদতে কাঁদতে বলতেন ময়না (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘোষিত ২নং ব্যক্তি মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না) এই বিশষ জায়গাটায় বেশি করে মালিশ করো। শয়তানের বাচ্চাটা (ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) আমাকে (শেখ হাসিনা) ১৯৮০ সালে এই জায়গায় মেরেছে। আজও সেই ব্যাথায় আমি কাতরাই।

ময়নার প্রধান কাজ ছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দেহ মালিশ (মেসেজ) করা। প্রায় প্রতিদিন শেখ হাসিনার দেহ মালিশ (মেসেজ) করে ঘুম থেকে তোলা এবং ঘুমানোর আগে দেহ মালিশ করে তাকে (শেখ হাসিনাকে) ঘুম পাড়ানোই ছিল ময়নার প্রধান কাজ। এছাড়া ভিআইপি কেউ এল তাকে এন্টারটেইনমেন্ট বা আপ্যায়ণ করা। ভিআইপি ব্যক্তির সাথে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করা। টেলিফোন ধরা ও টেলিফোনকারীকে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন দেয়া এবং নেত্রীকে তা ইনফর্ম করা। বঙ্গবন্ধু কন্যার যাবতীয় খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা। তার শাড়ি, পোষাক-আশাক তৈরি করা এবং শেখ হাসিনাকে কাপড়-চোপড়, পোশাক পরিয়ে পরিপাটি করে বাইরের বিভিন্ন কর্মসূচীতে পাঠানো

ইত্যাদি ছিল ময়নার দৈনন্দিন দায়িত্ব। এছাড়া বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে ছিল নেত্রীকে বাইরের প্রকৃত খবরাখবর জানানো।

এসব করা ময়নার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু চাকরি ছিল না। এসব করার জন্য ময়নাকে বেতন করে রাখা হয়নি। উপরন্তু ময়নাই (মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু) জননেত্রী শেখ হাসিনাকে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র যাবতীয় কিছু সাধ্যানুযায়ী দিতো। ভোরে মেয়ে শেখ হাসিনাকে ঘুম থেকে তুলে নাস্তা খাইয়ে তিনি যতক্ষণ ঘরে থাকতেন ততক্ষণই ময়নাকে কাছে থাকতে হতো। কোনো কোনো দিন শেখ হাসিনার বাসা থেকে ময়নার নিজের বাসায় ফিরতে রাত ০১/০২ টা–ও হতো।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ময়নাকে ধরে কাঁদতে থাকতেন আর বলতে থাকতেন, জানো ময়না, শয়তানের বাচ্চা (তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) আমাকে দিনে তিনবার মারত। সকাল-দুপুর আর রাতে। এই তিন বেলা শয়তানের বাচ্চা শয়তান আমাকে মারত। মেরে মেরে আমার সারা শরীর ঝাঁঝরা করে দিত। হারামির বাচ্চাটা দুপুরে এসে আমাকে মারবে, এই জন্য একবেলা কম মার খাওয়ার জন্য আমি (শেখ হাসিনা) জয় আর পুতুল দুই সন্তানকে নিয়ে দুপুরে পার্কে কাটিয়ে আসতাম। ঐ ইবলিশটার মারের চোটে আমার দেহের কিছু নাই। সারা দেহে শুধু ব্যথা। বিয়ের পর থেকেই শয়তানের বাচ্চা আমাকে মারা শুরু করেছে।

অদ্ভুত চরিত্র, কর্ম ও ভাগ্য

শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া শেখ হাসিনাকে দৈহিক নির্যাতন করতেন, মারধর করতেন, এ কথা শেখ হাসিনা অসংখ্যবার কেঁদে কেঁদে বলেছেন। শেখ হাসিনার কান্নায় ময়নার চোখেও পানি ঝরেছে। কিন্তু কেন স্বামী তাকে মারতেন, দৈহিক নির্যাতন করতেন, এই কথা শেখ হাসিনা কখনোই বলেননি। এ এক অদ্ভুত চরিত্র, কর্ম ও ভাগ্যের অধিকারী শেখ হাসিনা। বিদেশ থেকে একমাত্র কন্যা পুতুল এসে মা শেখ হাসিনাকে ডাকে "এই যে বহুরূপী" তোমার তো রূপের শেষ নেই। এবার কি রূপ দেখাবে তুমি।

শেখ হাসিনা কোনো কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পুতুল আত্মীয়-স্বজন সকলের সামনে বলে ওঠে, এটা তোমার কত নম্বর রূপ! শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানাকে পুতুল বলে, খালা এটা তোমার বোনের কত নম্বর রূপ? তোমার বোন তো বহুরূপী। রূপের শেষ নাই তার।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তৎক্ষণাৎ চুপ মেরে যান। কোনো কথা বলেন না। শেখ হাসিনা মেয়ে পুতুলকে তার (পুতুলের) নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিলে, কোনো রকম টালবাহানা না করে বিনা বাক্যে মুহূর্তের মধ্যে সটান এক পায়ে দাঁড়িয়ে

রাজি হয়ে যায়। মনে হয় যেন কারো হাত ধরে মুক্তি পেতে চায় পুতুল। শেখ হাসিনাও যেনতেন পাত্রের কাছে পুতুলকে বিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে চান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিদেশে বসবাসরত একমাত্র পুত্র জয়কে ফোন করে দেশে এসে বেড়িয়ে যেতে বলেন এবং আসার সময় তার (শেখ হাসিনার) জন্য একটা শাড়ি নিয়ে আসতে বললে পুত্র জয় সরাসরি অস্বীকার করে বলে, ও সব শাড়িটাড়ি আমি আনতে পারব না।

শেখ হাসিনা আবার উপস্থিত সকলকে বলে, দেখ, আমার সন্তান দেখ, আমার জন্য একটা শাড়ি আনতে বললাম। ছেলে আমার সরাসরি না করে দিলো।

মা হিসেবে পুত্র-কন্যার প্রতি শেখ হাসিনার আচার-আচরণে কোনোদিন কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি। বরং মনে হয়েছে মা হিসেবে শেখ হাসিনার তুলনা নেই। তারপরও আর্শ্চয্যের বিষয়! শেখ হাসিনার প্রতি তার পুত্র-কন্যার কেন এরকম আচরণ?

রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দিব না

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলের বিয়ে ঠিক করলে, ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িতে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এসে ক্ষিপ্ত হয়ে শেখ হাসিনাকে বলতে লাগলেন, মেয়ে কি তোমার একার? মেয়ে কি আমার না? তুমি রাজাকারের ছেলের কাছে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছ? রাইফেল হাতে নিয়ে যে রাজাকারগিরি করেছে, মুক্তিযোদ্ধা মেরেছে, তার ছেলের সঙ্গে আমি কিছুতেই আমার মেয়ে বিয়ে দেবো না। তুমি আমার মেয়েকে ঐ রাজাকারের ছেলের সাথে কিছুতেই বিয়ে দিতে পারবে না।

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আমি মেয়ে বিয়ে দেবো। পারলে তুমি ঠেকাও।

ডঃ ওয়াজেদ বললেন, তাই বলে তুমি রাজাকারের ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দেবে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, কিসের আবার রাজাকার ফাজাকার? আমার আত্মীয় এটাই বড় কথা। সাথে মরলে আত্মীয়রাই মরে। দেখো নাই ঐ মুক্তিযোদ্ধা ফুক্তিযোদ্ধারাই আমার বাপ-মা-ভাইদের কীভাবে মেরেছে? আমি আমার মেয়েকে এখানেই বিয়ে দেবো। পারলে তুমি ঠেকাও।

ডঃ ওয়াজেদ মিয়া বললেন, তোমাদের সাথে তো আমি ঠেকাঠেকিতে পারব না। তবে আমি বলে দিচ্ছি আমার মেয়েকে যদি রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দেও,

তবে আমি এই বিয়ের সাথে নেই। এই বিয়েতে আমি আসব না। আমি তোমাকে (বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে) অনুরোধ করছি ঐ রাজাকারের ছেলে ছাড়া যেখানে খুশি তুমি মেয়ে বিয়ে দাও, আমি তোমার সাথে থাকব। কিন্তু রাজাকারের বংশের মেয়ে বিয়ে দিলে আমি থাকব না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদের কথা রাখলেন না। তিনি তার ইচ্ছে মতো রাজাকারের ছেলের সঙ্গেই মেয়ে বিয়ে দিলেন। সত্যি সত্যিই ডঃ ওয়াজেদ কথা পাকাপাকি, পান চিনি, গায়ে হলুদ এবং বিয়ে কোথাও এলেন না। শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে মিনিট ৩/৪—এর জন্য এসে আবার খালেদা জিয়ার সঙ্গেই চলে গেলেন। তিনি কারো সাথে কোনো কথা বললেন না। কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলল না।

বিয়ের খুটিনাটি থেকে শুরু করে যাবতীয় যা আয়োজন তার সিংহভাগই করতে হয়েছে আমাদের (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘোষিত এক নম্বর মতিয়ুর রহমান রেন্টু দুই নাম্বার মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু, ময়না)। এর উপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিমের বায়না তো ছিলই। ডেকোরেটারের বিল, বাবুর্চির বিল, খানসামার বকশিস ইত্যাদি যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, বাহাউদ্দিন নাসিম তার সব কিছুই আমাদের কাছ থেকেই নিয়েছে।

সব যান, বের হন

বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ে পড়ানোর জন্য কাজীর সামনে একটি মাইক লাগানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হঠাৎ সেই মাইক দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে আগতদের ঢালাওভাবে ধমকের সুরে বলতে লাগলেন, সব যান বের হন, কি পেয়েছেন? তামাশা পেয়েছেন? এখনই এই জায়গা থেকে চলে যান। নইলে অসুবিধা হবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যার মুখে মাইকে এই কথা শুনে উপস্থিত সকলে হতবিহ্বল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। এবং অনেকেই আগামাথা না বুঝে অনুষ্ঠান থেকে চলে যেতে শুরু করলে, ময়না তাড়াতাড়ি জননেত্রীর কাছে এই কথার অর্থ কি জানতে চাইলে শেখ হাসিনা বলেন, দাওয়াত ছাড়াই অনেকে এসেছে, তাদের জন্য আমি এই কথা বলেছি। এরপর ময়না নিমন্ত্রিত অতিথিদের অনেককে বুঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। অধিকাংশ নিমন্ত্রিত অতিথিই না খেয়ে চলে যায়।

বিয়ের সকল অনুষ্ঠান শেষ। সকলেই চলে গেছে। শুধু বর (জামাই) আর বরের আত্মীয়-স্বজনরা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলকে বরের

গাড়িতে তুলে দিয়ে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর জননেত্রী শেখ হাসিনা ময়নাকে বললেন, ময়না আজ আর তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।

বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল সংসদ ভবন চত্বর থেকে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমাদের একমাত্র সন্তান পাঁচ বছরের স্বর্ণলতাকে সাথে নিয়ে ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডে শেখ হাসিনার ৫৪ নম্বর বাড়িতে চলে এলাম। বাড়িতে এসে বাইরের কাপড় পাল্টে সবাইকে নিয়ে মাটিতে গোল হয়ে বসে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ময়নাকে বললেন, ময়না তোমরা যা করলে, তোমাদের ঋণ জীবনে শোধ করা যাবে না। কোনোদিন তোমাদের ভুলা যাবে না। কোনোদিন তোমাদের ভুলব না। আমাদের মেয়ে স্বর্ণলতাকে দেখিয়ে বললেন ও তো পেটে থাকতেই আমাকে ভালোবাসে।

অবশ্য এসব কথা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আজ নতুন বলছেন না। এর আগেও অনেক বার এসব কথা তিনি বলেছেন।

এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা

১০ই জানুয়ারি, ১৯৯৫। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে রাম মোহন দাসের নামে রেজিস্ট্রি করা লাল রঙয়ের নিশান পেট্রল জিপে করে ফিরে আসছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তার সঙ্গে তার পাশে বসে আছে তার একজন মাত্র সঙ্গী। ড্রাইভার জালাল গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি চলছে। ড্রাইভার জালাল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করল, আপা মেয়র হানিফ এলো না ফুল দিতে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দিলেন, কে জানে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেয়ার জন্য ওকে কম ফোন করি নাই। শয়তানটা পাত্তাই দেয় নাই। এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে নিমকহারামটাকে আমি মেয়র বানিয়েছি। তোমরা তো সব জান, সবই দেখেছ, সবই করেছ। কত কষ্ট করেছি আমি। আসলে যে দল থেকে একবার চলে যায় তাকে আর দলে নেয়া উচিত না। ও মেয়র হওয়ার জন্য আমার সাথে বেঈমানি করে স্বৈরাচারী এরশাদকে বাপ ডেকে এরশাদের পার্টিতে চলে গেছিল। সেইখানে ছেক খেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে যখন আসলো তখনই বেঈমানটারে নেয়া উচিত ছিল না। কিন্তু কি যে হইলো। কি মনে করে যে আবার নিলাম। শয়তানটা আমার সাথে এত বড় বেঈমানি করবে বুঝতে পারি নাই। বুঝতে পারি নাই। বুঝলে কি আর এই কাম করি।

নেত্রী এখন নামাজ পড়ছেন

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালের শেষ মুহূর্তে ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বরের বাড়িতে উঠেই, ১৯৯৫ সালের জানুয়ারির প্রথম থেকেই জোরসোরভাবে লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রাম, হরতাল, পদযাত্রা ইত্যাদি শুরু করলেন। দুপুর দুটায় টঙ্গী থেকে মহাখালী পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু হলো। অর্থাৎ টঙ্গী থেকে সবাই পায়ে হেঁটে মহাখালী যাবেন। মহাখালীতে মঞ্চ তৈরি করা আছে, পদযাত্রা শেষে এই মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভাষণ দেবেন। শেখ হাসিনার তার বেতনভুক্ত ব্যাগ বহনকারী রাম মোহন দাস এর নামে রেজিস্ট্রেশন করা লাল রঙয়ের নিশান পেট্রোল জিপে করে বাকি সব নেতাকর্মী সবাই পায়ে হেঁটে টঙ্গী থেকে মহাখালীর দিকে রওয়ানা হলো। প্রায় পাঁচ সাত হাজার লোকের পদযাত্রা। পদযাত্রায় অংশ নেয়া ৫/৭ হাজার লোকের ঠিক মাঝখানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিপে করে পদযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। পদযাত্রার মাঝে মাঝে গোটা বিশেক রিকশায় মাইক বেঁধে নানা ধরনের শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। জানুয়ারি মাস, শীতের বেলা। হাঁটতে খুব একটা খারাপ লাগছে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে হবে। হঠাৎ একটি মাইকে বলা হলো জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এখন আসরের নামাজ পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মাইক থেকে বলা শুরু হলো জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা এখন আসরের নামাজ পড়ছেন। ঘড়িতে তখন সোয়া তিনটা বাজে।

প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহম্মেদ (বর্তমানে শেখ হাসিনার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী) বললেন, আরে থামো থামো, এখনো আসর ওয়াক্তই হয় নাই। একটু পরে বলো।

এই কথা শুনে সব নেতারা হাসাহাসি শুরু করলেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা নিশান পেট্রোল জিপের বড় বড় জানালার গ্লাস খুলে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আর পদযাত্রার হাজার হাজার পুরুষ লোক জিপ গাড়ি ঘিরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নামাজ পড়া দেখতে লাগল। নামাজ শেষ হয়ে গেল কিন্তু মাইকে নামাজ পড়ার প্রচার শেষ হলো না। প্রায় এক ঘন্টারও বেশি সময় গোটা বিশেক মাইকে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নামাজ পড়ছেন প্রচার করা হলো।

অন্য আর একদিন মোহাম্মদপুর থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে গুলশান আমেরিকান এম্ব্যাসির সামনে গিয়ে বাড্ডায় গিয়ে শেষ হবে। পদযাত্রা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ডেকে বললেন, নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পরে যেন মাইকে বলা শুরু করে। ওয়াক্তের আগে যেন বলা শুরু না করে।

এবার মাইকম্যানদের আগেভাগেই জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হলো এবং আজ নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরই মাইকে প্রচার শুরু হলো।

নেত্রীও যথারীতি নিশান পেট্রোল জিপের জানালা খুলেই নামাজ আদায় করলেন। হাজার হাজার পুরুষ মানুষও জিপ ঘিরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নামাজ আদায় দেখল। পদযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা তার ৫ নম্বর ধানমণ্ডি রোডের বাসায় গেলে তার এক সঙ্গী বলল, আপা (শেখ হাসিনা) আপনি নামাজ পড়তে থাকলে মানুষ ভীড় করে আপনাকে দেখতে থাকে, এতে নামাজ নষ্ট হয়। আপনি নিশান পেট্রোল জিপে পর্দা লাগিয়ে নেন।

উত্তরে শেখ হাসিনা বললেন, না পর্দা লাগালে জিপের ডিসেন্সি থাকে না।

তখন ঐ সঙ্গী বলল, তাইলে আপা আপনি জিপে বড় একটা চাদর রাখবেন, যখন নামাজ পড়বেন আমরা তখন ঐ চাদর দিয়ে জিপটা ঘিরে রাখব। যাতে আপনার নামাজ পড়া কেউ দেখতে না পারে।

জননেত্রী বললেন, না তোমরা তো সব ভাইয়ের মতো, চাদর লাগবে না।

আমার সাথে বেঈমানি করেছে

এর তিন দিন পড়ে কাঁচপুর থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত পদযাত্রা। এই পদযাত্রায়ও ঐ একই মাইক, একই নামাজ, একই পুরুষ মানুষের ঘিরে দেখা। এই পদযাত্রায় যোগ দিয়েছিল নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নিশান পেট্রোল জিপের পাশে হাঁটতে হাঁটতে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, নেত্রী আমার মিতাকে দেখছি না?

নেত্রী বললেন, কোন মিতা?

জেলা সভাপতি বললেন, নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ঢাকার মেয়র মোঃ হানিফকে দেখছি না?

সভানেত্রী রেগে বলে উঠলেন, জানেন না, কুত্তার বাচ্চাটা আমার সাথে বেঈমানি করেছে। নিমকহারামি করেছে। ওরে আমি এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে মেয়র বানিয়েছি। আর কুত্তার বাচ্চাটা আমার সাথেই বেঈমানি করেছে। ও (ঢাকার মেয়র হানিফ) এখন প্রতিদিন খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করে। দিনে তিন-চার বার খালেদা জিয়ার সাথে ফোনে কথা বলে। আর আমি খবর দিলেও আসে না। ফোন করলেও ধরে না। সময় এলে এই বেঈমানদেরও শিক্ষা দিতে হবে। বুঝলেন, এই বেঈমানদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আপনারা প্রস্তুত হন।

আমি খাইছি

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সারা দেশে লাগাতার তিনদিন হরতাল দিয়েছেন। দোকানপাট খুলবে না, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ

চলবে না, গাড়ির চাকা ঘুরবে না। আগাম তিন দিনের হরতালের ঘোষণা পাওয়ায় ঢাকা শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। হরতালের প্রথম দিনেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাড়ির (ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়ি) মাটির নিচের পানির ট্যাঙ্কি (রিজার্ভার) থেকে ছাদের উপরের ট্যাঙ্কিতে পানি তোলার মটর নষ্ট হয়ে গেলে হরতালের দ্বিতীয় দিনে রাত আটটার সময় নবাবপুর থেকে সিরাজী নামের এক ঢাকাইয়া মটর মেকানিক নিয়ে যাওয়া হয়। মটর মেকানিক সিরাজী মটর দেখে এটা ঠিক করতে একদিন সময় লাগবে এবং মটরটা খুলে নিয়ে যেতে হবে জানালে তাকে মটর খুলে নিয়ে যেতে অনুমতি দেয়া হলো। মটর মেকানিক সিরাজী আওয়ামী লীগের গোড়া সমর্থক। সে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে একটু সালাম দিতে চাইল। বঙ্গবন্ধু কন্যা দুদিন থেকে মটর নষ্ট হওয়ার কারণে ঠিকমতো গোসল করেননি। তার উপর আজ সারাদিন নিচেই নামেননি। এই পরিস্থিতিতে মেকানিক সিরাজী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সালাম দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে একটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিলো। আবার মেকানিক সিরাজী কষ্ট করে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছে। এসব চিন্তাভাবনা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো মটর মেকানিক আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। সে আপনাকে একটু সালাম দিয়ে যেতে চায়। জননেত্রী সালাম নিতে অস্বীকার করলে জননেত্রীকে বলা হলো আপনি সালাম নিলে মেকানিক তাড়াতাড়ি মটর মেরামত করে দিত।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, ওর বাড়ি কোথায়?

ঢাকায়।

ঢাকাইয়া কুট্টি?

জ্বি, খাস ঢাকাইয়া।

ঠিক আছে, দোতালায় ভিআইপি রুমে নিয়ে আসো। আমি হ্যালো বলে দেই।

মেকানিক সিরাজী এসে সালাম দিলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাড়ি কোথায়?

সিরাজী বলল, নবাবপুরে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, বসেন।

সিরাজী খুবই জড়তার সাথে জড়সড়ো হয়ে বসল। নেত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আওয়ামী লীগ করেন বুঝি।

মেকানিক সিরাজী বলল, পাকিস্তান আমল থেকেই আওয়ামী লীগ করি।

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা একটানে মেয়র হানিফকে কথায় টেনে এনে বললেন, আমি ঢাকাইয়া হিসেবে হানিফকে মেয়র বানালাম, আর হানিফ মেয়র হয়েই আমার সাথে বেঈমানি করল। আপনারা হানিফকে ছাড়বেন না। আমি এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে হানিফকে মেয়র বানিয়েছি। আর সেই হানিফ আমার

সাথে নিমকহারামি করে খালেদা জিয়ার আঁচলের তলে ঢুকেছে। প্রতিদিন খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করে। খালেদার কথামতো আমার আন্দোলনে আসে না। বেঈমান নিমকহারাম। আপনারা তৈরি হন, ওকে উচিৎ শিক্ষা দেবেন। ইত্যাদি বলতে বলতে এক পর্যায়ে মটর মেকানিক সিরাজীকেই আগামী নির্বাচনে হানিফের বিকল্প মেয়র প্রার্থী করে ফেললেন। তারপরও মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে কথা বলা শেষ হলো না। প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেল। কিন্তু কথা শেষ হলো না। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আগেই বলা ছিল যে, কোনো লোকই আমার কাছে এলে কিছুক্ষণ পরেই তোমরা নানা ধরনের কথা বলে তাকে আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাবে। আমার (শেখ হাসিনা) এত রূপ গজায় নাই যে, আমি ঘন্টার পর ঘন্টা একজনকে সামনে নিয়ে বসে থাকব। আবার আমি নিজে তো কাউকে বলতে পারি না এখন যান। কাজেই আমার কাছে কেউ এলে তোমরা তাকে নানা কথা বলে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। নেত্রীর এই কথা মনে করে মটর মেকানিক সিরাজীকে বলা হলো, আপনি উঠেন, নেত্রী রাতের খাওয়া খাবেন।

সিরাজী উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা কথা থামালেন না। সিরাজী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার বসল। দ্বিতীয় বার আবার সিরাজীকে বলা হলো, আপনি ওঠেন নেত্রী রাতের খাবার খাবেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যার মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে কথা বলা শেষ হলো না। তিনি বলতেই থাকলেন, মেকানিক সিরাজী আবারও বসে পড়ল। বঙ্গবন্ধু কন্যা মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে মশগুল হয়ে কথা বলছেন। মিনিট দশেক পরে মেকানিক সিরাজীকে তৃতীয়বার বলা হলো আপনি ওঠেন নেত্রী ভাত খাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন, আমি খাইছি।

বঙ্গবন্ধুর ৭৬–তম জন্ম উৎসব

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকের এক বিকেলে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চা খেতে খেতে বললেন, এবার আব্বার জন্ম দিনটা জাকজমকভাবে পালন করতে হবে। মুল অনুষ্ঠান টুঙ্গিপাড়ায় হবে। ঢাকা থেকে অনেক লোকজন নিয়ে যেতে হবে। ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে একটা উপ-কমিটি করতে হবে। আর তোমরা ওকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। মোট কথা আব্বার ৭৬–তম জন্মদিনটা আকর্ষনীয় করে করতে হবে।

১লা মার্চ ১৯৯৫, সন্ধ্যা বেলায় ধানমন্ডি ছয় নম্বর রোডের আওয়ামী ফাউন্ডেশন অফিসে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসল। বৈঠকে ওবায়দুল কাদের (বর্তমান যুব ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী) নেতৃত্বে উপ-কমিটি

করে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচী নেয়া হল। কর্মসূচীর প্রথম দিন ১৭ই মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় সকাল ০৭:০০ টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মাজারে পুষ্পমালা অর্পনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু হবে। ঐ দিনের কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে সকাল আটটায় শিশু কিশোরদেরকে মিষ্টি বিতরণ। মিষ্টি বিতরণ করবেন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। এরপর বিকেল তিনটায় গেমাডাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে আলোচনা সভা। আলোচনা সভা শেষে লাঠি খেলা। কর্মসূচীর ২য় দিনে অর্থাৎ ১৮ই মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সন্ধ্যা সাতটায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কর্মসূচীর তৃতীয় দিন ১৯ শে মার্চ বিকাল ০৩:০০ তিনটায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউ–এ জনসভা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭৬–তম জন্মদিনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সকল প্রকার প্রস্তুতি পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এবারের টুঙ্গিপাড়া কর্মসূচীতে একটু নতুনত্ব থাকবে। সেই নতুনত্ব হলো ঢাকা থেকে শ'পাঁচেক যুবক টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই যুবকদের প্রত্যেককে দেয়া হবে ইউনিয়ন কাপড়ের নতুন ফুল হাতা সাদা শার্ট। এই শার্টের পকেটে এ্যামব্রডায়রি করে লেখা থাকবে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান–এর ৭৬–তম জন্ম উৎসব।"

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে আগত অতিথিদের টুঙ্গিপাড়ায় স্বাগত জানানোর জন্য ১৫ই মার্চ, ১৯৯৫ টুঙ্গিপাড়ায় চলে এলেন। ১৬ই মার্চ ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে ঢাকা থেকে যুবকরা এলো। তবে পাঁচ শত যুবক ঢাকা থেকে নিয়ে আসার কথা থাকলেও মোটামুটি দুই/তিন শত যুবক ওবায়দুল কাদের নিয়ে এসেছে। সেই সাথে আরো কিছু অতিথি ঢাকা থেকে এসেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগত সকল অতিথিদের স্বাগত জানালেন। ঢাকা থেকে আগতদের গোপালগঞ্জ সরকারি সার্কিট হাউজ, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কোর্ট ও কার্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় রাতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হলো।

পরদিন ১৭ই মার্চ সকাল ০৭:০০ টার মধ্যে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান–এর মাজার ও বাড়িতে সকলে এসে হাজির হলো। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়ন কাপড়ের ইস্ত্রি করা নতুন ফুলহাতা সার্ট পরে ওবায়দুল কাদের প্রায় তিন শত যুবক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল সোয়া সাতটায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মাজারে প্রথমেই পুস্পস্তবক অর্পণ করলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। তারপর অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ ও অতিথিগণ। এরপর শিশু–কিশোরদের পুস্পস্তবক অর্পণ। কিন্তু একমাত্র মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না)'র একমাত্র কন্যা স্বর্ণলতা ছাড়া অন্য কোনো

শিশু ঢাকা থেকে আসেনি। আর টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে যে সকল শিশু-কিশোর মিষ্টি নেয়ার জন্য এসেছে, তাদের সকলেই প্রায় বিবস্ত্র। মাঝে মাঝে যদিও এক আধজনের গায়ে বস্ত্র আছে, তবে সে বস্ত্র এতই ছেঁড়া এবং মলিন যে তা বিবস্ত্র মনে হয়। কাজেই বিবস্ত্র শিশু–কিশোরদের পুস্পস্তবক অর্পণ করতে না দিয়ে শিশু-কিশোরদের পক্ষ থেকে একমাত্র সবেধন নীলমণি স্বর্ণলতাকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান–এর মাজারে পুস্পস্তবক অর্পণ করতে হল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিওটা সুন্দর হতো

এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিনের দ্বিতীয় কর্মসূচী শিশু-কিশোরদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ। মিষ্টি বিতরণ করবেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। মাজার থেকে ৩০/৪০ ফুট পশ্চিম-দক্ষিণে শেখ বাড়ির অন্য শরিকের যে উঠান (উঠান মানে গ্রামের ঘরের সামনে খালি জায়গা)। এই উঠানেই দাঁড়িয়ে আছে শ'তিনেক শিশু-কিশোর। এই উঠানের পশ্চিমে শেখ হাসিনার বংশীয় চাচা শেখ কবিরের ঘর। এই ঘরের বারান্দাকেই মঞ্চ হিসেবে ধরা হয়েছে। এখানে বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি ভিডিও করা হচ্ছে।

সকাল সাড়ে আটটায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর আদর্শ বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন চোখে নিয়ে ভাব-গম্ভীরভাবে ধীর পায়ে শিশু-কিশোরদের মিষ্টি বিতরণ করার জন্য এগিয়ে এলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু একি! অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩শর মত শিশু-কিশোরের সকলেই প্রায় বস্ত্রহীন। মাঝে মাঝে এক-আধটা শিশু আবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আর এই অনুষ্ঠানেই ওবায়দুল কাদের সহ ঢাকা থেকে আসা শত শত যুবক সাদা নতুন ফুলহাতা শার্ট পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই শার্টের পকেটেই এ্যামব্রডায়রি করে লেখা আছে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান–এর ৭৬–তম জন্ম উৎসব"।

এই কি বিচার? এই কি বিবেক-বিবেচনা? এই কি ইনসাফ? জাতিক জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্ম উৎসবের এই দিনে, জন্ম উৎসবেই আসা টুঙ্গিপাড়া গ্রাম বাংলার এই দুঃখী বস্ত্রহীন শিশু-কিশোরদের ভাগ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যেও কি এক টুকরা নতুন কাপড় জুটলনা ?

নিজেকে আর সামলানো গেল না। ওবায়দুল কাদেরকে প্রচন্ড এক ধমক দিলাম এই বলে যে, মিয়া নিজে তো সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চাঁদার পয়সায় নতুন জামা গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কি হতো দু'একশ জামা এই হতভাগা বস্ত্রহীন শিশুদের জন্য নিয়ে এলে ?

ধমক দেয়ার মুহূর্তেই মনে হলো বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমার প্রতি খবুই অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, তাই কভার দেয়ার জন্য বললাম, এটলিস্ট ভিডিওটা সুন্দর হত।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিওটা সুন্দর হতো।

এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এক টুকরো মিষ্টি পেলেই খুশি হতভাগ্য শিশু-কিশোরদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৭৬–তম জন্ম উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব শেষ করলেন।

শেখ হাসিনাকে মিথ্যে বলা

লাগাতার ছয় দিন হরতাল ঘোষণার পর ঐ হরতালের কিছু ছাড় নেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালের ৮ই নভেম্বর বিকেল ০৩:০০ টায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু এভিনিউ–এ আওয়ামী লীগ অফিসের ৩য় তলায় সাংবাদিক সম্মেলন করছেন। অফিসের নীচে কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগের কর্মীরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে রায়ট পুলিশ আওয়ামী লীগের কর্মীদের ধাওয়া করলে কিছু সংখ্যক কর্মী অফিসের ৩য় তলায় চলে আসে এবং ভেতর থেকে কেচি গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। রায়ট পুলিশও কর্মীদের পেটাতে পেটাতে অফিসের ৩য় তলায় চলে আসে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ অফিসের ভেতরে রায়ট পুলিশের ঢুকে পড়ার কথা শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং নাসিমকে বলেন, দেখ তো কোন পুলিশ অফিসার এখানে এসেছিল। এখনই তাদের নিয়ে আস।

বাহাউদ্দিন নাসিম কিছুক্ষণ অফিসের বাইরে কাটিয়ে এসে বলল। আপা, পুলিশেরা সব নেমপ্লেট খুলে এসেছিল।

এই কথা শুনে নজিব আহম্মেদ বলল হ্যাঁ হ্যাঁ পুলিশেরা তাদের কাঁধ থেকে র‍্যাঙ্কও খুলে এসেছিল। আদতে নজিব আহম্মেদ নজিব নীচে তো যায়ইনি এমনকি যখন পুলিশ অফিসে ঢোকে তাও দেখেনি। আসলে নাসিমের মিথ্যের সাথে তাল মিলিয়ে নজিব নিজের মিথ্যে জুড়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বুঝিয়ে দিলো আমিও এ্যাকশনে বা কাজে নিয়োজিত আছি। আর নাসিম যেহেতু মিথ্যা বলেছে তাই নজিবের মিথ্যাকেও সমর্থন করে গেল। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই মিথ্যেকে সত্য বলে ধরে নিলেন এবং পুলিশের আইজির বিরুদ্ধে মামলা করতে বললেন। আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান এই ব্যাপারে একটি মামলা করল। মামলাটি বর্তমানে ঢাকা চীফ্ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন।

আওয়ামী লীগে সিদ্ধান্তের গুরুত্ব

১৯৯৫ সালে চাঁদপুর পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে আওয়ামী যুবলীগের এক কর্মী চেয়ারম্যান প্রার্থী হয় এবং যুবলীগের এই কর্মী আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে যুবলীগ কর্মীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি ৮ নম্বরে আওয়ামী ফাউন্ডেশন অফিসে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক বসে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দলীয় শৃংখলা রক্ষার বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলা হয় আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে যুবলীগ কর্মীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া দলীয় শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদিও যুবলীগ প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়েছে তবুও তাকে শাস্তি দেয়া অত্যন্ত জরুরী। কেননা সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। যুবলীগ কর্মী এবং বর্তমানে চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে সংসদ নির্বাচনেও অনেকেই আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে প্রার্থী হয়ে যাবে। ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনার পর শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আওয়ামীলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সর্ব সম্মতিক্রমে যুবলীগ কর্মী চাঁদপুর পৌরসভার নব নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পরদিন সকালে শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ নাসেরের ৪র্থ ছেলে শেখ হেলালের ৪র্থ ভাই ২০/২২ বছরের যুবক শেখ রুবেল ধানমন্ডি ৫ নম্বার শেখ হাসিনার বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বলল, আপা তুমি চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে মালা দিয়ে বরণ করে নেও।

শেখ হাসিনা বললেন, না ওকে বহিস্কার করব। শেখ রুবেল বলল, ও সবাইকে হারাইয়া (পরাজিত করে) চেয়ারম্যান হইছে, ওকে মালা না দিয়া বহিস্কার করবা এইটা তুমি (শেখ হাসিনা) কও কি ? জলদি ওরে ডাইকা আইনা গলায় মালা দিয়া মিষ্টি খাওয়াও।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, দূর গত রাতেই তো আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিছে ওকে বহিস্কার করার।

শেখ রুবেল বলল, রাখ তোমার ওয়ার্কিং-ফুয়ার্কিং কমিটি। ওয়ার্কিং কমিটি ফমিটির কথা তুমি শুইনো না। ওরা জানে কি ? বেচারা জিতা আইছে কোথায় বাহ্‌বা

দিবা। তানা এমন উল্টা কথা। বড় আপা তুমি চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন পাঠাও। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন তাইলে এক কাম করি, আগে বহিস্কার করি পরে বহিস্কার প্রত্যাহার করি।

শেখ রুবেল বলল দেখ, আমি তোমারে কইতেছি, এখনই চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন জানাও আর ঢাকা আইনা মিষ্টি খাওয়াইয়া গলায় মালা দেও।

সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, তাইলে তো এখনই জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) কে বলতে হয়, নইলে আবার বহিস্কারের চিঠি পাঠিয়ে দেবে। এতক্ষণে পাঠিয়ে দিয়েছে কি না কে জানে।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানকে বললেন, শুনেন গতকাল রাতে ওয়ার্কিং কমিটি চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে বহিস্কার করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঐ চিঠিটা পাঠায়েন না। চেপে যান।

এরপর শেখ রুবেল চলে যাওয়ার জন্য সিড়িতে নেমে এলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে নজিব আহাম্মেদ নজিব শেখ রুবেলের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে, এই রুবেল, চাঁদপুরের চেয়ারম্যান–এর কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিস ? আমার ভাগ দে।

শেখ রুবেল বলে, দূর দূর সরো, যাইতে দাও।

নজিব বলে, আমার ভাগ দে নইলে যাইতে দিমুনা। বড় আপারে কইয়া দিমু। শেখ রুবেল বলে, পরে নিও, পরে নিও। এখনো হাতে পাই নাই। নজিব বলে ঠিক আছে আমারে দিবি তো ?

হ্যাঁ দিমু।

জনতাকে শান্ত থাকার বক্তৃতা

১৯৯৫ সালের ২৪শে আগষ্ট পুলিশ নিরাপদে বাড়ি পৌছে দেয়ার নাম করে ইয়াসমিন নামে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে দিনাজপুর যাওয়ার পথে ধর্ষণ ও হত্যা করে। এই খবর জানাজানি হয়ে গেলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হলে, দিনাজপুরের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং দিনাজপুরের মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং শুরু করলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমসহ কয়েকজন জেলা নেতাকে অনতিবিলম্বে জরুরী ভিত্তিতে ঢাকায় তলব করেন। এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমসহ দিনাজপুরের পাঁচ নেতা ঢাকা এসে ৩২ নম্বর ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরি রুমে বিকেল প্রায় পাঁচটায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধু ভবনের এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা

শেখ হাসিনা আপনা-আপনি শুরু হওয়া দিনাজপুরবাসীর এই আন্দোলনকে যে কোন কিছুর বিনিময়ে প্রচন্ড বিক্ষোভে রূপ দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন দিনাজপুরবাসীর এই বিক্ষোভকে নির্দলীয় খোলসে (আবরণে) রেখে খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে এই গণবিক্ষোভ আরো বেগমান, আরো চাঙ্গা করে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে খালেদা সরকারের পতন ঘটাতে হবে। এখন আর ঢাকার দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। এখন দিনাজপুর থেকেই শুরু করতে হবে এবং ঢাকায় এসে শেষ করতে হবে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ করতে হবে। লাশের পর লাশ ফেলতে হবে। পুলিশের লাশও ফেলতে হবে। যত টাকা-পয়সা লাগে নিয়ে যান। তবু এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হবে। ঐ পুলিশের মাঝে লোক আছে যাদের টাকা-পয়সা দিলে গুলি করে মানুষ মেরে লাশের স্তুপ লাগিয়ে দিবে। পুলিশের সাথেও কন্ট্রাক করবেন, টাকা-পয়সা দিবেন। মনে রাখবেন যদি এগুলো সফল করতে পারেন তাহলেই কেবলমাত্র ক্ষমতার মুখ দেখতে পারবেন। নইলে জীবনে আর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা নিতে পারবেন না। সারা দেশে যদি এসব দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লুটতরাজ, খুন-খারাবি ছড়িয়ে দিতে পারেন, তবেই একমাত্র যদি ক্ষমতার মুখ দেখেন। ইয়াসমিন মইরা এসব ঘটানোর একটা সুযোগ করে দিছে, এখন এটাকে কাজে লাগান। মনে রাখবেন এসব অবশ্যই হতে হবে নির্দলীয় ব্যানারে। আওয়ামী লীগ নামে বিন্দুবিসর্গও যেন না আসে। ফাল দিয়ে কেউ মঞ্চে যাবেন না। সব করবেন পিছন থেকে। পারতপক্ষে কোন ব্যাপারেই মুখ খুলবেন না। যদি মুখ খুলতেই হয় তাহলে দুনিয়ার যত ভালো কথা আছে তাই বলবেন। কাজে যাই হোক মুখে রাখবেন শুধু ভালো কথা। আর সত্যিই যদি একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটিতে দিতে পারেন, তাহলে আমি দিনাজপুরে আসব। কিন্তু ওখানে আপনাদের সাথে আমার কোন কথা হবে না। আমি শুধু বক্তৃতায় বলে আসব ধৈর্য ধরুন, শান্ত থাকুন ইত্যাদি জাতীয় কথা। কিন্তু আপনারা কাজ পুরোপুরি চালিয়ে যাবেন। এখন ২০ লাখ টাকা নিয়ে যান। পরিস্থিতি বুঝে বাকি যা লাগবে ওখানেই পৌছে দিব। আমি শুধু কাজ চাই। টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের গাড়িটাড়ির ব্যবস্থা আছে? নইলে আমি টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেই।

এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমসহ অন্যান্য নেতারা বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবন ত্যাগ করে চলে গেল রাত তখন আটটা। ওদিকে দিনাজপুরের অপরাধী পুলিশ ইয়াসমীন হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করলে দিনাজপুরের জনতা আরো বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার ঠিক দুই দিন পরে, এডভোকেট আব্দুর রহিম ধানমন্ডি ৫ নম্বরে (৫ নম্বর ধানমন্ডির বাসায়) ফোন করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে না

পেয়ে এই বলে ম্যাসেজ বা সংবাদ দেন যে, নেত্রীকে বলবেন এখন পর্যন্ত পুলিশের কোনো লাশ পাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এখন পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে নিহত সাত (৭) জন দিনাজপুরবাসীর লাশ পাওয়া গেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাসায় ফিরলে তাকে এই ম্যাসেজ বা সংবাদ দেয়া হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশদের আজ আর কোনো কাজ নেই বলে বিদায় করে দিয়ে, ধানমন্ডি ৮ নম্বর রোডে তার চাচাতো চাচা শেখ হাফিজুর রহমান টোকেন–এর বাসায় গিয়ে দিনাজপুরে এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমের সঙ্গে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, ঠিক আছে চালিয়ে যান। আরো জোরে চালিয়ে যান। টাকা পয়সা যা দরকার আপনি পেয়ে যাবেন। আর একটু জোরদার করেন। আমি আসছি।

অতঃপর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুর গেলেন। জনতাকে শান্ত থাকার ও ধৈর্য্য ধরার বক্তৃতা দিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে বললেন, না, যত গুড় তত মিঠা হয়নি। অর্থাৎ যত টাকা খরচ করা হয়েছে তত ফল আসেনি।

খাতা–কলম, গোলা–বারুদ ও দিগম্বর

১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সাল। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মতিঝিল শাপলা চত্বরে ছাত্রদের মহা সমাবেশের আয়োজন করেছে। মাত্র কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই মতিঝিল শাপলা চত্বরেই বিএনপি–এর ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দিয়ে ছাত্রদের মহা সমাবেশ করেছেন। ছাত্রদলের এই মহা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বক্তৃতায় বলেছেন বিরোধীদলের মোকাবেলা করার জন্য ছাত্রদলই যথেষ্ট। ছাত্রদলের ঐ মহা সমাবেশের পাল্টা মহা সমাবেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আজকের এই ছাত্রলীগের মহা সমাবেশের আয়োজন করেছেন এবং বেগম খালেদা জিয়ার ঐ বক্তৃতার পাল্টা জবাব হিসেবে শেখ হাসিনা আজ বক্তৃতা করবেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিকাল ০৪:১৫ টায় মঞ্চে উঠলেন। আজকের এই ছাত্রলীগের মহা সমাবেশের মঞ্চের একটা বিশেষ এবং উল্লেখ্যযোগ্য দিক হলো কেবলমাত্র ছাত্রলীগের নেতারা এবং একমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোন আওয়ামী লীগ নেতাদের বসার ব্যবস্থা হলো না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মঞ্চে বসলেন। আওয়ামী লীগের নেতারা মঞ্চের নিচ থেকে মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিয়ে আবার মঞ্চের নীচে চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী

দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তৃতায় ছাত্রদের লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ দেয়ার উদার আহ্বান জানালেন এবং মঞ্চে উপস্থিত ছাত্রলীগের নেতাদের হাতে খাতা-কলম তুলে দিলেন। খাতা-কলম তুলে দেয়ার মুহূর্তে ফটো সাংবাদিকের ক্যামেরা বারবার ঝলসে উঠল। তারপরের দিন দেশের প্রায় সবগুলো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় খাতা-কলম তুলে দেয়ার ছবি ছাপা হলো এবং ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়ার জন্য শেখ হাসিনার আহ্বানকে পত্রিকার শিরোনাম করা হলো। কিন্তু তার আগে ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪ শুক্রবার বিকাল ০৩:০০ টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরি কক্ষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতা অজয় কর পঙ্কজ, হিমাংসু দেবনাথ, জ্যোর্তিময় সাহা, ত্রিবেদী ভৌমিক এবং আলমসহ মোট ০৯ জনকে ডেকে এনে সামনের আন্দোলনে প্রয়োজন হবে বলে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, আগামী ২৮শে ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর তোমরা ঢাকা শহরসহ সারা দেশে নজিরবিহীন ত্রাসের সৃষ্টি করবে। খালেদা জিয়ার পতন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ৫/১০টা লাশ অবশ্যই ফেলতে হবে। নইলে খালেদা জিয়ার পতন হবে না। এর জন্য যত টাকা লাগবে তোমরা পাবে। টাকার কোনো অভাব হবে না। তোমরা গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল মজুদ গড়ে তুলবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গুলি রাখবে না। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ রেড করলে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এইসব জিনিসপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিরাপদ জায়গায় রাখবে।

আর একটা দায়িত্ব তোমরা সিরিয়াসলি পালন করবে। সেটা হলো এই যে, ইস্কাটন গার্ডেন রোড এবং ইডেন কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে যে কোয়ার্টারগুলো আছে, সেগুলো সব সচিব, উপ-সচিবদের। আমি (শেখ হাসিনা) হরতাল দিলেও এই সচিব উপ-সচিবরা পায়ে হেঁটে ঠিকই সচিবালয়ে যায়। এরপর যখন আমি হরতাল দেবো, তোমরা এদের বাসার কাছে ওঁত পেতে থাকবে, সেক্রেটারিরা (সচিবরা) হেঁটে হেঁটে সেক্রেটারিয়েট যেতে থাকবে। পথিমধ্যে তোমরা ওদের কাপড়-চোপড় খুলে ন্যাংটা করে ফেলবে।

ছাত্রলীগ নেতারা বলল, আমাদের দুই গ্রুপে ভাগ করে দেন। এক গ্রুপ গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের দায়িত্বে থাকি। আর অন্য গ্রুপ সচিবদের উলঙ্গ করার দায়িত্বে থাকুক।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন আলমকে সচিবদের নেংটা করার দায়িত্ব দিলেন।

এরপর অনেক হরতাল যায়, কিন্তু সচিবদের নেংটা করা হয় না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার পক্ষ থেকে সচিবদের কাপড় খুলে উলঙ্গ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত

আলমকে বারবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও যখন সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না, তখন তিনি (শেখ হাসিনা) ঢালাওভাবে যাকে কাছে পান তাকেই সচিবদের নেংটা করার দায়িত্ব দিতে থাকেন। কিন্তু তারপরও সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভয়ানক রেগে গেলেন এবং সচিবদের উলঙ্গ করার মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত আলমকে নগদ বিশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এই বিশ হাজার টাকা এখন দিলাম। বাকি আরো ত্রিশ হাজার টাকা সচিবদের নেংটা করার জন্য দেবো এবং পরের হরতালেই নেংটা করতে হবে। নইলে পুরা টাকা ফেরত দিতে হবে।

ঠিকই পরের হরতালেই আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের সামনে একজনকে উলঙ্গ করে ফেলল, ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নাম্বার বাড়িতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই উলঙ্গ করার সফলতার সংবাদ পৌঁছলে তিনি খুশিতে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য আলমকে ডেকে আনতে লোক পাঠান। কিন্তু আলম ততক্ষণে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। তার পরের দিন দেশের সকল সংবাদপত্রের দিগম্বর শিরোনামে ছবিসহ খবর ছাপা হয়। জানা যায়, এই উলঙ্গ বা দিগম্বরের শিকার হওয়া ব্যক্তি একজন সচিব (সেক্রেটারি) নন। তিনি বাংলাদেশের একজন অতি সাধারণ নাগরিক। গোবেচারা পাবলিক।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব

কোনো আন্দোলনে, কোনো সংগ্রামেই কাজ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একতরফাভাবে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি সপ্তম পার্লামেন্টের নেত্রী হচ্ছেন এবং ২য় বারের মতো সংবিধান অনুযায়ী সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন।

সপ্তম পার্লামেন্ট নির্বাচন বিএনপি'র পুনরায় সরকার গঠন এবং খালেদা জিয়ার পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়া কিছুতেই যখন ঠেকানো যাচ্ছে না তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৯৬ সন্ধ্যায় শেখ রেহানার ননদের গুলশানের বাড়িতে কর্নেল তারেক সিদ্দিকী (শেখ রেহানার ভাসুর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা এসেই সর্বপ্রথম তারেক সিদ্দিকীকে কর্নেল থেকে বিগ্রেডিয়ার পদোন্নতি দেন এবং তার নিজস্ব সামরিক স্টাফ নিয়োগ করেন।) এর সাথে গোপনে আলোচনা করেন এবং তারেক সিদ্দিকীর মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম)—কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে সামরিক অভ্যুত্থান করে বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার নিজের তরফ থেকে এবং তার দল আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সেনাবাহিনী প্রধান

জেনারেল নাসিমকে ক্যু করার ব্যাপারে সার্বিক নিঃশর্ত সমর্থন ও সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার পূর্ণ আশ্বাস দেন। ১৯৮২ সালে বিএনপি সরকার উৎখাত করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তখনকার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদকে যেভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে ১৯৯৬ এর মধ্য জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম (বীর বিক্রম) –কে ক্ষমতা দখল করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু এবার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম) বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রস্তাবে সায় না দিয়ে উপরন্তু বলে পাঠালেন, আমি পেশাদার সৈনিক। পেশদার সৈনিকের পেশাদার সৈনিকই থাকা উচিত এবং দেশে বর্তমানে যা চলছে তা রাজনৈতিক সংকট। রাজনীতিবিদদেরই এই রাজনৈতিক সংকট রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা ও নিরসন করতে হবে। সেনাবাহিনী এই সংকটে জড়িত হয়ে নতুন সংকট সৃষ্টি করবে না।

এরপরে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রচণ্ড হতাশ হয়ে এই দেশে আর থাকা যাবে না বলে মন্তব্য করেন।

পুলিশের লাশ চাই, মেলেটারির লাশ চাই

আজ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬। সকাল ৯ টা। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নাম্বার–এ তাঁর নিজ বাসভবনের দ্বিতীয় তলায় ভিভিআইপি ড্রয়িং রুমে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসাহাক আলী খান পান্না, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান (বর্তমানে আওয়ামী লীগ এমপি) অজয় কর পঙ্কজ, নিরঞ্জন সাহা, দিপঙ্কর, অসিম, সাধন দাস সহ মোট এগার (১১) জনকে নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই জরুরী এবং খুবই গোপন বৈঠকে বসেছেন। আসছে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এককভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নেমেছেন। জীবন-মরণ লড়াই। আজ বিকেল ০৩:০০ টায় পান্থপথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সমাবেশ এবং এই সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবন অভিমুখে মিছিল হবে। এই সমাবেশ ও মিছিলের বিষয়েই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বৈঠকে বসেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত জরুরী, অত্যান্ত গোপনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও কর্মসূচী দেয়ার জন্যই এই বৈঠকে বসেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ভীষণ চিন্তিত ও মলিন দেখাচ্ছে।

কেউ কোনো কথা বলছে না। তিনিও কোনো কথা বলছেন না। সবাই চুপ করে বসে আছে। মনে হচ্ছে যেন, যুদ্ধে পরাজিত রাজাহারা রাণী আর তার সৈনিকেরা বসে আছে। হঠাৎ কান্না বিজড়িত বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ আমার একটি ভাইও বেঁচে নেই। যদি একটি ভাইও বেঁচে থাকত, তাহলে আমি যে নির্দেশ দিতাম যে কর্মসূচী দিতাম তা অবশ্যই পালন হতো। তোমরা কি আমার ভাই হতে পার না? আমি তো তোমাদের ভাই–ই মনে করি। তোমাদের মাঝেই আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইদের খুঁজে পেতে চাই। কিন্তু তোমরা কি আমাকে বোন মনে করো? যদি তোমরা আমাকে বোন মনে করো, যদি সত্য সত্যিই তোমরা আমার হারিয়ে যাওয়া ভাই হও। তাহলে এই কঠিন দিনে, কঠিন কর্মসূচী পালন করার জন্য প্রস্তুত হও।

সকলেই আমার সাথে শপথ নেও, বলেই উপস্থিত সকলকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শপথ করালেন এবং উপস্থিত সকলেই শপথ নিল। শেখ হাসিনা শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন, " আমরা শপথ নিতেছি যে, যে কোনো ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করলাম। এবং আমরা আরো শপথ করিতেছি যে, আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার যে কোনো ধরনের নির্দেশ তা যত কঠিনই হোক না কেন জীবন দিয়ে পালন করব।"

শপথ বাক্য পাঠ শেষ হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ আমি দশ (১০) টা পুলিশের লাশ চাই। ৫(পাঁচ) টা মেলেটারির লাশ চাই।

পুলিশের লাশ চাওয়া বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নতুন কিছু নয়। অতীতে বহুবার তিনি পুলিশের লাশ চেয়েছেন। কিন্তু আজকের মতো এত আনুষ্ঠানিকতা এত নাটকীয়তা করে অতীতে কখনো তিনি পুলিশের লাশ চাননি। অতীতে তিনি (শেখ হাসিনা) মাঝে মাঝেই বলতেন, পুলিশের লাশ চাই। পুলিশের লাশ চাই। কিন্তু কাউকে নির্দিষ্ট করে বলতেন না। খুব কড়া করে বলতেন না। হঠাৎ বিড়বিড় করে কথাগুলো বলতে থাকতেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিড়বিড় করে পুলিশের লাশ চাই, পুলিশের লাশ চাই বলতে থাকলেও কেউ তা শুনত না, তা নয়। উপস্থিত সকলেই তা শুনত। কিন্তু কেউই তা গুরুত্ব দিত না এবং পালন করত না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা "পুলিশের লাশ চাই, পুলিশের লাশ চাই" কথাগুলো হাওয়ার উপর ছেড়ে দিতেন। আর উপস্থিত সকলেই তার (শেখ হাসিনার) ন্যায় হাওয়াতেই কথাগুলো মিলিয়ে যেতে দিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মন থেকেই এমন কিছু ঘটানোর জন্যই কথাগুলো বলতেন। অথচ কেউই শেখ হাসিনার কথা পালন করত না। পুলিশের লাশ ফেলত না। আর সেই জন্য আজ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ এত আনুষ্ঠানিকতা আর এত ভাব-গম্ভীর পরিবেশে শপথের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১০টা পুলিশের আর ৫টা মেলেটারির

(সেনাবাহিনীর) লাশ চাইলেন। একটা ব্রিফকেস হাতে রুমে প্রবেশ করল শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই (আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ছেলে) আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ (বর্তমানে জাতীয় সংসদের সরকারি দলের চীফ হুইপ)। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ব্রিফকেস খুলে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার নগদ ১০টা বান্ডিল মানে ৫ লক্ষ টাকা ঢেলে দিয়ে বললেন, এই নাও, যাও কর্মসূচী বাস্তবায়িত কর।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৫ নম্বরের বাসা থেকে রওনা হয়ে বিকেল ০৩:৩০ টায় পান্থপথের সমাবেশের মঞ্চে উঠলেন। সমাবেশে হাজার তিনেক লোক জমায়েত হয়েছে। তিন-চার জন নেতা বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বললেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাসভবনে মিছিল নিয়ে যাব। আপনারা সকলেই মিছিলে অংশ নিবেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা যেই এ কথা বললেন আর অমনিই চতুর্দিক থেকে বোমা-পটকা-গুলি শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে সমবেত জনতা দিগ্বিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে কে কোথায় গেল তার হদিস পাওয়া গেল না। সমাবেশস্থল ফাঁকা শুন্য হয়ে গেল। মঞ্চের নেতারা পরি কি মরি করে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাতে লাগল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে অতি কষ্টে মঞ্চ থেকে নামিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে নিয়ে যাওয়া হলো। পালানোর প্রতিযোগিতায় নেতারা কেউ কারো চেয়ে কম গেলেন না। এমনকি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেরি হচ্ছিল, এই অবস্থায় পিছনে পরে যাওয়া এক নেতা (বর্তমানে মন্ত্রী) তাকে (শেখ হাসিনাকে) ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়।

সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাসভবন অভিমুখে মিছিল কর্মসূচী ব্যর্থ হয়। পরে গোলযোগের কারণে পুলিশ সোনারগাঁ রোড, পান্থপথ, গ্রীন রোড ইত্যাদি রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিলে, কলাবাগান রোডে যানজটে আটকে পড়া বিআরটিসির দুটি দোতলা বাস, তিনটি ট্রাক, তিনি পিকাপ গাড়ি, পাঁচটি প্রাইভেট কার, চারটি বেবি ট্যাক্সি (স্কুটার) ইত্যাদিতে এবং ধানমন্ডি বত্রিশের সামনে শুক্রাবাদ পেট্রোল পাম্পে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে বঙ্গবন্ধু ভবনের স্টাফ (কর্মচারী) দিয়ে আগুন লাগিয়ে প্রতিশোধ হিসেবে জ্বালিয়ে দেয়া হলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধানমন্ডি বত্রিশের সামনে নিজ হাতে একটা স্কুটারে (বেবি ট্যাক্সি) আগুন লাগিয়ে দিলেন।

বেঈমানটা আসছে

বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি ১৫ ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিত করতে না পারায় এতদিন পর্যন্ত বিএনপির পক্ষে থাকা

রাজনৈতিক মহল, প্রশাসন ও অন্যান্যরা এখন প্রকাশ্যেই বিএনপির বিরোধিতা শুরু করে।

১৭ই ফেব্রুয়ার, ১৯৯৬। শনিবার দুপুর প্রায় ০৩:০০ টা। ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার ৫৪ নম্বরের বাড়ির উপরের তলায় ৮৬৮৭৭৯ টেলিফোনটি বেজে উঠে। ফোনটি রিসিভ করে হ্যালো বলতেই, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল হ্যালো, আমি হানিফ, হানিফ!

আমি নগরের সভাপতি হানিফ, ঢাকার মেয়র।

আস্‌সালামু আলাইকুম হানিফ ভাই, আপনি?

হ্যাঁ আমি।

আপনি কে?

আমি ....।

ও ভাল আছো ভাই? জ্বি ভালো। আমি একটু নেত্রীর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম। কথাবার্তা বলতে পারি নাই, তাই এখন একটু বলতে চাই। নেত্রীকে একটু দেয়া যায়?

জ্বী ধরেন, দেখছি নেত্রী কোথায়!

বঙ্গবন্ধু কন্যা ভাত খেয়ে বেসিনে হাত ধুচ্ছিলেন। বলা হলো, আপা মেয়র ফোন করেছে।

নেত্রী হাত মুছতে মুছতে ফোনের দিকে হেঁটে আসতে আসতে বললেন, মহিউদ্দিন ভাই তো (চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র)?

না, ঢাকার মেয়র।

শুনেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা থমকে গিয়ে আপন মনেই বলে উঠলেন, বেঈমানটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। গভীরভাবে কিছু একটা ভাবলেন। মনে হয় ফোন ধরবেন কি ধরবেন না চিন্তা করলেন। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন। ফোনটা ধরলেন, হ্যালো। না না এখানে না, এখানে না। বত্রিশে আসেন (বত্রিশ মানে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে)। পবিত্র জায়গায় আসেন। পবিত্র জায়গায় বসেই আলোচনা করি।

হ্যাঁ এক্ষুণি আসেন, হ্যাঁ, আপনি না আসা পর্যন্ত আমি আছি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা টেলিফোনটি রেখে দিয়ে বললেন, চলো চলো বত্রিশে যাই। বেঈমানটা আসতেছে। চলো বত্রিশে যাই।

সবাই মিলে ধানমন্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনে যাওয়া হলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটের বাইরে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলেন আর ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিনিট বিশেক পরেই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা লাগানো জিপ গাড়িতে করে ঢাকা সিটি করপোরেশনের

মেয়র হানিফ বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে এসে পৌঁছাল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এগিয়ে গিয়ে নিজ হাতে মেয়র হানিফের জিপের দরজা খুললেন, আর বলতে লাগলেন, এই যে আগামী দিনের এলজিআরডি মিনিস্টার। এলজিআরডি মিনিস্ট্রি ছাড়া কি ঢাকার মেয়র চলতে পারে? এলজিআরডি মিনিস্ট্রি তো আপনার। আপনিই তো এলজিআরডি মিনিস্টার। এই কথা বলতে বলতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মেয়র হানিফকে জিপ গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে উপস্থিত সকলের সাথে মেয়র হানিফকে দেখিয়ে এই যে আগামী দিনের এলজিআরডি মিনিস্টার বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মুখে এই কথা শুনে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ খুশিতে ডগমগ ডগমগ হয়ে বলল, নেত্রী যা বলেন, নেত্রী যা বলেন।

নায়ক, মন্ত্রী ও জনতার মঞ্চ

তারপ মেয়র হানিফকে বঙ্গবন্ধু ভবনের অফিস কক্ষে এনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এই মিষ্টি আনো, মিষ্টি আনো, হানিফ ভাইকে মিষ্টি খাওয়াও।

মিষ্টি খেতে খেতে বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহানায়ক, আর আপনি হলেন নায়ক। নায়ক না হলে কি চলে ? সারা দেশ, সাড়া জাতি এখন তাকিয়ে আছে নায়কের দিকে। মানে আপনার দিকে। নগরবাসি তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। আমি এই পর্যন্ত এনে দিয়েছি, এখন আপনি ফিনিশিং দেন। এখন আপনার পালা। আপনি নায়ক, আপনার হাতেই সব। আমার হাতে আর কিছু নেই। আমার যা ছিল সব আমি করেছি। আপনি মেয়র আপনিই নায়ক, এখন আপনি ফিনিশিং গোল করেন। আপনি ছাড়া ফিনিশিং হবে না। আপনার হাতেই ফিনিশিং হবে বলেই খেলা এখনো বাকি আছে।

আপনারাই তো বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু বানিয়েছেন। আপনারা যদি সেদিন আমার পিতাকে আশ্রয় না দিতেন, সাহায্য-সহযোগিতা না করতেন তাহলে কি আমার পিতা শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা হতে পারতেন? এই আপনারা ঢাকার মানুষেরা বানিয়েছেন। আজ আমি তার মেয়ে, আমাকে যদি সাহায্য না করেন আমি কি করে বড় হব? আমার ভাইয়েরা কেউ বেঁচে নেই। আপনিই আমার ভাই। আমি আপনার বোন। আমাকে আপনি সহযোগিতা করেন। আমি কখনোই আপনার কথা ভুলব না। আপনাকে ছাড়া চলব না।

ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলল, হ্যাঁ নেত্রী, আমাকে এক মাস সময় দেন, আমি খালেদা জিয়াকে ফেলে দিব।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না, না একমাস সময় দেয়া যাবে না। আপনি পনের দিনের মধ্যেই ফেলে দেন।

এই বৈঠকেই ঠিক হলো প্রেসক্লাবের সামনে স্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে এখান থেকেই যতক্ষণ বেগম খালেদা জিয়ার পতন না হয়, দিন-রাত ২৪ ঘন্টা স্থায়ীভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার। পরবর্তী সময়ে নাট্যশিল্পী ও টিভির খবর পাঠক রামেন্দ্র মজুমদার ও নাট্যশিল্পী পিযুষ বন্দোপাধ্যায় এই মঞ্চের নাম দেন জনতার মঞ্চ।

প্রেসক্লাবের সামনের এবং সচিবালয়ের উত্তরের তোপখানা রোডের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত অর্থাৎ পল্টনের মোড় থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাস্তার মাঝখানে বিশাল মঞ্চ তৈরি করে প্রতিদিন চলতে থাকল গান-বাজনা, বক্তৃতা, আবৃত্তি ইত্যাদি। এক পর্যায়ে এই মঞ্চে এসে যোগ দিলো সচিবালয়ের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারি। এ সবই চলতে লাগল ঢাকার মেয়র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ভাষায় নায়ক ও আগামী দিনের এলজিআরডি মন্ত্রী মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে।

আজ পিকনিক

এদিকে আন্তর্জাতিক দাতা দেশসমূহের চাপে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দেয়ার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করার জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারির প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনে সংবিধান সম্মতভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একদিনের জন্য সপ্তম জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডাকলেন। ২৫ মার্চ, ১৯৯৬ সকাল ১০:০০ টায় একদিনের জন্য বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংবিধান সম্মতভাবে সপ্তম জাতীয় সংসদ অধিবেশন বসল। এই সপ্তম জাতীয় সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দেয়ার জন্য সংবিধান সংশোধন করার জন্য বসেছে। সকাল ১০:০০ টায় বেগম খালেদা জিয়া সংসদ অধিবেশনে যোগ দেন। গভীর রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়া সংসদ অধিবেশনই ছিলেন।

তারপর দিন ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। সকাল পৌনে সাতটায় ধানমন্ডি ৫ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য রওনা হলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা (বেতনভুক্ত ব্যাগ বহনকারী রাম মোহন দাস–এর নামে রেজিস্ট্রি করা) তার লাল রঙয়ের নিশান পেট্রল জিপে করে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়ার সময় খুশিতে ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন, গোলাপী (খালেদা জিয়া) এখনো সংসদে বসে রয়েছে। বেটি (খালেদা জিয়া) সংসদে এখন তোর কাম কি যে তুই এখনো সংসদে বসে রইলি ?

সফরসঙ্গী একজন বলল, রূপ দেখাতে বসে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, গতকাল সকাল থেকে সারাদিন সারারাত সংসদে বসে রূপ দেখিয়েও কি গোলাপির (খালেদা জিয়া) পরান ভরে নাই যে, আজ সকাল পর্যন্তও রূপ দেখাতে সংসদে বসে রয়েছে। সংসদে গোলাপির এতক্ষণ কি কাম? সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সংশোধোন আনতে আবার ২৪ ঘন্টা সময় লাগে নাকি যে গোলাপী এখনো সংসদে বসে রয়েছে?

জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আরে গোলাপি (প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া) যে এখনো আসে নাই, আজ আমিই প্রথম মালা দেবো। স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক দেয়ার পর ঢাকার দিকে না এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাভার থেকে কালিয়াকৈর গাজীপুরের রাস্তা ধরে যেতে থাকলেন। গণকবাড়ির কাছাকাছি গিয়ে বিরাট বড় এলাকা জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি জায়গায় ঢুকলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। বেশ কিছু গাছের মাঝে ছোট একটি বাংলো টাইপের ঘর। এই ঘরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বসলেন এবং বললেন, এই গাড়ি থেকে বিরানী নামাও, আজ পিকনিক। আজ সারাদিন এখানেই কাটাব। আজ পিকনিক।

পুরাতন ঢাকার কাজী আলাউদ্দিন রোডের হাজীর বিরানীর দোকানে বিরানির অর্ডার গত রাতেই দেয়া ছিল। ঢাকা থেকে স্মৃতিসৌধে রওয়ানা হওয়ার আগে মাইক্রোবাসে করে বিরানী, প্লেট, গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে মাইক্রোবাস থেকে তা নামানো হলো। খাওয়া হলো। প্রচণ্ড হাসাহাসি হলো। গোলাপি (খালেদা জিয়া) এখানো পার্লামেন্টে বসে রয়েছে। সারাদিন সারারাত গোলাপি পার্লামেন্টে বসে বসে রূপ দেখিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমের মুখোমুখি বৈঠক

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, সপ্তম সংসদ একদিনের অধিবেশনে মিলিত হয়ে, সংবিধান সংশোধন করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান করে, সপ্তম সংসদ বিলুপ্ত বা বাতিল ঘোষণা এবং আগামী ১২ই জুন, ১৯৯৮ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর তারিখ ঘোষণা করল এবং সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হলো।

সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান (এরশাদ আমলের) অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরুদ্দিন খান (বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী) এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সালাম (বর্তমানে আওয়ামী লীগ এমপি ও রেড ক্রিসেন্ট চেয়ারম্যান) এর

মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম) এর সাথে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ঐ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যশিল্পী লুৎফুর নাহার লতা (বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী) ও তার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত মেজর নাসির সেনা প্রধান জেনারেল নাসিমের সাথে শেখ হাসিনার বৈঠকের আয়োজন করে। নাট্যশিল্পী লতা ও তার স্বামী মেজর (অবঃ) নাসির বনানীর কুলসুম ভিলা, ১১৭ বনানী, ব্লক–ই, রোড–৪ এর ছায়াঘেরা সিরামিকের ৪ তলা ভবনের ৩য় তলার বাসায় শেখ হাসিনা এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের মুখোমুখি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগামী ১২ই জুনের নির্বাচনে সেনা প্রধান জেনারেল নাসিম এবং তার সৈনিকদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জবাবে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম শেখ হাসিনাকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস নিয়ে বলেন, আপনি (শেখ হাসিনা) চাইলে এখন থেকে সেনাবাহিনী আপনার নির্দেশেই চলবে।

এর জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, এটা যদি সত্যি হয় তবে ভবিষ্যতে আমিও আপনার নির্দেশেই চলব।

এই বৈঠকের পর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম) বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পরামর্শ ও নির্দেশেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে থাকেন।

হিন্দুরা নৌকায় ভোট দেয়

১৯৯৬–এর ১২ই জুনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থী মনোনয়ন দিলো। আওয়ামীলীগও মনোনয়ন দিলো। গোপালগঞ্জের তিনটি আসন ও বাগেরহাটের দুটি আসনের মোট ভোটারের প্রায় পয়ষট্টি শতাংশ ভোটার হিন্দু সম্প্রদায় হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এই পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগ–এর নৌকা মার্কা প্রার্থী ছাড়া অন্য কোনো দলের অন্য কোনো মার্কার প্রার্থীর নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং কোনোকালেই বিজয়ী হয়নি এবং হবেও না। (১) মোকসেদপুর ও কাশিয়ানী, (২) গোপালগঞ্জ ও কাশিয়ানী (৩) টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া (৪) মোল্লার হাট ও ফকিরের হাট (৫) বইঠাঘাটা ও দাকোপ এই ৫টি (পাঁচ) আসনে যতদিন পর্যন্ত পঁয়ষট্টি শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রার্থী নৌকা মার্কায় একচেটিয়াভাবে বিজয়ী হতে থাকবে। এই পাঁচটি আসনের প্রার্থীদের এলাকায় কোনো কাজ করতে হয় না। যে কোনো প্রকারেই হোক

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কার টিকিট নিলেই সে যে কেউই হোক ৭৫% ভোটে বিজয়ী হবে। এই ৫টি আসনকে বলা হয় ভিক্ষার আসন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দয়া করে যাকে এই অঞ্চলের আসন ভিক্ষা দেবেন, তিনিই এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি বা জাতীয় সংসদ সদস্য। অর্থাৎ এমপি। এই অঞ্চলের লেখাপড়া প্রায় অজানা একজন প্রবীণ বৃদ্ধ হিন্দু লোককে কেন আওয়ামী লীগকে ভোট দেন জানতে চাইলে, ঐ প্রবীণ বৃদ্ধ হিন্দু লোকটি বলেন, আমরা আওয়ামী লীগ টিগ বুঝি না। আওয়ামী লীগকে ভোটও দেই না। আমরা ভোট দেই নৌকায়। অর্থাৎ নৌকা মার্কায় ভোট দেই।

নৌকা মার্কায় কেন ভোট দেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, নৌকায় ভোট দিব না? নৌকা যে দেবীর বাহন। মা দূর্গা দেবী এই বাহনে (নৌকা) চড়েই স্বর্গ থেকে ধরায় এসেছিলেন অসুর (পাপিষ্ঠ) কে দমন করার জন্য। আর আমরা যদি মা দূর্গার বাহন নৌকায় ভোট না দেই, তাইলে দেবীর বাহনের অমর্যাদা হবে। মা দূর্গা অভিসম্পাত দিবে। এই জন্য দেখেন না, ভোটের সময় আমরা সকলেই গিয়া মা দূর্গা দেবীকে খুশি করার জন্য মা দূর্গা মা দূর্গা বলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আসি। একজনও বাদ যাই না। সকলেই গিয়া নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে মা দূর্গা অসন্তুষ্ট হবে। আমাদের অমঙ্গল হবে। তাই যত কাজকাম থাকুক, যত ঝামেলাই থাকুক, কোন রকমে শুধু ভোট কেন্দ্রে যেতে পারলেই হলো। আমার সকলেই গিয়া নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আসব।

রাজাকারের কাছে আসন বিক্রি

এই অঞ্চলের ৫টি আসনের ৩টি আসনে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা স্বয়ং। আর ১টি আসনে শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই শেখ সেলিম এবং মোকশেদপুর–কাশিয়ানীর অপর আসনটিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বহুবার কথা দিয়েছেন। নিজের থেকেই যেচে পড়ে কথা দিয়েছেন।

মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে নানা ধরনের কাজ দিয়েছে, আর কাজ শেষে প্রতিবারই বলেছেন, তোমাকেই আমি (শেখ হাসিনা) মোকশেদপুর–কাশিয়ানীর এমপি বানাব।

কিন্তু না, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কথা রাখলেন না। ওয়াদা রাখলেন না। কথা দিয়েও তিনি (বঙ্গবন্ধু কন্যা) কথা রক্ষা করলেন না। ওয়াদা করে ওয়াদার বরখেলাপ করলেন। ওয়াদা ভঙ্গ করলেন। যদিও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বক্তৃতায় অসংখ্যবার বেগম জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন, ওয়াদা ভঙ্গকারীকে আল্লাহ পছন্দ করে না। শুধু মতিয়ুর রহমান রেন্টু কেন? বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মনোনয়ন দিলেন না, সাবেন ছাত্রনেতা, ত্যাগী এবং সৎ নেতা ইসমত কাদির গামা, আবুল হাসান, মুকুল

বোস এদের কাউকেই তিনি মোকশেদপুর–কাশিয়ানী থেকে মনোনয়ন দিলেন না। তিনি মনোনয়ন দিলেন এমন একজনকে যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র রাজাকারীর অভিযোগ আছে। কথিত আছে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর যোগসাজশে সশস্ত্র রাজাকার হয়েছিল। তাদের বাড়িতে রাজাকারের ক্যাম্প বানিয়েছিল এবং ঐ অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ে অনেক বাড়িঘর জ্বালিয়েছিল। তিনি (লেঃ কর্নেল ফারুক) প্রখ্যাত মুসলীম লীগ নেতা সালাম খানের দূর সম্পর্কের ভাতিজা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি রাজাকারীর অভিযোগে বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। পরবর্তী কোনো এক সময়ে সম্ভবত ১৯৭২–৭৩ সালে যশোর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। ২০/২৫ বছর সেনাবাহিনীতে চাকরি করে জেনারেল এরশাদের সাথে লাইন করে সাপ্লাই কোরে পোস্টিং নিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা কামান। মতিয়ুর রহমান রেন্টু, ইসমত কাদির গামা, আবুল হাসান, মুকুল বোস এরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধা ও ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মোকশেদপুর–কাশিয়ানী থেকে মনোনয়ন দিলেন '৭১–এর রাজাকার এলপিআর–এ আসা লেঃ কর্নেল ফারুক খানকে। কিন্তু কেন? সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় অসৎ পথে উপার্জিত অর্থ থেকে লেঃ কর্নেল ফারুক খান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এক কোটি টাকা দেন এবং এই নগদ এক কোটি টাকার বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মোকশেদপুর–কাশিয়ানী আসনটি এলপিআর–এ আসা লেঃ কর্নেল রাজাকার ফারুক খানের কাছে বিক্রি করেন।

হিন্দুরাই আমার বল-ভরসা

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যেদিন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ঘোষণা করলেন, সেদিন তিনি নিজে মোট ৪টি আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দেন। গোপালগঞ্জের ১টি, বাগেরহাটের ২টি এবং ঢাকার ডেমরা থেকে ১টি। এই মোট ৪টি আসন থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেন। কিন্তু ঘোষনা দেয়ার পরের দিনই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঢাকার ডেমরা আসন থেকে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিলে, ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে কয়েকজন নেতা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করে বলেন, আপনি গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাটের (টুঙ্গিপাড়া মধুমতি নদীর অপরপাড়) ৩টি আসন থেকে দাঁড়ালেন অথচ ঢাকার একটি আসন থেকেও নির্বাচনে দাঁড়ালেন না। ৫টি আসন থেকে তো আপনি দাঁড়াতে পারেনই। খালেদা জিয়া ৫টি আসন

থেকে দাঁড়িয়েছে; আপনিও ৫টি আসন থেকে দাঁড়ান। আপনি আমাদের নেত্রী, আপনি অন্তত ঢাকার ২টি আসন থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান।

জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, গোপালগঞ্জে আর বাগেরহাটে তো ৭০% (সত্তর শতাংশ) হিন্দু আছে; ঢাকার কত পার্সেন্ট হিন্দু আছে? হিন্দুরা ছাড়া মুসলমানরা আমাকে ভোট দেয় না। মুসলমানরা বেঈমান ও অকৃতজ্ঞ। হিন্দুরা ঈমানদার ও কৃতজ্ঞ। আমি হিন্দুদের উপর ভরসা করতে পারি, বিশ্বাস রাখতে পারি। কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস করা যায় না। ভরসা করা যায় না। এই জন্যই তো আমি সত্তর শতাংশ হিন্দুদের অঞ্চল গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাট থেকে ৩ (তিনটি) আসনে দাঁড়িয়েছি। কিন্ত ঢাকা থেকে ১টি (এক) আসনেও দাঁড়াইনি। যা-ও ডেমরা থেকে দাঁড়িয়েছিলাম খোঁজ-খবর নিয়ে দেখলাম, ডেমরায় তেমন হিন্দু নাই, তাই প্রত্যাহার করে নিয়েছি। ঢাকার মেয়র হানিফ বললেন, এটা আপনার ভুল ধারণা। মুসলমানেরা ভোট না দিলে আপনার অন্যান্য প্রার্থীরা জিতে কীভাবে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, মুলতঃ হিন্দুদের ব্যাংক ভোটটা পুরাটা যায়, বাকি আত্মীয়-স্বজন নিজস্ব লোক-লস্কর দিয়ে গুতিয়ে-গাতিয়ে কোন রকমে বেরিয়ে আসে। হিন্দুরা না থাকলে আমি, আমার দল ১টি (এক) আসনেও জিততে পারতাম না। হিন্দুরা যাতে নিরাপদে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে এই জন্যই তো আমি এত আন্দোলন-সংগ্রাম করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আদায় করেছি। হিন্দুরাই আমার বল। হিন্দুরাই আমার ভরসা।

নির্বাচনী প্রচারের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সারা দেশ পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, ব্যানারে এবং দেয়াল লিখনে ছেয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু খালি জায়গা নেই। প্রতিদিন-প্রতিরাত চলছে মিটিং আর মিছিল।

সৈন্য নামানোর নির্দেশ দিয়ে চম্পট

১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে নাট্যশিল্পী লুৎফর নাহার লতার মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, ২৫ মার্চ, ১৯৯৬ সপ্তম পার্লামেন্ট ২৪ ঘন্টারও বেশি বিরতিহীন অধিবেশনে সংবিধান এর যে সংশোধোনী আনা হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রপতির হাতে সেনাবাহিনীর সকল কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনীর সকল কর্তৃত্ব বিএনপি'র বর্তমান রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে দেয়া হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কাছে এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নাসিমের কাছে সেনাবাহিনীর কোনো কর্তৃত্বই নেই। এই সংবাদ শোনার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, ও, এই

জন্যই খালেদা জিয়া দিন-রাত পার্লামেন্টে বসেছিল। খালেদা জিয়া ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে সংসদ অধিবেশনে বসে থেকে এই কুকীর্তিই করেছে। আমি তো আগে বুঝিনি, আগে চিন্তা করিনি।

এরপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উত্তেজিত হয়ে বলেন, কিসের সংবিধান? কিসের সংশোধনী? আমি যা বলব জেনারেল নাসিমকে তাই করতে হবে। জেনারেল নাসিম আমাকে কথা দিয়েছে, আমি যা বলব, আমি যে নির্দেশ দেবো নাসিম সেভাবেই সেনাবাহিনী চালাবে। লতা (লুৎফর নাহার লতা) তুমি যাও, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে বলো আমি যেভাবে বলব, যা বলব সে যেন সেভাবেই তা করে। বাকি সব দায়-দায়িত্ব আমার, আমিই বুঝব। সংবিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনীর পুরো কর্তৃত্ব ও দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের। কিন্তু সেনবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম (বীর বিক্রম) প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে লাগলেন। দ্বৈত নির্দেশনার কারণে ভেতরে ভেতরে সেনাবাহিনীতে সংকট সৃষ্টি হলো। রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস সেনা কর্মকর্তাদের কোনো নির্দেশ দিলে, সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে তার বিপরীত নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমনকি রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস কোনো সেনা কর্মকর্তাকে বদলির নির্দেশ দিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে জেনারেল নাসিম পাল্টা বদলির নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। সেনাবাহিনীর ভেতরকার সংকট আরো ঘনিভূত হয়ে সংঘাতের দিকে যেতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৮ই মে, ১৮৯৬ বগুড়া সেনানিবাসের (ক্যান্টনমেন্টের) জিওসি মেজর জেনারেল গোলাম হেলাল মোরশেদ খান বিবিপিএসসি এবং বিডিআর এর উপ-পরিচালক বিগ্রেডিয়ার মিরণ হামিদুর রহমানকে অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর দান করেন। (এই অবসর নেয়া উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল এর আত্মীয়) পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ৪ জন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাকে অবসর দেয়ার নির্দেশ দিলে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম (শেখ হাসিনার নির্দেশ মতো) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূইয়া, বিগ্রেডিয়ার আব্দুর রহিম ও কর্নেল আব্দুস সালাম এই ৪জন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাকে অবসরের নির্দেশ দেন। ফলে সংঘাত চরম আকার ধারণ করে সশস্ত্র বাহিনী চ্যালেঞ্জ পাল্টা চ্যালেঞ্জে চলে গেলো। সাংবিধানিকভাবে সেনাবহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে অবসর দানের সিদ্ধান্ত নিলে, ১৯শে মে, ১৯৯৬ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমকে তার (নাসিমের) সমর্থনে সারা দেশ থেকে ঢাকায় সেনাবাহিনী মার্চ করানো (নিয়ে আসার) নির্দেশ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ

হাসিনার এই নির্দেশ পাওয়ার পর সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম ১৯শে মে দিবাগত রাত ০২:০০ টার পর (ঘড়ির কাটা অনুযায়ী ২০শে মে রাত রাত ০২:০০ টা) ঢাকার বাইরে সমস্ত সেনা ইউনিটকে তার সমর্থনে ঢাকায় মার্চ (চলে আসার) করার নির্দেশ দেন।

এর কয়েক ঘন্টা পরে ২০শে মে সকাল ০৮:০০ টায় বেসরকারি বিমান এ্যারো বেঙ্গলে করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে অবহিত না করে চুপিসারে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। এদিকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের নির্দেশ পেয়ে বগুড়া, রংপুর, যশোর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাবাহিনী ঢাকার দিকে রওনা হয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম এর নির্দেশ এবং সমর্থনে ঢাকার বাহিরে থেকে আসা সৈনিকদের মূল নেতৃত্বে দেন ময়মনসিংহ বিগ্রেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর রহমান এবং বগুড়া বিগ্রেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার শফি মেহবুব। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে বরখাস্ত করে সিজিএস (চিফ অব জেনারেল স্টাফ) মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদোন্নতি দিয়ে নতুন সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম তার বরখাস্তে আদেশ এবং নতুন সেনাবাহিনী প্রধান পদে জেনারেল মাহ্বুবুর রহমান এর নিয়োগ প্রত্যাখান করে নিজেকেই সেনাবাহিনী প্রধান দাবি করতে থাকেন এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে বার যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকেন।

ওদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের বর্তমান এমপি ও শেখ পরিবারের ব্যবসায়িক পার্টনার ডাঃ ইকবালের এ্যারো বেঙ্গলে করে কক্সবাজার পৌঁছে কক্সবাজারের আপার সার্কিট (পাহাড়ের উপরে যে সার্কিট হাউস) হাউজে বসে সাগরের পানে তাকিয়ে সাগরের ঢেউ দেখছেন। আর চা খাওয়ার সাথে মাঝে মাঝে একটু করে ফেনসিডিল খাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অবশ্য আগে কখনো ফেনসিডিল খেতেন না। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে ২৯ নম্বর মিন্টো রোডের সরকারি বাসায় ওঠার পর থেকেই সর্দি-কাশি লেগেই থাকত, ঘুম হতো না। নাক দিয়ে সব সময় পানি ঝরত। মাথা ব্যাথা করত, টেনশনে ঘুম হতো না। বিশেষ করে বক্তৃতা দেয়ার সময় গলা ভেঙ্গে যেত। বক্তৃতা দেয়ার সময় গলা বসে যাওয়া ছিল সব চেয়ে বড় অসুবিধা। ডাঃ এস, এ মালেক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা) অনেক হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইয়েছেন। ডাঃ এস, এ মালেকের কাছ থেকে শত শত শিশি হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেয়েও কোন ফল হচ্ছিল না। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভালো হচ্ছিলেন না। ডাঃ মালেক এই সকল

ঔষধের জন্য কোনো পয়সা নিতেন না, যদি পয়সা নিতেন তাহলে নিশ্চিত বলা যেত পয়সা নেয়ার জন্যই ডাঃ মালেক অযথা নেত্রীকে ঐসব ঔষধ খাওয়াচ্ছেন। ডাঃ মালেকের হোমিওপ্যাথি ঔষধের সাথে চলত তুলসি পাতার রস, জেষ্ঠিমধু। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। অবশেষে একদিন ডাঃ এস, এ মালেক এক বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল নিয়ে এলেন এবং বঙ্গবন্ধু কন্যাকে বললেন, নেত্রী ২ চামুচ করে দিনে ৩ বার এই ঔষধ খান, দেখবেন সর্দি চলে যাবে, খুশখুশি কাশ চলে যাবে, গলা ভাঙ্গবে না, মাথা ধরা চলে যাবে। রাতে ভালো ঘুম হবে।

একজন বলল, হায় হায় এটা তো ফেনসিডিল, আপা এটা খেয়ে মানুষ নেশা করে। মালেক ভাই এটা আপনি কি আনলেন ?

ডাঃ এস, এ মালেক বললেন, রাখো তোমাদের কথাবার্তা। নেত্রী এই ঔষধ আমাদের দেশে ছিল। আমরা কত প্রেসক্রাইব করেছি। এটা খুবই কার্যকরি এবং ভালো ঔষধ। এরশাদ আমলে শুধু শুধু এই ঔষধটা ব্যান্ড (নিষিদ্ধ) করেছে। নেত্রী আপনি খেয়ে দেখেন, যদি আপনার অসুবিধা দূর না হয়েছে, তবে আমাকে বলবেন।

এটা ১৯৯২ সালের প্রথম দিকে কথা। এরপর থেকে ২ চামচ করে দিনে ৩ বার, আর যেদিন মিটিং থাকে, জনসভা থাকে, বক্তৃতা থাকে সেদিন ৫/৬ চামচ করে দিনে ৩/৪ বার এমনকি চায়ের লিকারের সাথে মিশিয়ে জনসভা মঞ্চে নিয়ে গলা ঠিক রাখার জন্য বক্তৃতার আগমুহূর্ত পর্যন্ত। লম্বা বক্তৃতা হলে বক্তৃতার মাঝেও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ফেনসিডিল খেতে লাগলেন।

এভাবে বছর দুই/তিন নেত্রী নিয়মিত প্রতিদিন ফেনসিডিল খেলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আর ফেনসিডিল ছাড়তে পারলেন না। যখনই তিনি ফেনসিডিল ছেড়েছেন তখনই পুরনো সেই রোগ-ব্যাধি, সর্দি, গলা খুশখুশ, বক্তৃতার সময় গলা ভেঙ্গে যাওয়া, ঘুম না হওয়া ইত্যাদি আবার পেয়ে বসে। তাই ডাঃ এস, এ মালেক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে নিয়মিত ফেনসিডিল দিতে থাকলেন আর নেত্রীও খেতে থাকলেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য জিজ্ঞেস করা হলো, আপা ঢাকার খবর কি?

নেত্রী কাব্যিক সুরে বললেন, কেউ কারো নাহি ছাড়ে সমানে সমান।

তারপর বললেন, দিয়ে এসেছি লাগিয়ে যা হয় হোক। আজ নেত্রীর অনেকগুলো পথসভা আছে। পথসভা মানে রাস্তার ধারে জনসভা। নেত্রীর আজ অনেক বক্তৃতা করতে হবে। গলা গরম রাখতে হবে। গলা বসে গেলে বা ভেঙ্গে বক্তৃতা চলবে না। আবার ওদিকে ঢাকার পরিস্থিতি গরম। তাই আজ একটু বেশি ফেনসিডিল খেতে হচ্ছে। বেলা ১১টায় কক্সবাজার এর জনসভা শুরু হলো। এর মধ্যে ঢাকার পরিস্থিতির গুরুতর অবনতির ঘটনার সংবাদ এলো। রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস এবং

জেনারেল নাসিমের এই সংঘাতে ঢাকা ক্যান্টেনমেন্ট কার নিয়ন্ত্রণে এটা বুঝা যাচ্ছে না। তবে সাভার ও গাজীপুর ক্যান্টেনমেন্ট যে রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের পক্ষে এটা বোঝা গেল এই কারণেই যে, জেনারেল নাসিমের নির্দেশে ঢাকা অভিমুখে আসা যশোর, রংপুর, বগুড়া এবং ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকদের প্রতিরোধ করার জন্য নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান এর নির্দেশে সাভার ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকরা আরিচাঘাটে অবস্থান নেয় এবং ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় ও নদী পার হওয়ার অপেক্ষায় থাকা দৌলদিয়া ঘাটের এবং নগরবাড়ি ঘাটের সৈনিকদের নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে ডুবিয়ে দেয়া হবে বলে ওয়ারলেসের মাধ্যমে হুঁশিয়ার করে দেয়। এদিকে ময়মনসিংহ থেকে আসা সৈনিকদের রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে গাজীপুরের সৈনিকেরা আটকিয়ে দেয়। কুমিল্লার ময়নামতি, চিটাগাং, বান্দরবান প্রভৃতি ক্যান্টেনমেন্টের অবস্থা বুঝা যায় না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে ৭টি পথসভায় বক্তৃতা করেছেন। ঢাকা থেকে খবর এলো ঢাকার রাস্তায় ট্যাঙ্ক নেমেছে। কিন্তু কার পক্ষে নেমেছে ? অর্থাৎ লড়াইয়ে কে জিতেছে? জেনারেল নাসিম? না রাষ্ট্রতি রহমান বিশ্বাস? এটা কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া গেল না। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পথসভার কর্মসূচী বাতিল করে দেন এবং কোথায় পালাবেন সেই চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেউ বলেন টেকনাফে, কেউ বলেন বান্দরবানে, কেউ বলেন চিটাগাং–এ।

আওয়ামী লীগের বান্দরবানের বর্তমান এমপি বীর বাহাদুর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বান্দরবানে নিয়ে যেতে থাকলে চিটাগাং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহিউদ্দিন, বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী মান্নান, বিমান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন শেখ হাসিনাসহ সকলকে চিটাগাং সার্কিট হাউসে নিয়ে তুলেন। চিটাগাং সার্কিট হাউসের ভিভিআই রুমে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, মেয়র মহিউদ্দিন, চিটাগাং আওয়ামীলীগ সভাপতি বর্তমান শ্রমমন্ত্রী মান্নান, কেন্দ্রীয় নেত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ মোস্তফা মহিউদ্দিন জালালসহ কয়েকজন বসে টেলিভিশন দেখছেন। দেশের এই সংকট মুহূর্তে করণীয় কী সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বেমালুম নিশ্চুপ। টেলিভিশন দেখা ছাড়া এই সংকটময় মুহূর্তে আর যেন কোনো কাজ নেই। শুধু ঢাকায় একটা ফোন করে শেখ রেহানাকে বাসা ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকার কথা বলেই তিনি নিশ্চুপ, নির্বিকার। এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন জিজ্ঞেস করল, নেত্রী আমাদের করণীয় কি ?

নেত্রী উত্তরে আমতা আমতা করলেন। ঢাকা থেকে আসা নেত্রীর সফরসঙ্গী মোটর সাইকেল আরোহী বলল, আমাদের এখন উচিত জেনারেল নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করা।

এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন জানতে চাইলেন, কি জন্য জেনারেল নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করা উচিত?

এই জন্য মিছিল বের করা উচিত, জেনারেল নাসিম বিএনপি'এর রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ মানে বিএনপি'র প্রতিপক্ষ।

জেনারেল নাসিমকে সেনাবাহিনী প্রধান করে রাখতে পারলে সেনাবাহিনীতে চেক এন্ড ব্যালেন্স থাকবে। আর জেনারেল নাসিমের পতন ঘটলে বিএনপি'র রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের সেনাবাহিনীর উপর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে আগামী ১২ই জুনের নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে। ঠিক আছে, নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করেন, বলেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বেডরুমে ডুকে পড়লেন। চিটাগাংয়ের মেয়র মহিউদ্দিন, সভাপতি মান্নান মিছিল বের করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে, তাদের মিছিল বের করার জন্য চাপাচাপি করলে তারা বলেন, এখন কোথায় লোকজন পাব, মিছিলের শ্লোগান কি হবে ?

ঢাকা থেকে আগত নেত্রীর সফরসঙ্গী মোটর সাইকেল আরোহী বলল, যে কোনো কিছুর বিনিময়েই মিছিল করতে হবে। নইলে ১২ই জুনের নির্বাচনে আবার ক্ষমতায় যেতে চান? জেনারেল নাসিম যদি নাও টিকে, নাসিমের যদি পতনও হয় তথাপি মিছিল বের করে প্রোটেষ্ট (প্রতিবাদ) বজায় রাখতে হবে। আপনারা মিছিল বের করেন। মিছিলে শ্লোগান দেবেন, জেনারেল নাসিম জিন্দাবাদ, রহমান বিশ্বাস নিপাত যাক। এ পর্যায়ে মহিউদ্দিন আর মান্নান বাইরে গিয়ে কয়েকজন লোকের একটা মিছিল বের করে সার্কিট হাউজের চারপাশে ঘুরল। টেলিভিশনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের ভাষণ শুরু হলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভাষণ শুনে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোথায়? হাবিবুর রহমান কোথায়? খালেদা জিয়া ২৪ ঘন্টা সংসদে বসে থেকে এমনভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে যে, ক্ষমতা আসলে ওদের হাতেই রয়ে গেছে। আমরা তার কিছুই বুঝিনি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আবার বেডরুমে চলে গেলেন। ঢাকা থেকে আগত সফরসঙ্গী মোটর সাইকেল আরোহী ঢাকায় ফোন করে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যাও আওয়ামী লীগ অফিসে এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাসায়। গিয়ে বলো বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন, মিছিল বের করতে এবং মিছিলে শ্লোগান দিবে জেনারেল নাসিম জিন্দাবাদ। রহমান বিশ্বাস নিপাত যাক।

হঠাৎ বেডরুমের রিসিভার থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন এ-ই-এ-ই-এই।

তারপর চুপ আর কিছুই বললেন না। অর্থাৎ নেত্রী বেডরুমের রিসিভার তুলে এতক্ষণ কথাগুলি আড়ি পেতে শুনছিলেন। টেলিভিশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের বক্তৃতা নেত্রী শুনলেন এবং আবার বেডরুমে চলে

গেলেন। বেডরুমে গিয়ে নজিব ও বাহাউদ্দিন নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সার্কিট হাউজ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিলে তিনি বলেন, আমি কোথায় যাব? তার চেয়ে দেখ কি হয়। বলেই শেখ হাসিনা পুরো আধা বোতল ফেনসিডিল খেয়ে শুয়ে পরলেন।

মাঝরাতে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, জেনারেল নাসিম এ লড়াইয়ে পরাজিত।

সকালবেলা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নাসিম পরাজিত হয়েছে ভালো হয়েছে। ওকে (নাসিমকে) আমি ফেব্রুয়ারি মাসে ক্ষমতা নিতে বলেছিলাম ও তখন ভাব দেখিয়েছে। পরাজিত হয়েছে ঠিক হয়েছে।

সকাল ০৯:০০ টার ফ্লাইটে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরলেন। সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম) বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার হলেন। এরপর থেকে আর কোনোদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমের নাম বিন্দু-বিসর্গও উচ্চারণ করলেন না।

আবু হেনার আগমণ

১২ই জুন, ১৯৯৬। নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নর-নারী নির্বেশেষে জনগণ স্বতৃঃস্ফুর্তভাবে হাসতে হাসতে ভোট কেন্দ্রে গেল, হাসতে হাসতে নিজেদের ভোট দিলো। আবার হাসতে হাসতেই ঘরে ফিরে এলো। সন্ধ্যার পর বাংলাদেশ বাংলাদেশ টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শুরু হলো। প্রথম দিকে দেখা যায় আওয়ামী লীগ বেশ এগিয়ে রয়েছে। রাত ১০:০০ টার পর আবার দেখা যায় বিএনপি বেশ এগিয়ে রয়েছে।

প্রথম দিকের ঘোষিত নির্বাচনী ফলাফলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাসহ উপস্থিত সকলেই বেশ পুলকিত হতে থাকেন। কিন্তু রাত ১০:০০ টার পরের ঘোষিত ফলাফলে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন।

রাত প্রায় ১২:০০ টার দিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার উপর হামলা হতে পারে এই কথা বলে তার বাসায় উপস্থিত সকলকে চলে যেতে বলেন। বাইরের সকলে চলে যাওয়ার ফলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাসাটি নীরব হয়ে যায়। রাত ০১:০০ টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেনা অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিননার বাসায় আসেন এবং প্রায় এক ঘন্টা একান্ত গোপন বৈঠক শেষে চলে যান।

ঐক্যমতের সরকার

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেল অন্যান্য দলের চেয়ে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি সিট পেয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হিসেব করে দেখলেন বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত এবং জাসদ (রবের) আ, স, ম রব যদি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে আওয়ামী লীগের চাইতে ১টি সিট বেশি হয়ে যায়। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ১টি সিট কম হয়। সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, আর জাসদের আ, স, ম রব এই জোট বা সম্মিলিত দলগুলো সরকার গঠন করতে পারে এবং সংসদের সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা সিট অনায়াসে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই হিসেব-নিকেশের পর শুধু বলতে থাকেন, আবু হেনা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) আমার সাথে ছলনা করল? প্রতারণা করল? কথা রাখল না, কথা মতো কাজ করল না।

এর পর ১৫ই জুন সন্ধ্যাবেলায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাসদ নেতা এবং জাসদের একমাত্র নির্বাচিত সংসদ সদস্য আ, স, ম রবকে যে কোনো প্রকারে ছলে বলে কৌশলে তার (শেখ হাসিনার) বাসায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। স্বৈরাচারী এরশাদের ১৯৮৮ সালে পার্লামেন্টের গৃহপালিত বিরোধী দলীয় নেতা সম্মিলিত ওয়াচ ডক আ, স, ম রবকে এই সংবাদ দিলে মনে হলো তিনি এমন একটি সংবাদের জন্য চাতক পাখির ন্যায় অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলার সঙ্গে সঙ্গে আ, স, ম রব এমপি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িতে ছুটে চলে আসেন। ২য় তলার ভিভিআইপি রুমে আ, স, ম রব এমপিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বসতে দিলেন, মিষ্টি খাওয়ালেন। তারপর বললেন, রব ভাই আপনারাই দেশ স্বাধীন করেছেন। বাংলাদেশ বানিয়েছেন। আপনারাই তো আমার পিতাকে শেখ মুজিবর থেকে বঙ্গবন্ধু বানিয়েছেন। সাড়া বিশ্বে পরিচিতি দিয়েছেন, এসবের মূলে ব্যক্তিগতভাবে আপনার অবদানই রয়েছে সব চাইতে বেশি।

আ, স, ম রব বলেন, আপনি তো তখন রাজনীতিতে ছিলেন না, কাজেই আপনি জানেন না, আমরা কখনোই বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করতে চাইনি। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে তো কখনোই বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করিনি। বঙ্গবন্ধুর চারপাশে যারা ছিল এবং আমার সাথের গুটিকয়েক, এরাই আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসলে বঙ্গবন্ধুই আমাদের প্রকৃত নেতা ছিলেন। আর আমরাই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত লোক ছিলাম।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, হ্যাঁ রব ভাই, আপনারাই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত লোক। তাই তো আমি আপনাদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করতে চাই। আমরা সকলে মিলে সরকার গঠন করে দেশ চালাতে চাই।

আ, স, ম রব বললেন, মনের দিক থেকে তো অনেক আগেই আমি আপনার (শেখ হাসিনার) নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার প্রস্তুতি নিয়ে আছি এবং এতেদিন তো কেবল আপনার ডাকের অপেক্ষায়ই ছিলাম।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনার বিশ্বাসের অমর্যাদা করব না।

আ, স, ম রব বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমার কোনো ঘাটতি নেই। আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা, আপনাকে কি অবিশ্বাস করা যায় ?

উপস্থিত নজিব আহম্মেদ নজিব, বাহাউদ্দিন নাসিম, নকিব আহমেদ মানু, কানিজ আহাম্মেদ (এরা সবাই শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইদের ছেলে) রাম মোহন দাস, মৃণাল কান্তি দাস, আনাম, সেন্টুদের দিকে তাকিয়ে আ, স, ম রব বললেন, আমি নেত্রীর সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলকে বললেন, তোমরা এখন বাইরে যাও।

সবাই বাইরে চলে এলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আর জাসদ নেতা আ, স, ম রব ভিতরে একান্তে কথা বলছেন। মিনিট পাঁচেক পরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কলম এবং ২টি কাগজ চাইলেন। ১টি কলম এবং ২টি কাগজ ভেতরে দেয়া হলো। বাইরে থেকে বোঝা গেল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং জাসদ নেতা আ, স, ম রব নিজেদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তিনামা করলেন। মিনিট ১৫ পরে আ, স, ম রব চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঘোষনা করলেন আ, স, ম রবকে ম্যানেজ করা গেছে, এবার হয়ত সরকার গঠন করতে পারব।

পরের দিন সকালে রাম মোহন দাস একটি হিসেব নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বুঝালেন যে, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়তে ইসলাম, জাসদ রব এবং একমাত্র স্বতন্ত্র এমপি কুষ্টিয়ার মকবুল হোসেনও যদি একজোটভূক্ত হয় তাহলেও আওয়ামী লীগ–এর সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে এবং আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারে। কারণ একাধিক আসন থেকে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের সংবিধান অনুযায়ী শপথ নেয়ার পূর্ব ১টি (এক) মাত্র আসন বা সিট রেখে বাকি আসন বা সিট ছেড়ে দিতে হবে এবং ছেড়ে দেয়া সেই আসন বা সিট শূন্য ঘোষিত হবে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি যতগুলো আসন বা সিট থেকেই বিজয়ী হোক না কেন, এক ব্যক্তিকে একজন

এমপিই হতে হবে এবং একজন এমপি হিসেবেই ধরা হবে। সেদিক থেকে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জাসদ, জামায়ত এবং স্বতন্ত্র জোটের আসন বা সিট ছাড়তে হয়, ১১টি (এগার) আওয়ামী লীগের ৪টি (চার)। শপথ নেয়ার পূর্বে ছেড়ে দেয়া আসন বাদ দিয়ে হিসেব করলে দেখা যায় আওয়ামী লীগের একারই উল্লিখিত জোটের চাইতে ১টি (এক) আসন বেশি থাকে। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই হিসেব বোঝার পর বলে উঠেন, ওরে হারামজাদা আগে কই ছিলি? আগে কই ছিলি? এখন সব শেষ। এখন সব শেষ। রব ভাওতাবাজি দিয়ে আমার কাছ থেকে লিখিত নিয়ে গেছে। এখন আর তা পাল্টানো যাবে না। হারামজাদারা আগে কি করলি? এখন কি করি? রবের কাছে আমার লিখিত আছে।

এই হলো বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐক্যমত্যের সরকারের প্রকৃত উৎপত্তি এবং জাসদ নেতা আ, স, ম রব মন্ত্রী।

রওশন এরশাদের পা ধরা

১৯ শে জুন, ১৯৯৬। সন্ধ্যা ০৭:০০ টায় সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ–স্ত্রী রওশন এরশাদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে তার ধানমন্ডি ৫ নম্বর বাড়িতে দেখা করলেন। ২য় তলার ভিভিআইপি রুমে মুখোমুখি সোফায় বসেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আর সাবেক ফাস্টলেডি রওশন এরশাদ। দু'জনের মাঝে ৫ ফিটের মতো দূরত্ব। রওশন এরশাদ বললেন, আপা (শেখ হাসিনা) আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ, আপনি জাতীয় পার্টি থেকে জিন্নাত মুশারফকে মহিলা এমপি বানাবেন না।

শেখ হাসিনা বললেন, এটা আপনাদের ব্যাপার। আপনারা যাকে দিবেন আমি তাকেই মহিলা এমপি বানাব।

রওশন এরশাদ বললেন, আপা, আপনি আমার বোন, আপনিও মহিলা, আপনারও স্বামী আছে। আপনি বোন হিসেবে আমার প্রতি দয়া করেন। সবই আপনার হাতে। আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করুন। ঐ চরিত্রভ্রষ্টা জিন্নাত মুশারফকে দয়া করে আপনি মহিলা এমপি বানাবেন না। প্রয়োজনে আপনি জাতীয় পার্টি থেকে একটিও মহিলা এমপি বানাবেন না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না না আমি জাতীয় পার্টিকে ২টি এবং জামায়াতকে ১টি মহিলা এমপি দেবো।

রওশন এরশাদ বললেন, তাহলে আর যাই হোক, জিন্নাতকে এমপি করবেন না।

শেখ হাসিনা বললেন, বললাম তো এটা আপনাদের ব্যাপার।

রওশন এরশাদ সোফা থেকে উঠে সোজা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আপা আপনি আমার বোন, আপনি দয়া করে আমাকে এই মুসিবতে ফেলবেন না। আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে উদ্ধার করুন।

শেখ হাসিনা বললেন, আরে কি করছেন, কি করছেন। ঠিক আছে, পা ছাড়ুন, পা ছাড়ুন আমি দেখব।

রওশন এরশাদ বললেন, আপা আপনি কথা দেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক আছে আমি জিন্নাতকে এমপি বানাব না।

অতঃপর রওশন এরশাদ ভিভিআইপি রুমের পশ্চিম পার্শ্বের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির ধারে যেতে না যেতেই ভিভিআইপি রুমের উত্তর দিকের দরজা দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বেরিয়ে ডাইনিং রুমে এসে নাচতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, কাউরে ছাড়ুম না। লাগাইয়া দিমু। কাউরে ছাড়ুম না। জিন্নাত মুশারফকে এমপি বানাবই।

বোরখাওয়ালীদের সিট

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া পতন আন্দোলনে একাত্তর ('৭১) এর যুদ্ধ অপরাধী ঘাতক গোলাম আযম ও তার দল জামায়তে ইসলামীর সাথে গভীর রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনার বেয়াই (শেখ হাসিনার মেয়ে পুতুলের শ্বশুর) মোশাররফ হোসেনের উত্তরার বাড়িতে জামায়তের প্রধান ঘাতক গোলাম আযম এবং মতিউর রহমান নিজামীর সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

ঐ বৈঠকে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় যে, ১২ই জুন, ১৯৯৬ এর নির্বাচনে জামায়তের কর্মী ও সমর্থকরা বিএনপি প্রার্থীকে ভোট দেবে না এবং যে সমস্ত জায়গায় জামায়ত দূর্বল সে সমস্ত জায়গায় আওয়ামীলীগ প্রার্থীকে ভোট দেয়ার চেষ্টা করবে। বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জামায়তকে ২টি মহিলা আসন দিবেন।

রাত তখন ১০:০০ টা। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ডাইনিং টেবিলে রাতের খাবার খেতে খেতে জামায়ত নেতা ঘাতক গোলাম আযম ও নিজামীদের সাথে বৈঠকের ও ওয়াদার কথা পুনরায় উল্লেখ করে বললেন, ওদের বলেছিলাম বোরখাওয়ালীদের ২টি মহিলা এমপি দেবো। তখন ভেবেছিলাম জামায়ত গোটা পনের সিট পাবে। কিন্তু জামায়ত পেয়েছে মাত্র ২টি আসন, বোরখাওয়ালীদের এখন ১টার বেশী মহিলা এমপি দেবো না।

এই কথা শুনে শেখ হাসিনার চাচী, শেখ নাসেরের স্ত্রী, শেখ হেলাল এমপি'র মা বললেন, এহন দিলিও অয়, না দিলিও অয়, কামতো ওয়েই গেছে।

অর্থাৎ জামায়তকে এখন মহিলা এমপি দিলেও চলে না দিলেও চলে। নির্বাচনী কাজ তো উদ্ধার হয়েই গিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, ভবিষ্যতে হাতে মুঠোয় রাখার জন্য একটা মহিলা এমপি বোরখাওয়ালীদের দেই। মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না) বলল, আপা এটা আপনি কি বলেন? মানুষেরে মন ভেঙ্গে দেবেন না। মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করবেন না। আপনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেত্রী, মানুষ আপনাকে স্বাধীনতার প্রতীক মনে করে। আপনি যদি জামায়তকে মহিলা এমপি দেন, তবে খালেদা জিয়া আর আপনার মধ্যে তফাৎ থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ বিমুখ হবে। আপনার ক্ষতি হবে। আপনি এটা করবেন না।

এরপর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ূর রহমান রেন্টু এবং মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না) একযোগে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিয়ে বলল, আপা আপনি কথা দেন জামায়তকে একটাও মহিলা এমপি দেবেন না।

শেখ হাসিনা বললেন, আমাকে ভাবতে দাও। রাত তখন ২টা।

পরদিন সকাল ০৭:০০ টায় মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ূর রহমান রেন্টু (লেখক) ও মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না) প্রথমেই গেল ইন্দিরা রোডে শেখ হাসিনার চাচী শেখ হেলাল এমপি'র মায়ের বাসায়। দু'জনে মিলে শেখ হাসিনার চাচীর পা জড়িয়ে ধরে বলল, চাচী আপনিই কেবল পারেন জামায়তকে মহিলা এমপি দেয়া থেকে আপাকে (শেখ হাসিনা) বিরত রাখতে।

চাচী বললেন, তোমাদের সামনেই তো আমি কালকে বললাম দিলেও পার, না দিলেও পার।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বলল, না চাচী, আপনি শুধু বলবেন জামায়তকে মহিলা এমপি দিও না।

চাচীকে এক প্রকার জোর করেই ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডে শেখ হাসিনার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো এবং পুনরায় স্বামী-স্ত্রী মিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে জামায়তকে মহিলা এমপি না দেয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করলে চাচী বললেন, ওরা কান্নাকাটি করছে। তাছাড়া জামায়াতকে মহিলা এমপি না দিলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। দিও না তুমি জামায়তকে মহিলা এমপি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক আছে তোমরা যখন দিতে চাও না, না দিলাম।

হানিফ এলজিআরডি মন্ত্রী

আগামী ২৩শে, জুন ১৯৯৬ সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। সবাই খুব ব্যস্ত। যারা মন্ত্রী হবেন বলে আশা করছেন তারা সকলেই প্রচণ্ড টেনশনে আছেন। ঘনঘন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাসায় আসা-যাওয়া করছেন। মনে মনে ভাবছেন আমি তো মন্ত্রী হবই। আমাকে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দেয় কীভাবে ? তবুও বলা তো যায় না, যে এক-আধজন মন্ত্রীসভা থেকে বাদ পড়বে আমার নাম আমার ঐ বাদ যাওয়া তালিকায় নেই তো ? না, না এ কি করে হয়! আমাকে মন্ত্রী না বানিয়ে পারেন না। আমি মন্ত্রীত্ব পাবই। তবে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাব এটা ভাববার বিষয়। ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে লোক বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ধর্ণা দেয়া, জোর তদ্‌বির করা চলছে। এদের মধ্যে একজনই শুধু তদ্‌বির করছেন না, ধর্ণা দিচ্ছেন না। কারণ তিনি তো একেবারেই নিশ্চিত তিনি মন্ত্রী হচ্ছেনই। শুধু মন্ত্রীত্বই নিশ্চিত নয়, মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত এবং সেই মন্ত্রণালয়টা হলো এলজিআরডি মন্ত্রণালয়। এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। মেয়র মোহাম্মদ হানিফ এলজিআরডি. মন্ত্রী তো হয়েই আছেন, এটা তিনি একেবারেই নিশ্চিত। তার শুধু শপথ নেয়াটা বাকি। আগামী ২৩শে জুন শপথ অনুষ্ঠানটাও হয়ে যাবে। ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীত্বের এই নিশ্চয়তার কারণ, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ ধানমন্ডি ৩২–এ বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা আজকের ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো মেয়র হানিফকে এলজিআরডি মন্ত্রী বানিয়েই রেখেছেন এবং মেয়র হানিফকে এলজিআরডি মন্ত্রী হিসেবে অনানুষ্ঠানিক ঘোষণাও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ দিয়েছেন। কাজেই মেয়র মোহাম্মদ হানিফ নো চিন্তা ডু ফুর্তিতেই আছেন।

সবার মুখ কালো

আজ ২৩শে জুন, ১৯৯৬ সাল। সন্ধ্যা ০৭:০০ টায় বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শপথ নেবেন।

ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের শেখ হাসিনার ৫৪ নম্বর বাড়িতে শুধুমাত্র শেখ হাসিনা ছাড়া বাকি সবার মুখ কালো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পিতার ফুফাতো ভাইদের ছেলেরা নজিব আহম্মেদ নজিব, নকিব আহাম্মেদ মান্নু, কানিজ আহাম্মেদ এদের

সবার মুখ কালো। এমন কালো, যেন কাল বৈশাখের কালো মেঘ এদের মুখে ভর করেছে। এদের আরেক চাচাতো ভাই বাহাউদ্দিন নাসিম সে তো ভোর হওয়ার আগেই শেখ হাসিনার বাসা ছেড়ে চলে গেছে। বাড়ির চাকর-বাকর, পিয়ন, গাড়ির ড্রাইভার, বাবুর্চি, এমন কি যারা দীর্ঘ ১৬/১৭ বছর শেখ হাসিনার সাথে থাকতে থাকতে শেখ হাসিনার আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে, শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে, তাদের চোখেও জল, তাদের মুখও ভীষণ মলিন। ভীষণ কালো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ পরপর শুধু বলছেন, সবাই এমন শুরু করেছে, যেন আমি মরে যাচ্ছি! আর ঘন্টাখানেক পরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। অথচ তার বাড়িতেই নেমে এসেছে ভীষণ গাঢ় শোকের ছায়া। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেই যাচ্ছেন, হ্যাঁ আমি কি মরে যাচ্ছি যে, সবাই শোক শুরু করেছে?

শেখ হাসিনার আত্মীয়সহ দুই/তিন জনকে এই শোকের কারণ কি জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, বুঝেন না, উনি তো (শেখ হাসিনা) প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন, উনার আখের তো গুছিয়েই নিলেন। আমাদের কি হবে? এখন তো উনি আমাদের খোঁজও নেবেন না। আমরা যে এত বছর এত কষ্ট করলাম। তা মনেও রাখবে না। বলা হলো, না না প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভুলে যাবেন কেন। মনে রাখবেন না কেন? নিশ্চয়ই মনে রাখবেন।

ওরা জবাবে বলল, এখনো বুঝেন নাই তো কি রকম বেঈমান! বুঝবেন।

সন্ধ্যা ০৭:০০ টায় বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে প্রবেশ করা হলো। আওয়ামী লীগের সমস্ত এমপিরা এসেছেন। বিচারপতিগণ এসেছেন। তিন বাহিনী প্রধান এসেছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, গণমান্য ব্যক্তিগণ সবাই এসেছেন।

নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি আর মুজিব কোট পরে এসেছেন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। তিনি সাধারণত মুজিব কোট পড়েন না। কিন্তু তিনি তো নিশ্চিত যে, তিনি আজ মন্ত্রীত্বের শপথ নিচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে (হানিফকে) মন্ত্রী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই তিনি আজ মুজিব কোট পরে এসেছেন। তিনি জনতার মঞ্চ তৈরি করেছেন। খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। জনতার মঞ্চের নায়ক তো তিনিই। এই সমস্ত দিক দিয়ে ঢাকার মেয়র হানিফ আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি না হলেও কম গুরুত্বের না।

আমার সাথে বেঈমানি!

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শপথ নিলেন এবং বাংলাদেশর নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন। এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর

মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাগ থেকে তার মন্ত্রী পরিষদের লিস্ট বের করছেন। ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রী পরিষদের নাম পড়তে একটু সময় লাগছে। ঢাকার মেয়র হানিফ এমনভাবে আছেন যে তিনি না চেয়ারে বসে আছেন, না দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মনে করছেন, চেয়ারে বসে কি লাভ এখনই তো উঠতে হবে, মন্ত্রী পরিষদের প্রথম নামটাই তার। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াচ্ছেন না এই জন্য যে দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। তাই তিনি আধা বসা, আধা দাঁড়ানো অবস্থায় আছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রী পরিষদের নাম পড়তে লাগলেন। প্রথম নামটি মেয়র হানিফের না, দ্বিতীয়টি না, তৃতীয়টা, চতুর্থ না, পঞ্চম না, ষষ্ঠ না, সপ্তম না, অষ্টম না ... না, না, না, না এরপর মেয়র মোহাম্মদ হানিফ কানায় কানায় শ্রোতা-দর্শককে ভরা দরবার কক্ষের চেয়ারের দুই সারির মাঝখান দিয়ে দ্রুত বঙ্গভবন ত্যাগ করে বেরিয়ে যেতে থাকলে একজন তাকে পিছন থেকে হানিফ ভাই বলে জড়িয়ে ধরলে তিনি তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে, আমার সাথে বেঈমানি! আমার সাথে বেঈমানি! বলতে বলতে বঙ্গভবন ত্যাগ করে চলে যান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাসায় ফিরে রাতের খাবার খেতে খেতে বলেন, আজ আমার দুটি আনন্দ। প্রধানমন্ত্রী হতে পারার আনন্দ আর হানিফের বেঈমানির প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দ।

পরবর্তী পর্যায়ে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ডায়বেটিক (বার্ডেম–এ) হাপাতালে ভর্তি হয়ে সাংবাদিক ডেকে বলেন, কাউকে সম্মান না করেন অপমান করতে পারেন না।

তারপর দাবি করলেন মিনি গভার্ণমেন্টের। এরপর মেট্রোপলিটন অথরিটির। কিন্তু না, মেয়র হানিফের কিছুই পাওয়া হলো না। মন্ত্রীত্ব না। মিনি গভার্ণমেন্টে না। মেট্রোপলিটন অথরিটিও না।

বেসামাল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নাম্বার বাসায় ফিরে এসে তার জন্য নতুন সরকারি বাসা পছন্দ করার জন্য আত্মীয়-স্বজনদের বললেন। শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য বাসা পছন্দ করা। প্রথমেই দেখা হলো রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধা। তারপর দেখা হলো এরশাদ আমলে শুরু হয়ে খালেদা জিয়ার আমলে শেষ হওয়া জাতীয় সংসদসহ বহুল আলোচিত ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৩০ নম্বর হেয়ার রোডের বাসাটি। এরপর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা, মেঘনা

এবং অবশেষে করোতোয়া। বহু চিন্তা-ভাবনা, আত্মীয়-স্বজনর সাথে অনেক আলাপ-আলোচনার পর শেরেবাংলা নগর সংসদ ভবনের পশ্চিম উত্তরে ক্রিসেন্ট লেকের পশ্চিমে বিশাল আকারের দূর্গের ন্যায় করোতায়াকে পছন্দ করা হলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের আমলে তাঁর (শেখ মুজিবের) অফিস ছিল এখানে। তখন এই ভবনকে বলা হতো গণভবন। পুনরায় এই ভবনের নাম গণভবন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন করা হলো।

৩রা জুলাই, ১৯৯৬ রাত ০৯:০০ টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই গণভবনে এসে উঠলেন। গণভবনে এসে তিনি সোজা ২য় তলায় চলে গেলেন। ২য় তলার শোবার রুম দেখলেন, খাবার রুম দেখলেন, বসার রুম দেখলেন, আরো ৮/১০টা রুম দেখলেন। প্রতিটি রুমেই ২৬´´ রঙ্গিন টেলিভিশন এবং অত্যাধুনিক আসবাবপত্রে সুচারুরূপে সাজানো। রাত বেশি হওয়ায় বিশাল প্রসাদের বিশাল আয়তনের নিচতলার অংশটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখতে পারলেন না। ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন ৪ঠা জুলাই ঈদের দিনে ছোট ছোট ছেমেয়েরা যেমন খুব ভোরে উঠে গোসল-টোসল সেরে নুতন জামাকাপড় পরে খুশির ঠেলায় বেড়াতে বের হয়ে যায়, ঠিক এই রকমভাবেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব ভোরে উঠে গোসল-টোসল সেরে নতুন শাড়ি পড়ে সাতটা বাজার আগেই তার (প্রধানমন্ত্রীর) কার্যালয়ে চলে গেলেন। ফিরলেন দুপুর প্রায় ০১:০০ টায়। গণভবনের নিচতলায় ঢুকতেই হাতের ডান দিকে অর্থাৎ নিচতলার পশ্চিম পার্শ্বের ৩ নম্বর রুমে ঢুকলেন, সঙ্গে ছিলেন চাচী, মানে শেখ হেলালের মা। এই ৩ নম্বর রুমটিতে ঢুকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসামাল হয়ে গিয়ে এক চিৎকার দেন, ও ... রে চা... চা রে... এ... ত ব... ড় টে... বি... ল বলে লাফ দিয়ে শেখ হেলাল এমপি'র মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভইরাগুষ্ঠি (সকল আত্মীয়) কে খবর দেন, এই টেবিলে খাইতে হবে।

চাচী বললেন, ভইরাগুষ্ঠি আসলেও টেবিল ভরবি না নে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাইলে টুঙ্গিপাড়ার মাইনষেরে (মানুষ) খবর দেন। এই টেবিলে খাইতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর চিৎকারে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনী বিশেষ দল এসএসএফ এবং পিজিআর–এর সদস্যরা এগিয়ে এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুপ করে যান এবং চাচীকে সঙ্গে নিয়ে উপরে চলে যান।

গণভবনের ৩ নম্বর রুমটি একটি বিশাল রুম। এই বিশাল রুমে ডিম্ব আকৃতির একটি বিশাল টেবিল রয়েছে এবং এই বিশাল টেবিলের চারদিকে প্রায় শ'দুই রিভলবিং চেয়ার রয়েছে। এই ৩ নম্বর রুমটি খাওয়ার বা ডাইনিং রুম নয়। এটি আসলে একটি কনফারেন্স রুম।

দুই বোনের ভাগাভাগি

বর্তমানে বাংলাদেশের যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, যার অঙ্গুলি হেলনে, এদেশের বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, উচ্চ পর্যায়ের চাকরি-বাকরি নিয়ন্ত্রিত হয়, সরকারের সামরিক-বেসামরিক আমলা, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন যে যেখানেই আছেন তাদের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী ক্ষমতাধর, সামরিক সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যে কোনো পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদোন্নতি-পদাবনতি এবং বদলি যার মনবাসনা বা ইচ্ছানুযায়ী হয়, সরকারি পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পাওয়া না পাওয়া যার উপর নির্ভর করে, এদেশের বৈধ-অবৈধ সমস্ত টাকা-পয়সা যার হাতে জমা হয়, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবারের ক্যাশিয়ার যিনি, একমাত্র রাজনীতি ছাড়া গোটা দেশের অর্থনীতি একক হস্তে পরিচালনা করেন যিনি, এদেশের মানুষের জন্য বিন্দুমাত্র ভালবাসা মায়া-মমতার লেশমাত্র নেই যার, এদেশের মানুষকে শিয়াল (শৃগাল) কুত্তার (কুকুরের) জাত, নিমকহারামের জাত ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না, অন্য কিছু বলেন না যিনি, মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে অথবা রাত পোহালে যদি শুনতে পেতেন, এদেশের বার কোটি মানুষ সকলেই মহাপ্রলয়ে নিহত হয়ে গেছে তাহলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবেন যিনি, সদাসর্বত্র এদেশের মানুষের অনিষ্ট-অমঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা এবং কামনা করেন না যিনি, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ২য় কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদরের ছোট বোন শেখ রেহানা। ৭ই জুলাই, ১৯৯৬ এর অপরাহ্নে তিনি এলেন গণভবনে। তারই বড় বোন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এসেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিৎকার করে বললেন, এই, শেখ মুজিব কি একা তোমার বাপ? শেখ মুজিব কি আমার বাপ না? আমার ভাগ কই ? আমি কি ভাগ পাই না? তুমি শুধু একা খাবা ? আমিও সমান ভাগ পাই। সমান ভাগ চাই। আমার ভাগ কই? আমার ৫টা মন্ত্রী নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দাঁত কটমট করে বললেন, তুই মন্ত্রী দিয়ে কি কিরবি ? টাকা চাস্ তো টাকা পেয়ে যাবি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা বললেন, আমি এত কিছু বুঝি না, আজই আমার পাঁচজনকে মন্ত্রী বানাতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মন্ত্রী পাবি না, চালাইতেছি, চালাইতে দে। যত টাকা দরকার পাবি। সব তুই নে।

দুই বোনের চিৎকারের চোটে প্রধামন্ত্রীর ২৪ ঘন্টা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর ৬৪ (চৌষট্টি) জন অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত এসএসএফ (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) এবং সেনাবাহিনীর ১৬শ

(ষোল শত) সদস্যের একটি বিশেষ দল পিজিআর (প্রাইম মিনিস্টার গার্ড রেজিমেন্ট) এর ঐ দিন ডিউটিতে থাকা সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চোখের ইশারায় তাদেরকে সরিয়ে নেন, এটা প্রধানমন্ত্রীর একান্তই নিজস্ব এবং পারিবারিক ব্যাপার বলে ওভারলুক (দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া) করার পরামর্শ দেয়া হয়।

আজই যদি আমার পাঁচজনকে মন্ত্রী না করো, তবে আমি আমেরিকা চলে যাব। যখন আসব তখন সমান ভাগ নিয়ে আসব। মনে রেখ। এ কথা বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা চলে গেলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকায় গিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে ভাগাভাগি এবং আপোষরফা করে তার ছোট বোন শেখ রেহানাকে দেশে নিয়ে আসেন এই শর্তে যে, শেখ রেহানাই হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্যাশিয়ার। সমস্ত টাকা-পয়সা শেখ রেহানার হাত দিয়ে আসতে হবে এবং শেখ হাসার পর শেখ রেহানাই হবেন শেখ মুজিবের উত্তরসুরী।

শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি

১৯৯৬ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার স্বামী শফিক সিদ্দিকী, শেখ হাসিনার লাল রঙয়ের নিশান পেট্রোল জিপ গাড়িতে এবং হলুদ নম্বর প্লেট লাগানো দু'টি টয়োটা গাড়িতে করে ২জন শিখ, ৩জন মারোয়ারি ও ২জন ভারতীয় বাঙালিকে সঙ্গে নিয়ে এসে প্রতি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনের ৫ নম্বর বৈঠকখানায় গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করতেন। মিটিং–এ বসার আগে শফিক সিদ্দিকী মোটর সাইকেল আরোহীর কাছ থেকে ঢাকার মতিঝিলের শেয়ার মার্কেটের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতেন। শফিক সিদ্দিকী প্রথমেই জানতে চাইতেন আজকে শেয়ার মার্কেটে কেমন ভিড় হয়েছিল? মোটর সাইকেল আরোহী বলত মধুমিতা সিনেমা হলের বিপরীত ষ্টক একচেঞ্জের সামনে বেশ ভিড় দেখলাম।

তখন শফিক সিদ্দিকী বলতেন, বর্তমানে শেয়ার ব্যবসা খুব ভালো ব্যবসা, শেয়ার ব্যবসা করবেন, শেয়ার কিনবেন, আত্মীয়-স্বজনদের বলবেন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশি সবাইকে বলবেন শেয়ার কিনতে। শেয়ার কিনলেই লাভ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় গণভবনে ৫ নম্বর বৈঠকখানায় প্রতি সন্ধ্যায় উক্ত ব্যক্তিদের সাথে মিটিং এর আগে মোটর সাইকেল আরোহীকে শফিক সিদ্দিকীর একই প্রশ্ন, শেয়ার মার্কেটে আজকে কত লোক হয়েছে?

মোটর সাইকেল আরোহীর উত্তর, অনেক লোক হয়েছে, মতিঝিলের রাস্তা ভরে গেছে।

শফিক সিদ্দিকীর একই কথা, সবাইকে শেয়ার কিনতে বলবেন। শেয়ার কেনা খুবই লাভজনক ব্যবসা। কিনলেই লাভ। এভাবে দিন যেতে লাগল। এক পর্যায়ে প্রতিদিন সরেজমিনে শেয়ার মার্কেটের প্রকৃত অবস্থা দেখে সন্ধ্যায় গণভবনে এসে তা জানানোর জন্য মোটর সাইকেল আরোহীকে শফিক সিদ্দিকী দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। মোটর সাইকেল আরোহী প্রতি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে গিয়ে শফিক সিদ্দিকীকে শেয়ার মার্কেটের বাস্তব অবস্থা জানাতে লাগল। আর শফিক সিদ্দিকী তা জানার পর ভারতীয় শিখ, মারোয়ারি ও এবং বাঙালি ব্যবসায়ীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করতে থাকলেন।

সত্যিই, শেয়ার কিনলেই লাভ। শেয়ার বিক্রি করাটা কোনো ব্যাপার না। কেনাটাই আসল ব্যাপার। আজ কোনোমতে শেয়ার কিনতে পারলে, আগামী কাল আসতে না আসতেই তা চড়া দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শেয়ার কেনা নিয়ে প্রায় সারা দেশেই হই হই রই রই পড়ে গেছে। বাজারে প্রচুর ক্রেতা আছে। কিন্তু শেয়ার বিক্রেতা নেই। ক্রেতারা শেয়ার কেনার জন্য রাত-দিন ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন মোটর সাইকেল আরোহী শফিক সিদ্দিকীকে জানাল, শেয়ার মার্কেট আজ সবচাইতে বেশি ক্রেতা এসেছে। ইত্তেফাকের মোড়, হাটখোলা, অভিসার সিনেমা হল থেকে শুরু করে পুরো মতিঝিল, শাপলা চত্বর হয়ে নটরডেম কলেজ ছাড়িয়ে গেছে। এই সকল এলাকায় যানবাহন বন্ধ রয়েছে। শুধু ক্রেতা আর ক্রেতা। বিক্রেতা নেই। শফিক সিদ্দিকী তার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে গণভবনের ৫ নম্বর বৈঠকখানায় নির্ধারিত মিটিং–এ বসলেন। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকের মিটিং অনেক বেশি সময় নিয়ে চলল। অন্যান্য দিন যেখানে মিটিং হয় দেড়-দুই ঘন্টা, সেখানে আজকের মিটিং হলো প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা। পরের দিন শেয়ার বাজারে আরো বেশি লোক হলো এবং শফিক সিদ্দিকী তার ভারতীয় ব্যবসায়ী বন্ধুদের নিয়ে দুপুর ০৩:০০ টা থেকেই গণভবনে মিটিং–এ বসেছেন। রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত একটানা মিটিং চলল। মিটিং শেষে ভারতীয়রা শফিক সিদ্দিকীর সাথে এমন করে করমর্দন ও বুকে বুক মিলিয়ে বিদায় নিল, তাতে মনে হলো এ বিদায় অন্যান্য দিনের মতো বিদায় নেয়া নয়। তার পরদিন মতিঝিলের শেয়ার বাজারে শুধু বিক্রেতার ধাক্কাধাক্কি আর চিৎকার শোনা গেল। কিন্তু শেয়ার ক্রেতা খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে শফিক সিদ্দিকী ও তার ভারতীয় ব্যবসায়ীদেরও দেখা গেল না।

ওরা ছয় জন মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমান নিহত হওয়ার পর ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে মিলে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা ২য় বার যুদ্ধ করেছিল,

সেই সকল মুক্তিযোদ্ধা ১২ আগস্ট, ১৯৯৬ ঢাকার পুরানা পল্টনে এক বৈঠকে বসে। সারাদিন বৈঠক চলে। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসায় তাকে এবং তাঁর সরকারকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় এই নিয়ে দিনভর আলোচনা চলে। হালুয়াঘাট এবং নালিতাবাড়ি থানার প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বৈদনাথ কর তাঁর বক্তৃতায় কেন জানি খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে বলতে লাগল, ৭১–এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। কিন্তু মরি নাই। অবশেষে এক বিধবা যুবতীকে বিয়ে করেছি। আমাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। আমি এখন এক বিধবা যুবতীর স্বামী এবং এক ছেলের পিতা। আমি আর ভাল-মন্দ কোনো কিছুতেই জড়িত হতে চাই না। আপনারা এমন কিছু করবেন যাতে আমার বিধবা স্ত্রী আবার ২য় বার বিধবা না হয়। আমার ছেলে পিতৃহারা এতিম না হয়।

সন্ধ্যা ০৭:০০ সাতটায় বৈঠক শেষ হলে, যে যার বাড়ির দিকে রওনা হয়। নালিতাবাড়ি থানা থেকে আসা বৈদ্যনাথকর, জসিম উদ্দিন এরা একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে খোদা হাফেজ বলে নালিতাবাড়ির দিকে রওনা হয়ে যায়। পরদিন সকাল ০৭:০০ টার সময় আমার কাছে মুক্তিযোদ্ধা হাসেমী মাসুদ জামিল যুগোল–এর একটি ফোন আসে। ফোনে আমাকে বলা হয় বৈদ্যনাথ কর, জসি সহ ওরা ছয় (০৬) জন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে।

কথাটা শুনে হার্ট এ্যাটাকের মতো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বের হলো না। গত রাতে মানে এখন থেকে ১০/১২ ঘন্টা আগে যাদের সাথে দেখা হলো, কথা হলো তারা মারা গেছে? এটা কি অসম্ভব কথা! নিজেকে একটুখানি সামলে নিয়ে বললাম, কি বলছেন? কিভাবে মারা গেল?

মুক্তিযোদ্ধা হাসেমী মাসুম জামিল যুগোল জানালেন, গত রাতে ঢাকা পুরানা পল্টনে উলফাত ভাইয়ের অফিস থেকে মিটিং শেষে নালিতাবাড়ি যাওয়ার সময় সড়ক দূর্ঘটনায় এই ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেল।

শোকে-দুঃখে মনটা বিষণ্ন ভারাক্রান্ত হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সোজা গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শোক সংবাদটা জানালাম। তিনি ভাবলেশহীনভাবে শুনলেন। পরে তার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চলে গেলেন।

মনে মনে একটা ভাবনা ছিল; প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর পক্ষ থেকে সান্তনা দেয়ার জন্য কাউকে নিহত ছয়জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের কাছে পাঠান। তাই দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ফিরে এলে পুনরায় তাঁকে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হওয়ার কথা বললাম।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাতে কি হয়েছে? প্রতিদিনই তো কত লোক মারা যাচ্ছে। এর ঘন্টা খানেক পর বিকাল ০৩:০০ টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনা তাঁর বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ–এর আলোচনা সভায় যোগদানের জন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট চলে গেলেন এবং সেখানে তিনি আমার পিতা, আমার মা, আমার ভাই বলে কাঁদতে লাগলেন।

অন্যের পিতাকে যদি নিজের পিতার মতো মনে না হয়, অন্যের মাতাকে যদি নিজের মাতার মতো মনে না হয়, অন্যের সন্তানকে যদি নিজের সন্তানের মতো মনে না হয়, অন্যের শোক-দুঃখকে যদি নিজের শোক-দুঃখ মনে না হয়, তাহলে এমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী দিয়ে দেশের কোনো লাভ হবে? মানুষের কোনো লাভ হবে ? নিজের বাবা-মা-ভাইদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কান্না দেখে শুধু মনে হলো, হে আল্লাহ্, তুমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কি এতই দীনহীন করলে? এত কাঙ্গাল করলে? যার কেবলি নিজের ছাড়া অন্যের দুঃখে বিন্দুমাত্র অনুভূতি হবে না? হে আল্লাহ্, তুমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানুষের জন্য মমত্ববোধের সামর্থ দাও। মানুষকে ভালবাসার সামর্থ দাও। মানুষের প্রতি অনুভূতি দাও। অপরের সুখ-দুঃখকে নিজের করে ভাববার তাওফিক দাও। আমিন॥

ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়া

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭। যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টর অফ ল ডিগ্রি প্রদান করে। এই ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের আগে, ১৯৯৬ সালের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েলসিং বাংলাদেশে এসেছিলেন। জন ওয়েসলিং ৪/৫ (চার/পাঁচ) দিন বাংলাদেশ ছিলেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালে জন ওয়েসলিং ৩ দিন ছিলেন ঢাকায় এবং ১দিন ছিলেন গোপালগঞ্জে। ঢাকায় অবস্থানকালে জন ওয়েসলিং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনেই থাকতেন। গণভবন থেকেই জন ওয়েসলিংকে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান হতো। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু যাদুঘর, সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান, সংসদ ভবন, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি জায়গাসমূহ দেখান হলো এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে জন ওয়েসলিংকে বোঝানো হলো। একদিনের সফরে টুঙ্গিপাড়ায়ও নেয়া হলো। টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবর রহমান এর মাজার দেখানো হলো। গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপন করার পরদিন আবার ঢাকায় নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের সমস্ত ছবি এবং নিদর্শনগুলো খুবই ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে জন ওয়েসলিংকে বুঝিয়ে দেয়া হলো। শুধু বুঝিয়েই দেয়া হলো না, একেবারে তোতা পাখির ন্যায় মুখস্ত করে দেয়া হলো। জন ওয়েসলিংকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে মুখস্ত করে দেয়ার দায়িত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত জন ওয়েসলিংকে সব কিছু বুঝিয়ে

মুখস্ত করে দেয়ার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে “ডক্টর অফ ল” প্রদানের বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েসলিং নগদ এবং বাকি মিলিয়ে অনেক উপঢৌকন নিয়ে বাংলাদেশ থেকে চলে গেলেন। কিন্তু গণভবন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন এটা সেন বাবু জন ওয়েসলিংকে বলেননি। ফলে জন ওয়সলিং ধরে নিলেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের ঐটা মিউজিয়াম (যাদুঘর)। টুঙ্গিপাড়াটা বঙ্গবন্ধুর গ্রামের বাড়ি আর বিশাল দূর্গের ন্যায় গণভবনটা শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের বাড়ি। তাই ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে “ডক্টর অফ ল” ডিগ্রি প্রদানকালে যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েসলিং যে মানপত্র পাঠ করেন, তার এক জায়াগায় লিখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাকে আপনার পিতার বিশাল দূর্গের মতো পৈত্রিক বাসভবনে বন্দী রাখলেও আপনার উদ্যোমকে, আপনার চেতনাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বিশাল দূর্গের মতো পৈত্রিক বাড়ি ও তার উত্তরাধিকারের মধ্যে আটকে থাকলেও ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

জন ওয়েসলিং তার মানপত্রে যে বিশাল দূর্গের মতো পৈত্রিক বাড়ির উল্লেখ করেছেন সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতার বাড়ি নয়, সেটা প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবন। একমাত্র গণভবনই বিশাল দূর্গের মতো। তাছাড়া শেখ মুজিবর রহমানের বিশাল দূর্গের মতো কোনো বাড়ি কোথাও নেই।

প্রথম আমেরিকা সফর

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। আত্মীয়-স্বজনের এক বিশাল বহর নিয়ে সন্ধ্যার আগেই গণভবন থেকে জিয়া আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রওনা হয়ে গেলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে পৌঁছলেন এবং আত্মীয়-স্বজনের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ চা ও নানান পদের নাস্তা খেতে লাগলেন, হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকলেন। মন্ত্রীসভার সদস্যগণ, তিন বাহিনী প্রধানগণসহ উচ্চ পদস্থ সামরিক-বেসারিক কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ বিমান বন্দরের ভিভিআইপি টারমার্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদায় দেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রধানমন্ত্রীকে বহন করার চাটার্ড বিমানটিকে প্যাসেঞ্জার টারমার্কের লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। বাহাউদ্দিন নাসিম বলল, আমাদের

প্রধানমন্ত্রী এতই অতি সাধারণ যে, তিনি ভিভিআইপি টারমার্কের পরিবর্তে সাধারণ যাত্রীদের (প্যাসেঞ্জার) টারমার্ক (লাউঞ্জ) দিয়ে বিমানে উঠে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

কাজেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে এপিএস নাসিম বিমানকে প্যাসেঞ্জার টারমার্কে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলো। যথারীতি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানের পাইলনকে ঐ নির্দেশ দিলে, পাইলট প্যাসেঞ্জার টারমার্কে বিমান নিয়ে এলো। একটু পরে এলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার আরেক ফুফুতো ভাইয়ের ছেলে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীফ্ সিকিউরিটি নজিব আহাম্মেদ নজিব। নাসিমের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্কে নেয়া হয়েছে এই কথা শুনামাত্র নজিব বলল, প্রধানমন্ত্রী ভিভিআইপি টারমার্ক দিয়ে বিমানে উঠবে, বিমান ভিভিআইপি টারমার্কে ফেরত আনা হোক।

যথারীতি বিমানকে ভিভিআইপি টারমার্কে ফেরত আনা হলো। কিছুক্ষণ পরে প্রধানমন্ত্রীর এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম এসে শুনল তার চাচাতো ভাই নজিব বিমান ভিভিআইপি টারমার্কে ফেরত এনেছে। তখন নাসিম বিমান কর্তৃপক্ষকে বলল, আমি প্রধানমন্ত্রীর এপিএস। আমি প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি গড়ে তুলি, আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রোগ্রাম তৈরি করি। আপনারা কি আমার চাইতে বেশি বোঝেন ?

সমস্ত সাংবাদিকদের আমি প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে পাঠিয়েছি। আমি যা বলি সেভাবে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রীর বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্কে পাঠান। বিমান কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে পাইলট আবার বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্কে নিয়ে এলো। প্রধানমন্ত্রীর এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিমের চাচাতো ভাই প্রধানমন্ত্রীর চীফ্ সিকিউরিটি নজিব আহাম্মেদ নজিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিমান রেডি বলে এসে, বিমান আবার প্যাসেঞ্জার টারমার্কে লাগানো হয়েছে শুনেই হারামজাদা! কুত্তার বাচ্চা! বলে গালাগালি দিতে দিতে কার নির্দেশে বিমান সরানো হয়েছে জিজ্ঞেস করলে নাসিম বলল, আমার নির্দেশে বিমান সরানো হয়েছে। আমি বিমান প্যাসেঞ্জার টারমার্কে নিয়েছি।

নজিব বলল, তুই বিমান সরানোর কে ?

আমি চীফ্ সিকিউরিটি, আমার নির্দেশে বিমান চলবে।

নাসিম বলল, আমার নির্দেশে বিমান চলবে।

নজিব বলল, দেখ্ বেশি কথা বলবি না খারাপ হইয়া যাইব!

নাসিম বলল, আমি কি তোমার মাহা তামুক খাই যে, আমাকে ডর দেহাও!

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার দুই ফুফাতো ভাইয়ের দুই ছেলে এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম এবং চীফ্ সিকিউরিটি নজিব আহাম্মেদ নজিবের মধ্যকার ঝগড়ার মুখে বিমান কর্তৃপক্ষ অসহায়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। এমনিভাবে মিনিট পঁচিশেক

চলে গেল। ওদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানে ওঠার জন্য ভিভিআই রেষ্ট রুম থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার আমাকে এখনো বিমানে তুলছে না কেন?

দুই চাচাতো ভাই নজিব—নাসিমের ঝগড়া থামানোর জন্য দুই চাচাতো ভাইয়ের চাইতেও অনেক অনেক বেশি ক্ষমতাধর ব্যক্তি, বলতে গেলে ক্ষমতার শীর্ষের তিন/চার (৩/৪) নম্বর ব্যক্তি, যিনি সচরাচর নজিব—নাসিমদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু যাকে দেখলে নজিব—নাসিম ভয়ে এবং কৌশলগত কারণে নেতিয়ে পড়ে, পাগলের মতো টাকা-পয়সার দিকে ছোটা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ নেই যার, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই (শেখ নাসেরের বড় ছেলে) শেখ হেলাল এমপি এসে উপস্থিত হলো। নজিব—নাসিম ভয়ে এবং কৌশলগত কারণে নেতিয়ে গেল। শেখ হেলাল এমপি বলল, প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এখনো বিমানের ব্যবস্থা হয় নাই? যান ভিভিআইপি'তে বিমান লাগান।

কর্তৃপক্ষ ভিভিআইপি টারমার্কে বিমান নেয়ার জন্য মৌখিক নির্দেশ দিলে ভিভিআইপি আর প্যাসেঞ্জার টারমার্কে বারবার বিমান নেয়া এবং আনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিমানের পাইলট ভিভিআইপি এবং প্যাসেঞ্জার টারমার্কের মাঝখানে বিমান রেখে দিয়ে কর্তৃপক্ষকে বলল, আমাকে লিখিত দিতে হবে। লিখিত ছাড়া বিমানের চাকা একবারও ঘুরবে না।

এবার বিমান কর্তৃপক্ষ আরো বিপাকে পড়লো। কর্তৃপক্ষ লিখিত দেয়ার পর পাইলট ভিভিআইপি টারমার্কে বিমান নিয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। যদিও এ সমস্ত কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যাত্রা শুরু করতে ঘন্টা দেড়েক দেরি হলো এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন তা বোঝা গেল না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদায় জানাতে আসা সকল মন্ত্রী, তিন বাহিনী প্রধান, উচ্চ পদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ যাত্রা শুরুর এই বিলম্বের সময় ভেবলার মতো দাঁড়িয়ে ছিল। পরের দিন দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় নানান ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর যাত্রা শুরু করতে বিলম্বের সংবাদ পরিবেশ করল। কিন্তু কেন যাত্রা বিলম্ব হলো, তা কোনো পত্রিকাতেই জানা গেল না। প্রকাশ করা হলো না। শুধু বিলম্ব হলো এটাই প্রকাশ করা হলো। শুধু তাই নয়, প্রকাশিত এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক, কলাম লেখক আবেদ খান ভোরের কাগজে "প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা কি বিঘ্নিত?"' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে সরেজমিনে তদন্ত লিখলেন। আবেদন খান তার প্রতিবেদনে বিমানের অভ্যন্তরে রাজাকারের সন্ধান পাওয়াসহ আরো কত কিছু পেলেন। কত কিছু লিখলেন। বিমান প্রশাসনের রদ বদল হলো।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যাত্রা বিলম্বের প্রকৃত কারণ আবেদন খানের কলামে এলো না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকা সফর করে যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ডক্টর অফ ল" ডিগ্রির সাথে তাঁর একমাত্র বোন শেখ রেহেনাকে সকল কিছুতে (পৌত্রিক সূত্রে) অর্ধেক ভাগ দেয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থার শর্তে সঙ্গে নিয়ে এলেন। ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দুই বোনের দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে শেখ রেহানা ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব নিতে বাংলাদেশে আবার ফিরে এলেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত তহবিলে যা কিছু জমা হবে তার সব কিছুই শেখ রেহানার হাত দিয়ে হতে হবে। এই শর্তে শেখ রেহানা দেশে ফিরে এলেন।

যুদ্ধ বিমান ক্রয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্যাশিয়ার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা তার স্বামী শফিক সিদ্দিকীকে সঙ্গে নিয়ে এক বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এসে প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়ার মিগ–২৯ বোমারু বিমান (যুদ্ধ বিমান) ক্রয় করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, এই যুদ্ধ বিমান ক্রয় করলে উত্তর পাড়ার লোকেরাও (ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকেরা) খুশি থাকবে এবং আমরা ভারতের দালাল না এটাও জনগণ মনে করবে। উপস্থিত মোটর সাইকেল আরোহী বলল, খবরদার নেত্রী, (প্রধানমন্ত্রী) এই কাজ করবেন না। দেশের কোটি কোটি মানুষ বেকার। যুদ্ধ বিমান ক্রয় না করে যে টাকা দিয়ে যুদ্ধ বিমান ক্রয় করবেন, সেই টাকা বেকারদের কর্মসংস্থানে বরাদ্ধ করেন।

শেখ রেহানা ও তার স্বামী শফিক সিদ্দিকীর চেহারায় ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড রাগ হওয়ার ছাপ ফুটে উঠল। এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, বিমান তো বাকিতে কিনব।

মোটর সাইকেল আরোহী বলল, যতই বাকিতে কিনেন, এই টাকা তো এদেশকেই শোধ করতে হবে। নেত্রী (প্রধানমন্ত্রী) একটা কথা খেয়াল রাখবেন, যদি বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন, দেশের উন্নতি করতে পারেন, তাহলে এদেশের মানুষ শুধু আপনাকেই না, আপনার নাতি-পুতিকেও মাথায় করে রাখবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমার সাথে কি একটু একাকী কথা বলা যাবে ? না তোমার লোকজন কথার মধ্যে বাঁ-হাত দিতেই থাকবে ?

মোটর সাইকেল আরোহী বাইরে চলে এলো।

কথা হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার স্বামী শফিক সিদ্দিকী বাংলাদেশের মতো একটি দীনহীন দরিদ্র দেশের কর্ণধার হয়ে

কেন যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন? ভারতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য? মনস্তাত্বিকভাবে (সাইকোলজিক্যালি) শেখ হাসিনা-শেখ রেহানা গংয়ের কি কখনোই ভারতের সাথে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারে? নিশ্চয়ই না। শেখ পরিবার কখনোই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারে না। বরং শেখ হাসিনা-শেখ রেহানারা সদা সর্বদা ভারতকে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারগত অভিভাবকই মনে করেন। তারা সব সবই ভারতের রাজনীতিবিদদের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে পিতৃতুল্যই মনে করেন। ভারতের সাথে যুদ্ধ করবেন না। তারপরও যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন, রহস্যটা কি? তাহলে হাসিনা-রেহানা গংয়েরা জানেন না যে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সবচাইতে গরিব দেশ? এদেশের মানুষের দিনে আধপেট আহার জোটে না? বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, বাসস্থান নেই, এসব কি তারা জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন। তারা সবই মানেন। আবার এটাও নিশ্চিত যে, আর যাই হোক শেখ হাসিনা-রেহানারা তাদের অভিভাবক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কখনোই যুদ্ধ বিমান ক্রয় করবেন না। তাহলে তারা যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন কেন? একটা কথা মনে রাখতে হবে, দেশের প্রতিরক্ষা খাত হচ্ছে এমন একটা খাত, যে খাতের ব্যয় (ক্রয়-বিক্রয়) সম্পর্কে মহান জাতীয় সংসদেও কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত কারণেই প্রতিরক্ষা ব্যায় সম্পর্কে কোথায়ও কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। শুধু আমাদের দেশেই নয়। অন্যান্য দেশেও একই নিয়ম। সে জন্যই ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধির বোফোর্স কেলেঙ্কারিতে স্পষ্ট জড়িত থাকা সত্ত্বেও ভারতের পার্লামেন্টে এ নিয়ে তেমন হই-হুল্লোড় হয়নি। এই প্রতিরক্ষা খাত থেকেই বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের যেহেতু কোন জবাবদিহিতা নেই, সেহেতু এ খাতেই দুর্নীতি করা বা কমিশন নেয়া অতীব সহজ। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না, তথাপি শেখ হাসিনা-শেখ রেহানা গং বর্তমানে যুদ্ধে অকার্যকর পুরনো সেকেলে রাশিয়ান মিগ–২৯ যুদ্ধ বিমান কেন ক্রয় করেন? এর উত্তর – শুধু কমিশন। শুধু কমিশন পাওয়ার জন্যই এই অত্যাধুনিক যুগে অত্যাধুনিক কার্যকর জঙ্গি বিমানের পরিবর্তে, অকার্যকর সেকেল পুরানো ধ্বজা ভাঙ্গা বোমারু বিমান ক্রয় করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ক্যাশিয়ার শেখ রেহানা এই রকমের একটি ড্রিল–এ কম করে হলেও শত শত কোটি টাকা পেয়ে থাকেন।

কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা

দেশের মাটিতে থেকে একমাত্র যিনি কাদেরীয়া বাহিনী নামে বিশাল এক মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, বৃহত্তর টাঙ্গাইল জেলা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা এবং বৃহত্তর পাবনা জেলার অধিকাংশ অঞ্চল তিনি নিজের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রেখে সৃষ্টি

করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চল। দেশ ত্যাগ করে ভারতে না গিয়ে বৃহত্তর টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। এই স্বাধীন বাংলাদেশের হানাদারমুক্ত অঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কখনোই ঢুকতে পারেনি। পাকিস্তানি খান সেনারা যখনই মুক্তাঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা করেছে, তখনই প্রচণ্ড মার খেয়ে ফেরত এসেছে। এই মুক্তাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন। এখানে যুদ্ধের সাথে চলত রাজস্ব (খাজনা টেক্স) আদায়। নিয়োগ দেয়া হতো রাজ কর্মচারী (চৌকিদার, দফাদার, তহশিলদার, এসডিও) ও কর্মকর্তাদের। গড়ে তোলা হয়েছিল বিচার বিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাগ। শুধু বাংলাদেশেরই নয়, সারা বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন যিনি, তিনি হলেন মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তির নায়ক বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম)। মুক্তিযুদ্ধের সময় লোকে যাকে বাঘা সিদ্দিকী বলে জানত। যাঁর নাম শুনলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জেনারেলদের পর্যন্ত আত্মারাম খাঁচা হয়ে যেত।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করলে একমাত্র বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীই ঐ হত্যার প্রতিবাদ করেন। শেখ মুজিব হত্যার পর কাদের সিদ্দিকী নিজেকে শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্র দাবি করে, ৭১—এর ন্যায় পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধ ছিল কাদের সিদ্দিকীর জীবনে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচাইতে বড় রাজনৈতিক ভুল। এই যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে জনগণের অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, সামান্যতম সমর্থনও ছিল না। ১৯৭৫—এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডকে জনগণ সমর্থন করেছিল কি না যদিও এটা গবেষণার বিষয়, তথাপি এটা নিশ্চিত বলা যায় ঐ হত্যাকাণ্ড জনগণ নিরবে গ্রহণ করেছিল। সে জন্যই শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকীর দ্বিতীয়বার যুদ্ধ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদ যুদ্ধে জনগণ সামিল তো হয়ই নি, বরং যে হাজার তিনেক যোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, জনগণ তাদের বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর কাছে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। ঐ যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল শেখ মুজিব হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের আপামর জনগণের বিরুদ্ধে।

ফলে ’৭১—এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বিজয়ী হলেও, ৭৫—এর শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদ যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী এবং তার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাদের সিদ্দিকী নির্বাসনে ভারতে চলে গেলে শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা তাকে ধর্মের ভাই ডাকেন। সেই

থেকেই তাদের ধর্মের ভাই-বোনের সম্পর্ক এতই গভীর ছিল যে, কাদের সিদ্দিকী মাংস খেতেন না বিধায় শেখ হাসিনা ইলেকট্রিক হিটার এবং মাছ কিনে কাদের সিদ্দিকী যে হোটেলে থাকতেন সেখানে গিয়ে নিজে রান্না করে কাদের সিদ্দিকীকে খাওয়াতেন। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যেই বলতেন একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই এবং কাদের সিদ্দিকীই তার পিতা শেখ মুজিবের একমাত্র উত্তরসূরী। শেখ হাসিনা বলতেন সারা জীবন কাদের সিদ্দিকীর ঝি-চাকরাণীর কাজ করেও কাদের সিদ্দিকীর ঋণ তিনি শোধ করতে পারবেন না।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার প্রাক্কালে কলকাতা দমদম বিমানবন্দরে বলেন, দেশে ফিরে তাঁর একমাত্র কাজ হবে বঙ্গবন্ধুর উত্তরসুরী তাঁর ধর্মের ভাই কাদের সিদ্দিকী ও তাঁর লোকজনকে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু দেশে ফিরে এসে শেখ হাসিনা তাঁর ধর্মের ভাই শেখ মুজিবের উত্তরসূরী কাদের সিদ্দিকীকে ফিরিয়ে আনার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নিলে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সহধর্মিণী নাসরিন সিদ্দিকী "বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদ" নামে একটি নতুন সংগঠন করে অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঝটিকা সফরে করে কাদের সিদ্দিকীকে দেশে ফিরিয়ে আনার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করলে শেখ হাসিনা এটাকে ভাল দৃষ্টিতে না দেখে চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেন এবং নাসরিন সিদ্দিকী ও ঐ সংগঠনকে কুদৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে তার সংগঠন আওয়ামী লীগকে কাদের সিদ্দিকীর ঐ সংগঠনের সাথে সম্পর্ক না রাখার এবং বিরোধিতা করার নির্দেশ দেন।

১৯৯০ সালে তীব্র গণ আন্দোলনে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ—এর পতন হলে ১৬ই ডিসম্বর মহান বিজয় দিবসে শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্রের দাবিদার শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) বাংলাদেশে ফিরে আসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি নেন এবং যথারীতি শেখ হাসিনার সাথে টেলিফোনে কাদের সিদ্দিকী তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করলে শেখ হাসিনা সরাসরি কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করেন। এরপরও কাদের সিদ্দিকী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে দৃঢ় থাকলে শেখ হাসিনা তাঁর দল আওয়ামী লীগকে কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কর্মসূচী ভণ্ডুল (স্যাবোটাজ) করার নির্দেশ দেন।

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে সংবর্ধনা দিলেও শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মী ঐ সংবর্ধনায় যোগদান

করেননি এবং এখান থেকেই শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্রের দাবিদার, শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, কাদের সিদ্দিকীর সাথে শেখ হাসিনার প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়। এরপর থেকে শেখ হাসিনা তার ধর্মের ভাই কাদের সিদ্দিকীকে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারতেন না। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যেই বলতেন আমি আছি বলেই কাদের সিদ্দিকী আছে। আমি না থাকলে কাদের সিদ্দিকীও থাকবে না। কাদের সিদ্দিকীর অবস্থা হবে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর স্ত্রী মেনকা গান্ধীর মতো। যতক্ষণ ইন্দিরা গান্ধী ছিল, মেনকা গান্ধীও ততক্ষণ ছিল। এখন ইন্দিরা গান্ধীও নাই, আর মেনকা গান্ধীরও খবর নাই। আমি না থাকলে কাদের সিদ্দিকীরও ঐ অবস্থা হবে। কোন খবর থাকবে না।

আর কাদের সিদ্দিকীও মাশআল্লাহ কখনোই শেখ হাসিনাকে নেত্রী বলে মানলেন না, স্বীকার করলেন না। কাদের সিদ্দিকীর ঐ একই কথা, শেখ হাসিনা আমার বোন, আমি শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, আমিই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্তরসূরী। নানাবিধ কারণে বিশেষতঃ কৌশলগত কারণেই শেখ হাসিনা কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামীলীগে রাখেন, আওয়ামীলীগের এমপি বানান। কাদের সিদ্দিকীও একই কারণে আওয়ামী লীগে থাকেন, আওয়ামী লীগের এমপি হন। শেখ হাসিনার ভাবনা হলো কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগ থেকে বের করে দিলে আওয়ামী লীগের কিছু ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া কাদের সিদ্দিকীও প্রকাশ্যে সরাসরি উঠে পড়ে তাঁর (শেখ হাসিনার) নেতৃত্বের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। তারচেয়ে নিজের পৈত্রিক দল আওয়ামী লীগে রেখেই কাদের সিদ্দিকীকে পরিচয় দিতে হবে। কাদের সিদ্দিকীকে পঁচিয়ে দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই শেখ হাসিনা কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগে রেখেছেন। কাদের সিদ্দিকীও আপাতত নিরবে আওয়ামী লীগে অবস্থান করার কৌশলগত অবস্থান নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেয় করা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে পুলিশ পাঠানোর পরিকল্পনা করলে মোটর সাইকেল আরোহী এর বিরোধিতা করে বলেন, সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে আপনি এটা করতে পারেন না। ভুলে যাবেন না, আপনার পিতা-মাতা-ভাইদের মেরে যখন সিঁড়িতে লাশ ফেলে রেখেছিল, তখন সারা পৃথিবীতে একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ছাড়া অন্য আর কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। আর আজ আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার বাড়িতে পুলিশ পাঠালে তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতার কাজ। আপনি এত বড় অকৃতজ্ঞের কাজ করতে পারেন না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ওর (কাদের সিদ্দিকীর) ভাইয়েরা সন্ত্রাসী। ওর ভাইদের ধরার জন্য ওর বাড়িতে পুলিশ যাবে।

মোটর সাইকেল আরোহী বলল, কাদের সিদ্দিকীর ভাই মুরাদ সিদ্দিকী ও আজাদ সিদ্দিকী সন্ত্রাসীই হোক আর যাই হোক, তারা আপনার আমলে কোন সন্ত্রাস করেনি, কোন অপরাধ করেনি।

অত্যন্ত দু'র্দিনে যখন আপনার পিতা-মাতা নিহত হয়েছিলেন, কাদের সিদ্দিকী, লতিফ সিদ্দিকী দেশের বাইরে নির্বাসনে ছিলেন। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের নাম নেয়ার কোনো লোক ছিল না। তখন নিদারুণ বৈরী পরিবেশে মুরাদ সিদ্দিকী ও আজাদ সিদ্দিকী এই দুই ভাই টাঙ্গাইলের মাটিতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নাম নেয়ার জন্য যুবকদের সংগঠিত করতে করতে এবং শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রশাসনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হতে এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের খাতায় নাম চলে যায় এবং বহু মামলা তাদের বিরুদ্ধে হয়। যেহেতু প্রশাসন দুর্নীতি পরায়ণ, তাই কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে প্রশাসন এদের সাথে ভাগাভাগিতে চলে যায়। তাছাড়া আজাদ–মুরাদ এখন আর কোনো ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত নয়। এসব কোনো কিছুই আপনার অজানা নয়। আপনি সবই ভালভাবে জানেন। আপনার শাসনামলে ওরা কোনো ধরনের বেআইনি কাজের সাথে জড়িত থাকলে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়ার কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে তাদের সতর্ক করে দেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, না, কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতেই পুলিশ পাঠিয়ে ওদের ধরতে হবে।

মোটর সাইকেল আরোহী বলল, শুধুমাত্র হেয় করার জন্য যদি কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে পুলিশ পাঠান, তাহলে পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু থাকবে না।

রাষ্ট্রীয় কাজে তুমি বাধা দিতে পার না, ক্রুদ্ধস্বরে এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেডরুমে চলে গেলেন এবং ঠিকই কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে পুলিশ পাঠালেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া

২৩শে জুন, ১৯৯৬ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার দলের একজনকে নতুন রাষ্ট্রপতি করা নিয়ে বেশ বিপাকে পড়ে গেলেন। দলের যে কোনো নেতাকেই তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করেন সেই নেতাই কেঁদে ফেলেন। কোনো কোনো নেতা আবার সভানেত্রী শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়া থেকে মুক্তি চান। এই অবস্থায় মতিয়ূর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না) সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি, ১৯৯০ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মদকে নতুন রাষ্ট্রপতি করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এই বলে পরামর্শ দেয় যে,

কেউই যখন রাষ্ট্রপতি হতে ইচ্ছুক নন, তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদকেই নতুন রাষ্ট্রপতি করেন। সাধারণ মানুষের কাছে সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদ–এর একটা জনপ্রিয়তা আছে, গ্রহণযোগ্যতা আছে। তাকে রাষ্ট্রপতি করলে আপনার (শেখ হাসিনার) জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পাবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, না, সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি করা যাবে না। কারণ আমি (শেখ হাসিনা) যখন ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর বলেছিলাম নির্বাচনে সুক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে, তখন সাহাবুদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে খালেদা জিয়ার সাথে সুর মিলিয়ে বলেছিল নির্বাচন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এইটা কোনো বিচারপতি হলো? এইটাকে রাষ্ট্রপতি করব না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রথমে জিল্লুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলেন। জিল্লুর রহমান বললেন, নেত্রী আমাকে দয়া করে আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি বানিয়েছেন। এখন যদি দয়া করে আমাকে রাষ্ট্রীয় কোনো এক্সিকিউটিভ (নির্বাহী) পদে না দেন, তাহলে দলের সেক্রেটারি হিসেবে আমার কোনো গুরুত্বই থাকে না। কোনো মূল্যই থাকে না। আমাকে দয়া করে রাষ্ট্রপতি না বানিয়ে আপনার কাছাকাছি একটা মন্ত্রণালয় দেন, যাতে আমি সব সময় আমার কাছে থাকতে পারি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপর প্রেসিডিয়াম সদস্য সালাউদ্দিন ইউসুফকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলে সালাউদ্দিন ইউসুফ বলেন, নেত্রী, আমার স্বাস্থ্য ভালো না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, বেশ তো রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতির কোনো কামকাজ নেই, শুধু বসে বসে সরকারি খরচে আরাম-আয়েশ করবেন।

এ কথা শুনে সালাউদ্দিন ইউসুফ সোজা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে বলেন, নেত্রী আমার এলাকার জনগণের কিছু সুযোগ দেন।

এই সুযোগে মতিয়ূর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না) সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে পুনরায় চাপ দিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপর প্রেসিডিয়াম সদস্য বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলে আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, নেত্রী আমাকে রহম করেন, দয়া করে আমাকে শেষ বয়সে বাতিল করবেন না। আমি বঙ্গবন্ধুর ফরেন মিনিষ্টার (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ছিলাম। আমাকে কাজ করার সুযোগ দেন। আমি দেখিয়ে দেবো বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীদের কত যোগ্যতা ছিল।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি করার জন্য কাউকেই খুঁজে পাচ্ছেন না। অর্থাৎ যাকেই রাষ্ট্রপতি করতে চান তিনিই মাফ চেয়ে পালিয়ে যান। এমনি সময়ে

এসে উপস্থিত হলেন ১৯৯১ সালের আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বর্তমানে ধানমন্ডি–মোহাম্মদপুর এর আওয়ামী লীগ এমপি হাজী মকবুল হোসেন। হাজী মকবুল হোসেন এমপি'র বক্তব্য হলো আমি ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ছিলাম। আপনিই (শেখ হাসিনা) আমাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিলেন। এখন কেউ রাষ্ট্রপতি হতে চাচ্ছেন না যখন, তখন আমাকেই রাষ্ট্রপতি করেন। নইলে মন্ত্রী করেন। কিছু একটা করেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না আপনাকে কিছুই করা হবে না। মনে নেই, ১৯৯১–এ আমার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। আমার সম্পর্কে নানা কথা প্রকাশ করেছিলেন। আপনাকে কিছুই করা হবে না। এমপি করেছি এটাই যথেষ্ট।

এই পরিস্থিতি ২১শে জুন, ১৯৯৬ মতিয়ূর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বুঝালেন রাষ্ট্রপতির তো বসে বসে আরাম-আয়েশ করা আর চাঁদ দেখা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। রাষ্ট্রপতির হাতে কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। মন্ত্রীশাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি হলো নাচের পুতুল। যেভাবে আপনি নাচাবেন সেভাবেই রাষ্ট্রপতিকে নাচতে হবে। এই সুযোগ আপনি হাতছাড়া করবেন কেন? সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি বানিয়ে আরেকটা বাহবা কেন নেবেন না? বাহবা নেয়ার সুযোগ চলে গেলে কিন্তু আর বাহবা নিতে পারবেন না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন বলেন, ঠিক আছে, তাহলে সাহাবুদ্দিনকেই রাষ্ট্রপতি করি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২৩শে জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে বঙ্গভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদ এর বাসায় গিয়ে তাকে নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করেন এবং রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন।

বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা

১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহের এক বিকেলে, প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনের নিচতলায় পূর্ব দিকের ২নং ড্রয়িংরুমে প্রধানমন্ত্রী এবং তার আত্মীয়-স্বজন মিলে গল্পগুজব করছেন। শেখ রেহানা এবং তার স্বামী শফিক সিদ্দিকী, চাচাতো বোন লুনা, মিনা এরা সবাই পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরি দেয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শলা-পরামর্শ দেয়।

অর্থাৎ ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী নাকি তাদের পছন্দ মতো ৭৪৫ জনকে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরি দিয়েছে। আর এই অভিযোগে বেগম জিয়া ও মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতির মামলা দায়ের করতে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে নির্দেশ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উল্লিখিত আত্মীয়-স্বজনেরা পিড়াপিড়ি করতে থাকলে মতিয়ার রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার আত্মীয়দের বুঝিয়ে বলেন যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াদের না খুঁচিয়ে বরং তাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে চেষ্টা করে দেখেন, দেশের উন্নতি করতে পারেন কি না। যদি একবার কোনোমতে দেশ গঠন করতে পারেন, তাহলে দেখবেন শুধু আপনাকেই না, আপনার নাতি-পুতিকেই এদেশের মানুষ মাথায় করে রাখবে। বিএনপি ও বেগম খালেদা জিয়াকে হোস্টাইল করে আপনি দেশ গড়তে পারবেন না। আবার আপনাকে এবং আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কেউ দেশ গড়তে পারবে না। আপনি এবং খালেদা জিয়া এই দুই শক্তির ঐক্য ছাড়া কিছুতেই দেশের মঙ্গল করা যাবে না, দেশের উন্নয়ন করা যাবে না। বিভেদ, অনৈক্য, শত্রুতা পরিত্যাগ করে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। বেগম জিয়া আপনার আগের প্রধানমন্ত্রী, তাকে (বেগম জিয়াকে) বড় বোন ডেকে বুকে টেনে নিয়ে, দেশের উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তাতে আপনারই লাভ হবে অনেক বেশি। মামলা করলে আপনার (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার) ক্ষতি হবে, দেশের ক্ষতি হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তুমি জানো না, খালেদা জিয়া ছাত্রদল আর যুবদলের লোকদের পুলিশে চাকরি দিয়েছে।

মতিয়ার রহমুান রেন্টু বলল, এটা আংশিক সত্য। আসল সত্য হলো টাকা দিয়ে এরা পুলিশে চাকরি নিয়েছে। তারপর যদি ধরে নেই চাকরি পাওয়া সকলেই ছাত্রদল, যুবদলের লোক, তবুও তো তারা এদেশেরই মানুষ। বেগম জিয়া ৭৪৫ জনকে চাকরি দিয়েছে। সেই পথ ধরে আপনি (শেখ হাসিনা) ছাত্রলীগ-যুব লীগের ৭,০০০/- (সাত হাজার) জনকে চাকরি দেন। কিন্তু মামলা করবেন না। মামলায় কোনো ফল হবে না। মামলা করলে বরং আপনি ছোট হয়ে যাবেন।

সব কাজেই তোমাদের বাধা, তোমাদের আপত্তি। এ কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপরে তার শয়নকক্ষে চলে গেলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানা, তাঁর স্বামী শফিক সিদ্দিকী এবং তাদের চাচী ও চাচাতো বোনেরা মতিয়ূর রহমান রেন্টু এবং মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না)'কে ভীষণ তিরস্কার করল।

পরে ঠিকই পুলিশের এই চাকরি দেয়াকে স্বজনপ্রীতি ও দূর্নীতি আখ্যায়িত করে দূর্নীতি দমন ব্যুরো ১৯৯৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে।

গঙ্গা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ট্রানজিট চুক্তি

ভারতের পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ সফরে এলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাংলাদেশের এসেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে চলে এলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে কয়জন ভারতীয় অভিভাবক আছেন, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাদের মধ্যে অন্যতম। শুধু অন্যতমই নয়, শেখ হাসিনা পরিবারের ভারতীয় অভিভাবকদের মধ্যে জ্যোতি বসু সবার শীর্ষে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা সপরিবারে যখন ভারতে ছিলেন, তখন ভারতীয় মুরব্বী বা অভিভাবকদের মধ্যে জ্যোতি বসুর সান্নিধ্য ও স্নেহ পেয়েছেন সবচাইতে বেশি। জ্যোতি বসু পিতৃতুল্য, স্নেহ-মমতা ও সান্নিধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর শেখ হাসিনা যতবার ভারত গিয়েছেন (প্রতি বছর ৩/৪ বার তো যেতেনই), মূলতঃ মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে শলা-পরামর্শের জন্যই গিয়েছেন। জ্যোতি বসুদের বহু সাধনার ফসল আজ শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের সেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আজ এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবেন। গণভবনের ঘরে ঢুকতেই আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৌড়ে এসে জ্যোতি বসুর পায়ে পড়ে পদধূলি নিলেন। দীর্ঘদিন পর পিতা ঘরে এলে নাবালিকা কন্যা যেভাবে ছুটে এসে পিতার পায়ে ধরে, ঠিক সেই ভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ্যোতি বাবুর পায়ে পড়লেন। অতঃপর দোতলার খাস কামড়ায় নিয়ে বসালেন এবং আগে থেকে তৈরি করে রাখা নানা ধরনের খাবার, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই পরিবেশন করে জ্যোতি কাকাকে খাওয়াতে লাগলেন। জ্যোতি কাকা খেতে খেতে পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং ভারত–বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিত বিষয়ে কথা বলতে থাকলেন। এক পর্যায়ে জ্যোতি বাবু বললেন, দেখো মা, গঙ্গার জলটল কিছু পাবে না। আমিই পাই না, আর তুমি কীভাবে পাবে?

আমি প্রধানমন্ত্রী দেব দৌড় এর সাথে আলোচনা করে রেখেছি, তুমি গঙ্গা চুক্তি করে ফেলো। তাতে করে তুমি জল না পেলেও, তোমার বিরোধীরা গঙ্গার জল, গঙ্গার জল বলে রাজনৈতিক ইস্যু আর তৈরি করতে পারবে না। এই সুবিধাটা তুমি পেয়ে যাবে। ২০/৩০ (বিশ-ত্রিশ) বৎসরের একটা চুক্তি করে দেবো। তুমি আবার প্রথমেই ২০/৩০ বছর এর কথা বলতে যেয়ো না। তুমি বলবে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের গঙ্গাচুক্তি করতে যাচ্ছ। তোমার বিরোধিরা এই ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদ নিয়ে চিল্লাপাল্লা করতে থাকবে, পরে আমি ২০/৩০ (বিশ/ত্রিশ) বছর মেয়াদের চুক্তি করে দেবো।

কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী ও জলমন্ত্রীর সাথে আমার এ রকমই কথা হয়েছে। তুমি এভাবেই কাজ চালিয়ে যাও। আর একটা কথা মা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সাথে তুমি সহসা একটা চুক্তি করে ফেলবে। ওদের রেভিনিউ (খাজনা-ট্যাক্স) ওদের থাকবে, ওদের কর্মচারি ওদের থাকবে। ওখানে কখনো কিছু তুমি (সরকার) করতে চাইলে উপজাতীয়দের অনুমতি নিয়ে করবে। এটা আমি কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতাদের কথা দিয়েছি। যথাশিঘ্র সম্ভব তুমি পার্বত্য উপজাতীয়দের সাথে এই চুক্তি সম্পাদন করবে। এই চুক্তির নাম দেবে শান্তি চুক্তি।

এতে তোমারও লাভ হবে। তুমি প্রচার করবে দীর্ঘদিনের যুদ্ধ লড়াই আর অশান্তি দূর করে শান্তি চুক্তি করেছ। সারা দুনিয়ায় তোমার পক্ষে শান্তি শান্তি রব উঠবে। তোমার নামে বাহবা চলবে। বলা যায় না, তুমি নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যেতে পার।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুবোধ বালিকার মতো শুধু জ্বি কাকা, জ্বি কাকা, বলতে লাগলেন।

জ্যোতি কাকা বললেন, আর একটা লাভ তোমার হবে। বল তো কি লাভ? ওরা খুশি হবে।

ওরা খুশি হলে কি হবে? পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্লামেন্টের ৩ (তিন)টি আসনই স্থায়ীভাবে তুমি পাবে, যেমন গোপালগঞ্জের ৩ (তিন)টি আসন পাও।

আর ভারতকে করিডোর দেয়া, ট্রানজিট দেয়া, নৌবন্দর (পোর্ট) দেয়া এসব তো তোমার পিতার সাথে আমাদের পাকা কথা হয়েছিল। তুমি এখন তোমার সুবিধাজনক সময়ে আমাদের (ভারতকে) এগুলো দিয়ে দাও। বেশি দেরি করো না কিন্তু। বেশি দেরি করলে আবার দিল্লির দিকে ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে, বুঝলে ?

পশ্চিম বাংলা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু কাজ শেষে চলে গেলেন। তারপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড় বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি সফরে গেলেন এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি কাকার সাজানো ৩০ বছর মেয়াদ–এর পানিবিহীন গঙ্গাচুক্তি করে এলেন। এরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ফুফাতো ভাই মহান জাতীয় সংসদের বকলম চীফ্ হুইফ মাতাল আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহকে প্রধান করে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি করলেন এবং জ্যোতি বাবুর নীল নকশা অনুযায়ী রাজস্ববিহীন, রাজ কর্মচারীবিহীন এবং রাজ কর্তৃত্ববিহীন পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করলেন। এই শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ঃ–

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো খাজনা-ট্যাক্স পাবে না এবং ঐ অঞ্চলের খাজনা-ট্যাক্স উপজাতীয়রাই সংগ্রহ করবে ও খরচ করবে।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় কোনো কর্মচারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী হবে না। উপজাতীয়রাই উপজাতীয়দের মধ্যে থেকে ঐ সকল কর্মচারীদের নিয়োগ দেবে, পদোন্নতি দেবে এবং বরখাস্ত করবে।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের জলাশয়, ভূমি, বন ইত্যাদি যা কিছু আছে উপজাতীয়রা যদি অনুমতি না দেয় তাহলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অধিগ্রহণ বা একোয়ার করতে পারবে না।

ঘর ভাঙ্গা আসছে এবং ডঃ মহিউদ্দিন মন্ত্রী

১৯৯৬ সালের রমজান মাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে দেশের মান্যবর ব্যক্তি, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, বিদেশী দূতাবাসের লোকজনদের ইফতার পার্টি। গণভবনের ভেতরের বিশাল মাঠে বিশাল প্যান্ডেল, বিশাল আয়োজন। অধিকাংশ অতিথি এসে গেছেন। এমন সময় ডঃ কামাল হোসেন তার দুই তিন-জন সাথী নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে আসছেন। প্যান্ডেলের পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে বসে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা দেখা মাত্র চিৎকার করে ডাঃ কামাল হোসেনের দিকে হাত উঠিয়ে বলে উঠলেন, ঐ যে, ঐ যে, ভর ভাঙ্গা আসছে, ঘর ভাঙ্গা আসছে। এই, এই ঘর ভাঙ্গাকে দূরে বসা। ঘর ভাঙ্গা যেন আমার কাছে না আসতে পারে। ঘর ভাঙ্গাকে দূরে বসা।

এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম ডঃ কামাল হোসেনকে প্যান্ডেলের পশ্চিম পাশের এক কোণে একটি টেবিলে নিয়ে বসালেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘুরে ঘুরে ইফতার পার্টিতে আগত অতিথিদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, সৌজন্য বিনিময় করছেন। কিন্তু ডঃ কামাল হোসেনের দিকে গেলেন না। প্যান্ডেলের এক টেবিলে অন্যান্য স্টাফদের সাথে মাথা নিচু করে বসে আছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন এদিকে এলেন ডাঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর খাওয়া ছেড়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পরলেন এবং এমনভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সালাম দিলেন যে, এটা সালাম না পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি একেবারে ধারে কাছের লোক ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতে পারল না।

ইফতার পার্টির অনুষ্ঠান শেষে গণভবনের নিচতলার ৫ (পাঁচ) নম্বর ড্রইংরুমে বসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইফতার পার্টিতে আসা তার কয়েকজন আত্মীয়ের সাথে আলাপ করতে গিয়ে বললেন, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী বানাতে হবে। মের সাইকেল আরোহী বলল, মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী বানাবেন কি জন্য?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমার ক্ষমতায় আসার পেছনে মহিউদ্দিন খান আলমগীরের অনেক অবদান রয়েছে।

মোটর সাইকেল আরোহী বলল, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর রাজদ্রোহী। মাত্র কিছু দিন আগে সরকারের একজন কর্মকর্তা হয়েও মহিউদ্দিন খান আলমগীর সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাঁকে মন্ত্রী করলে তা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পুরস্কার হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এটা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পুরস্কারের উদাহরণ হয়ে থাকবে। আপনার সরকারের অনেক সরকারি কর্মকর্তা আছে যারা আপনাকে পছন্দ করে না। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পুরস্কারের এই উদাহরণ হয়ে থাকলে, সুযোগ পেলেই তারাও আপনার সরকারের সাথে বিদ্রোহ করবে। মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী করার আগে এই বিষয়টি খেয়ালে রাখতে হবে। আপনি যদি সত্যিই মনে করেন আপনার ক্ষমতায় আসার পিছনে মহিউদ্দিন খান আলমগীরের অবদান আছে, তাহলে আপনি তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। তাহলে আগে তাকে চাকরি থেকে অবসর দিয়ে আপনার উপদেষ্টা করেন। সরাসরি মন্ত্রী না করে মন্ত্রীর মর্যাদা দেন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার করেন। পরের টার্মে মন্ত্রী করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আচ্ছা রেন্টু, তুমি কি আমার সরকারি কাজে কর্মে বাধা দিতেই থাকবা ? না আমাকে কাজ করতে দিবা ?

না নেত্রী, আমি আপনাকে বাধা দিতে যাব কেন ?

তাহলে তুমি এত কথা বলছো কেন ?

আপনি বললেন তাই বললাম।

এখানে তো আরো অনেকেই আছে, কই কেউ তো তোমার মতো বাধা দিচ্ছে না? তুমি এত কথা বলছ কেন?

আগে থেকেই বলে এসেছি, পুরোনা অভ্যাস তাই বলি।

আগে বলছো, তখন আমি শেখ হাসিনা ছিলাম। এখন আমি প্রধানমন্ত্রী।

যতদিন আমি আপনার সাথে আছি, ভালো-মন্দ বলে যাব, শোনা না শোনা, করা না করা আপনার ব্যাপার।

এখনো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা তো দেখো নাই। দেখবা। এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দোতলায় চলে গেলেন। সরকারদ্রোহী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর মন্ত্রী হলেন।

অবাঞ্ছিত ঘোষণা

মতিয়ূর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না) অবাঞ্ছিত হলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মতিয়ূর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না) –কে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে পুলিশ, এসবি, এনএসআই, ডিজিএফআই, সিআইডি, ডিবি সহ রাষ্ট্রের যত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে সকল সংস্থার কাছে নির্দেশ পাঠালেন। নির্দেশে প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, এই অবাঞ্ছিতরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রী যে সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন সে সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে না। এরা যাতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, কার্যালয় এবং অনুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারে সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হলো এবং এই অবাঞ্ছিত ঘোষণাপত্র পত্রিকায়ও প্রকাশ করা হলো।

দশ টাকায় শেখ মুজিবের ছবি

এক শুক্রবার সকালে অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার পিএস ডাঃ পারভেজ, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে এসে দশ টাকায় শেখ মুজিবরে ছবির লেআউট ডিজাইনের খসড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেখান। নতুন এই দশ টাকার লেআউট ডিজাইনের খসড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৌখিকভাবে অনুমোদন করে দিলে তবেই তা ছেপে নতুন দশ টাকার নোট হিসেবে বাজারে ছাড়া হবে। এই দশ টাকার খসড়া লেআউট ডিজাইনের উপরে ছিল আল্লাহর ঘর মসজিদের ছবি এবং পিছনে ছিল শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের ছবি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লেআউট ডিজাইনের খসড়াটি দেখে অর্থমন্ত্রীর পিএস ডঃ পারভেজকে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, একি! জাতির পিতার ছবি পিছনে কেন?

অর্থমন্ত্রীর পিএস ডঃ পারভেজ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, বাজারে চালু বর্তমান দশ টাকার নোটের উপরে মসজিদের ছবি আছে। ধর্মীয় অনুভূতির কথা বিবেচনা করে উপরের মসজিদ এর ছবিটা ঠিক রেখে, পিছনে জাতির পিতার ছবি দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, ওসব মসজিদ-টসজিদ বুঝি না, জাতির পিতার ছবি উপরে দিয়ে নতুন দশ টাকার নোট ছেপে বাজারে ছাড়বেন। আমার বাবা যে জাতির পিতা এটা শয়তানের জাতকে গিলাতে হবে।

এরপর অন্য আর একদিন ডঃ পারভেজ শেখ মুজিবের ছবি উপরে এবং মসজিদের ছবি পিছনে দিয়ে করা লেআউট ডিজাইন নিয়ে এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা দেখেন ও খুশি হন এবং মৌখিক অনুমোদন করে দেন। বর্তমানে বাজারে শেখ মুজিবের ছবি সম্বলিত যে নতুন দশ টাকার নোট রয়েছে এটা সেটা।

পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি

শুধু লাশ চাই। মানুষের লাশ। ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরাচার নিপাত করে গণতন্ত্র মুক্ত করতে দেশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। শহীদ নূর হোসেনের রক্তে ভেজা স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক আন্দোলনে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের পুলিশ বিডিআর ও সেনাবাহিনীর গুলিতে রাজধানী ঢাকাসহ এদেশের অনেক তাজা প্রাণ নিহত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে এরশাদ পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদের নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে পরিচালিত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়া সরকারের পতন আন্দালনে রাজধানী ঢাকা শহরে পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর গুলিতে একজন লোকও নিহত হয় নাই। যদিও ১৯৯১ সালের পর থেকেই খালেদা জিয়া সরকার পতনের লক্ষ্যে নানান ইস্যুতে শুরু হওয়া শেখ হাসিনার আন্দোলনে ঢাকা শহরে মোট ১০৩ (একশত তিন) জন লোক গুলিতে নিহত হয়েছে। তথাপিও এই নিহত হওয়া ১০৩ জন লোকের মধ্যে একজন লোকও পুলিশের বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গুলিতে নিহত হয়নি।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পর থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। কখনো ভ্যাট প্রত্যাহারের আন্দোলন, কখনো সচিবালয় ঘেরাও, কখনো সংসদ ভবন ঘেরাও, কখনো নির্বাচন কমিশন ঘেরাও, কখনো বাজেট বাতিলের দাবি, কখনো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও ইত্যাদি নানা ইস্যুতে ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হওয়া এবং ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করা পর্যন্ত শেখ হাসিনার সকল আন্দোলন, সংগ্রাম ও হরতালের প্রায় প্রতিটি কর্মসূচীতে ২ জন, ৩ জন, ৪ জন করে মানুষ গুলিতে নিহত হয়েছে। এই নিহত হওয়া মানুষেরা কেউই পুলিশ বিডিআর বা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়নি। আবার এই নিহত হওয়া ১০৩ জনের সকলেই নাম গোত্রহীন, পরিচয়হীন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পরিচালিত খালেদা জিয়া সরকার পতন আন্দোলনে আওয়ামী লীগের পরিচয় বহনকারী একজন কর্মীও নিহত হয়নি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিহত হওয়া ব্যক্তিদের তার দল আওয়ামী লীগের কর্মী বলে দাবি করলেও নিহতদের নাম পরিচয় খুঁজে পাননি। এবং বেগম খালেদা জিয়া সরকার বলেছেন নিহতরা নিরীহ পথচারী। আন্দোলনের সময় গুলিতে নহিত হতভাগা ব্যক্তিরা নিরহ পথচারী, না রাজনৈতিক কর্মী সেটা মুখ্য বিষয় না। মুখ্য বিষয় হলো গুলিতে নিহত ব্যক্তিরা পুলিশের গুলিতে নিহত হলো না, বিডিআর এর গুলিতে নিহত হলো না, নিহত হলো না সেনাবাহিনীর গুলিতে। তবে

কাদের গুলিতে ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কেবল টাকা শহরেই ১০৩ জন মানুষ নিহত হলো। হোক না নিহতরা অজ্ঞাত পরিচয়। তবু নিহত হতভাগারা তো এদেশেরই মানুষ ছিল। কারা তাদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করল? হত্যাকারীরা কারা? কি তাদের পরিচয়? কারা হত্যাকারীদের মানুষ খুন করার জন্য মদদ দিলো? কারা হত্যার আয়োজন করল? কার স্বার্থে এতগুলো মানুষ খুন করা হলো? বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ভাষায় নিহতরা পুলিশের গুলিত নিহত না হলেও খালেদা জিয়ার বিএনপি'র সন্ত্রাসীরা নিহতদের গুলি করে খুন করেছে। প্রতিটি আন্দোলন, হরতাল, ঘেরাও কর্মসূচীতে এভাবে নিরীহ পথচারী মানুষ শেখ হাসিনার ভাষায় বিএনপি'র সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হতে লাগল।

যে কোনো ধরনের কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনের দুই দিন আগে ঢাকা শহরের সকল পেশাদার খুনীদের কাছে মানুষ খুন করার জন্য অগ্রিম টাকা পৌঁছে দেয়া হতো। পেশাদার খুনীদের বলা হতো, আমাদের আগামী কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনে লাশ চাই। মানুষের লাশ। হোক সে যে কোনো মানুষের লাশ। এই দেয়া হলো অগ্রিম টাকা। বাকি টাকা লাশ দেয়ার পর। কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনে কর্মসূচীর সফলতার দিকে নজর দেয়া হতো না। গভীর উত্তেজনার সাথে তাকিয়ে থাকা হতো মানুষের লাশ পড়ার সংবাদের দিকে। মানুষের লাশ পড়ার নিশ্চিত সংবাদ না আসা পর্যন্ত, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পানাহার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকত। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খুন হওয়ার চূড়ান্ত খবর না আসত, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শুধু মাত্র চা আর সেই সাথে ফেনসিডিল ছাড়া অন্য কোনো কিছু খেতেন তো নাই–ই, শুধু ছটফট ছটফট করতেন আর – এখনো লাশ পড়ল না, এখনো লাশ পড়ল না, এরপর আমি কি করব? কি কর্মসূচী দেবো?

এখনো লাশ পড়ল না বলে উন্মাদিনী পাগলীর ন্যায় প্রলাশ বকতে থাকতেন এবং ২৯ নম্বর মিন্টো রোডের দোতালা-নিচতলা পায়চারি করতে থাকতেন।

যে মুহূর্তে মানুষ খুন হওয়ার সংবাদ বা লাশের সংবাদ নিয়ে আসা হতো, বঙ্গবন্ধু কন্যা স্বস্তিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলতেন, আমার ক্ষুধা লেগেছে, খাবার লাগাও।

এক দেড়ঘন্টা স্বস্তি ও সুখের নিদ্রা শেষে, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘুম থেকে উঠে, খাওয়া-দাওয়া করে তৈরি হয়ে হাতে রুমাল নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের মর্গে লাশ দেখতে চলে যেতেন। হাসপাতালের মর্গে লাশ দেখে চোখে রুমাল চেপে ধরতেন। ফটো সাংবাদিকরা ছবি তুলত।

"লাশ দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।" – এই ক্যাপসন দিয়ে সেই ছবি পত্রিকায় ছাপা হতো।

সচিবালয় ঘেরাওয়ের এক কর্মসূচীর দিনে দুপুর গড়িয়ে ০২:০০ টা বেজে গেল। কিন্তু লাশ পড়ার কোনো সংবাদ এলো না। এদিক-সেদিক কত লোক পাঠালেন। কিন্তু লাশ পড়ার কোনো সংবাদ নেই। বঙ্গবন্ধু কন্যা তীব্র উত্তেজনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে প্রলাশ বকতে লাগলেন। সকাল ১০:০০ টায় সচিবালয় ঘেরাও করার কথা। এখন পর্যন্ত একটি লাশও পড়েনি। পুলিশ একটি টিয়ার গ্যাসও ছুড়েনি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা বর্তমানে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহম্মেদ শুধু জাতীয় প্রেস ক্লাবের উল্টো দিকে এনএসআই বিল্ডিংয়ের সামনে বিশাল কড়ই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদাম খাচ্ছেন আর পুলিশ অফিসারদের সাথে গল্প করছেন। এদিকে বিজয়নগরে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট সুং গার্ডেন এর সামনে বসে কর্নস্যুপ খাচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেত্রী বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। ২৯ নম্বর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে সংবাদ এলো, লাশ ফেলার মতো নূন্যতম কোনো ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে না। আর তাই লাশ ফেলা যাচ্ছে না।

অর্থাৎ খুনীদের মানুষ খুন করতে যে গোলযোগপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তার নিম্নতম পরিবেশও সৃষ্টি হচ্ছে না। শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের আজকের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। কোনো রকম গোলামাল হচ্ছে না। সব কিছু শান্ত ও স্বাভাবিক রয়েছে। ফলে খুনীরা মানুষ খুন করার সুযোগ পাচ্ছে না। এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, যাও, দ্রুত তোফায়েল ভাইয়ের কাছে যাও, মতিয়া চৌধুরীর কাছে যাও। গিয়ে আমার কথা বলো। সামান্য একটা কিছু করতে বলো। আজ যদি কিছু না হয়, তাহলে আগামী দিনে কর্মসূচী দেয়ার কোনো পুঁজি থাকবে না। যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে বলো সামান্য গোলযোগ সৃষ্টি করতে।

ছুটে যাওয়া হলো, গিয়ে তোফায়েল আহাম্মেদকে বলা হলো, তোফায়েল ভাই, নেত্রী সামান্য গোলযোগ সৃষ্টি করতে বলেছেন ...।

শুনেই ভয়ানক রেগে গিয়ে তোফায়েল আহাম্মেদ বললেন, যাও এখান থেকে, আমি ঐসবে বিশ্বাস করি না। আমি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। আমি ঐ সবে বিশ্বাস করি না। আর একবারও তুমি আমাকে ঐসব বলবে না। তুমি যাও এখান থেকে।

এই কথা বলে তোফায়েল আহাম্মেদ তাড়িয়ে দিলো।

এরপর আসা হলো মতিয়া চৌধুরীর কাছে। মতিয়া চৌধুরী সব শুনে প্রথমে চড়া গলায় বলল, আমি এইগুলো পারব না।

সঙ্গে সঙ্গে চুপ করেন বলে মতিয়া চৌধুরীকে এটা ধমক দিতেই মতিয়া চৌধুরী ভেজা বিড়ালের মতো চুপ মেরে গিয়ে বলল, দেখো, আমি মহিলা মানুষ, আমি কি করতে পারি। তুমি বসো, তুমি বসো, বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, স্যুপ

খাও, স্যুপ খাও। এইদিকে একটা স্যুপ দেন, বলে সুং গার্ডেন–এর বয়কে ইশারা করলেন।

২৯ নম্বর মিন্টো রোডে গিয়ে পরিস্থিতি বলা হলে, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে বললেন, আমি লাশ চাই, যে করেই হোক লাশ চাই।

বেলা তখন ০৩:০০ টা। কাপ্তান বাজারের উত্তর পাশে গুলিস্তান বাসষ্ট্যান্ডের কাছে মানুষ খুনের জন্য খুনীরা অপেক্ষা করতে লাগল। ঢাকার বাইরে থেকে একটা বাস এসে ভিড়ল। কত মায়ের সন্তান, কত বোনের স্বামী, কত সন্তানের পিতা বাস থেকে নামতে শুরু করল। বাস থেকে নামা নাম না জানা নিরীহ ২০/৩০ জন যাত্রীর সামান্য ভিড়। খুনীদের দেশে তৈরি পাইপগান গর্জে উঠল। পাইপগানের এক ঝাঁক গুলি নাম না জানা নিরীহ যাত্রীদের বিদ্ধ করল। ১৪/১৫ জন যাত্রী পিচঢালা রাজপথে লুটিয়ে পরল।

২৯ নম্বর মিন্টো রোডে শুকুনের মতো অপেক্ষায় থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এই সংবাদ দেয়ার সাথে সাথে তিনি পুলকিত হয়ে বললেন, মরছে তো? মরছে তো? যেভাবে গুলি করা হয়েছে তাতে না মরে বাঁচার কথা না। যাও, যাও, মেডিকেল হাসপাতালে যাও, দেখো কয়টা লাশ পড়েছে। দেখে আমাকে খবর দাও। এই ক্ষুধা লাগছে, খাবার দাও।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বলা হলো তিনটা লাশ পড়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তৈরি হয়ে হাতে রুমাল নিয়ে মেডিকেল হাসপাতালের মর্গে গিয়ে গুলিতে নিহতদের লাশ দেখে চোখে রুমাল দিলেন। ফটো সংবাদিকেরা ছবি তুললেন। পত্রিকায় সেই ছবি ছাপা হলো।

নেতা ও উপদেষ্টাদের সাথে সম্পর্ক

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের চাকরতুল্যও মনে করেন না। তাঁর কাছে তাঁর (শেখ হাসিনার) বাসার একটা চাকরের যে মূল্য আছে, যে কদর আছে, যে মর্যাদা আছে আওয়ামী লীগের নেতাদের তাও নেই। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ নেতাদের সম্পর্কে প্রকাশ্যেই বলতেন, এরা সব তো ধান্দাবাজি আর চাঁদাবাজির জন্য আমার সাথে আওয়ামী লীগ করে।

আওয়ামী লীগের এমন কোনো নেতা নেই যিনি, স্বয়ং শেখ হাসিনা এবং তার চাকর-বাকর দ্বারা একবার না একবার অপমান-অপদস্ত হননি। অবশ্য এক্ষেত্রে বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহাম্মেদ এবং ডাক ও তার মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম

ব্যতিক্রম। এই দুই আওয়ামীলীগ নেতা বরবারই শেখ হাসিনার সাথে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। হয়ত অপমান অপদস্ত হওয়ার ভয়েই, কৌশলগত কারণেই দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। তোফায়েল আহাম্মেদ সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি আওয়ামী লীগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লবিং (প্রতিনিধিত্ব) করতেন। আর এ কারণেই শেখ হাসিনা তোফায়েল আহাম্মেদকে পারতপক্ষে ঘাটাতে সাহস পেতেন না। তোফায়েল আহাম্মেদও দলের রাজনৈতিক কলা-কৌশল ইত্যাদি ব্যাপারে শেখ হাসিনার প্রতিপক্ষ কখনোই হতেন না। শেখ হাসিনা যা বলতেন, যা করতেন তোফায়েল আহাম্মেদ কখনোই তার বাধ সাধতেন না বা বিরোধিতা না করে নিরব নিশ্চুপ থাকতেন। এমন কি রাজনীতিতে শেখ হাসিনা যে অস্ত্র, বোমা, জ্বালাও-পোড়াও খুন-খারাবির সৃষ্টি করেছিলেন এবং ঢালাওভাবে যে চাঁদাবাজি শুরু করেছিলেন এর সবই তোফায়েল আহাম্মেদ জানতেন। কিন্তু কখনোই সরাসরি জড়িত হতেন না। ধরি মাছ না ছুঁই পানি এমন একটা ভাবে তোফায়েল আহাম্মেদ থাকতেন। সভা-সমাবেশের মঞ্চে বসেই তোফায়েল আহাম্মেদ গভীরভাবে শেখ হাসিনাকে বলতেন, নেত্রী আপনার গোলন্দাজ বাহিনী ঠিক আছে তো ?

শেখ হাসিনা তোফায়েল আহাম্মেদের প্রশ্ন শুনে খুবই পুলকিত হতেন এবং গর্ব ও দম্ভের সাথে বলতেন, মিরপুরে ৩ হাজার, নারায়ণগঞ্জে ৫ হাজার, ফার্মগেটে ২ হাজার ককটেল, বোমা ও কাটা রাইফেল রেডি আছে, সারাদেশ একবারে তামা বানিয়ে দেবো।

তোফায়েল প্রশ্ন করেন, আর এ্যাকশন বাহিনী (এ্যাকশন বাহিনী মানে মানুষ খুন করার জন্য পেশাদার খুনি)?

শেখ হাসিনা বলে, সারা ঢাকা শহরেই এ্যাকশন বাহিনী তৈরি আছে। হুকুম দিয়েই লাশ পাওয়া যাবে। নতুন কর্মসূচী দিতে অসুবিধা হবে না।

এসব শুনে তোফায়েল আহাম্মেদ বলতেন, হ্যাঁ নেত্রী, সব ঠিকঠাক মতো দেখেন।

শেখ হাসিনা সভা-সমাবেশ মিছিলে গেলেও দলীয় কার্যালয়ে তেমন একটা যেতেন না। ফলে বাধ্য হয়েই শেখ হাসিনার বাসায় শেখ হাসিনার সাথে দেখা করার জন্য যখন যে নেতাই এসেছেন সে নেতাই হয় চাকর-বাকর দ্বারা, না হয় শেখ হাসিনার পোষা আত্মীয় দ্বারা অপমানিত হয়ে ফেরত গিয়েছেন। এক পর্যায়ে নেতারা শেখ হাসিনার বাসায় আসাই ছেড়ে দিয়েছিল। যে দু'একজন নেতা আসত তারা মতিয়ূর রহমান রেন্টু অথবা মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টুকে (ময়না) বিনয়ের সাথে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলতেন, একটু নেত্রীর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, দেখা করা কি সম্ভব হবে?

আপনি বসুন, দেখছি বলে মতিয়ূর রহমান রেন্টু দোতলায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে আসত। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে টেলিভিশনে ডিস এ্যান্টিনায় অথবা ভিসিয়ারে হিন্দি সিনেমা দেখছেন। সিনেমার সাথে নাচছেন, গাইছেন, হাসি-ঠাট্টা করছেন।

সভা-সমাবেশ, মিছিলের কর্মসূচী না থাকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সাধারণত আত্মীয়দের নিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখেই দিন কাটান। হিন্দি ছবির মধ্যে যে ছবিতে অসৎ রাজনীতিক নেত-নেত্রীদের খুন-খারাবি, ঘুষ, কালোবাজারির হীন চরিত্র রয়েছে, বেছে বেছে সেই সকল হিন্দি সিনেমাগুলোই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সারা দিন বসে দেখতেন এবং রপ্ত করতেন। শুধু দেখা এবং রপ্ত করার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সীমাবদ্ধ থাকতেন না। হিন্দি সিনেমার রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর চরিত্রে সমাজে খুন-খারাবি, ঘুষসহ যত রকমের খল চরিত্র দেখানো হয়, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তা রপ্ত করে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণের উপর আবার তা অনুশীলন করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাক্ষাৎকার প্রার্থী নেতাকে নিচে বসিয়ে রেখে মতিয়ুর রহমান রেন্টু দোতলায় এসে যখন বলত, আপনার কেন্দ্রীয় অমুক নেতা আপনার সাথে দেখা করতে চায়, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন হিন্দি ফিল্ম দেখছেন, যেই কেন্দ্রীয় নেতা দেখা করতে চান শুনলেন, অমনি দূর দূর! খেদাও খেদাও! বলে উঠতেন।

অগত্যা মতিয়ূর রহমান রেন্টু নিচে এসে কেন্দ্রীয় নেতাকে বলত, লিডার আপনি বাসায় আছেন না? নেত্রী (শেখ হাসিনা) দরজা বন্ধ করে রেখেছেন, কয়েকবার দরজায় টোকা দেয়ার পরও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আপনি বাসায় আছেন না লিডার? নেত্রী দরজা খুললেই আপনাকে বাসায় ফোন করে দেবো। ফোন করার পর আপনি চলে আসবেন। এভাবে কৌশল করে নেতাদের বিদায় করা হতো। নেতারাও বুঝত যে, নেত্রীর কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই। নেতারাও বলত, ঠিক আছে, ঠিক আছে, নেত্রী উঠলেই আমাকে ফোন করে দিও। আমি বাসায়ই আছি।

ফোন যে আর যাবে না এটাও নেতারা বুঝত। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পোষ্য আত্মীয় থাকতে কেন নেতারা মতিয়ূর রহমান রেন্টুর কাছে আসত ? কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে নেতারা জানতেন পোষ্য আত্মীয়দের কাছে গেলে, নির্ঘাত অপমান-অপদস্ত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হওয়া ভাগ্যে নেই। শুধু পোষ্য আত্মীয়তারই নয়, বেতনভূক্ত চাকর-বাকরের কাছে গেলেও একই অবস্থা। তাই নেতারা মতিয়ূর রহমান রেন্টুর কাছে আসতেন শুধু এই ভরসায় যে, সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে না পারলেও, অন্তত অপমান-অপদস্ত হতে হবে না। নেতাদের এই অপমান-অপদস্ত হওয়ার পিছনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার অবদানই

সবচেয়ে বেশি। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং নিজে নেতাদের দূর দূর করতেন, অপমান-অপদস্ত করতেন বলেই তার পোষ্য আত্মীয় ও চাকর-বাকরেরাও তাই করতেন।

মতিয়ূর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ূর রহমান রেন্টু (ময়না) ছাড়া বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আশেপাশে একজনও ভদ্রলোক ছিল না। চরম অভদ্র এবং নিতান্তই ছোটলোকের সন্তান ছোট লোক দ্বারা শেখ হাসিনা পরিবেষ্টিত থাকতেন এবং এখনও আছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে অজস্র ছোটলোকের সন্তান, ছোটলোকদের অভদ্র ছোটলোকি আচার-আচারণ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জানতেন না, তা নয়। তিনি (শেখ হাসিনা) সবই জানতেন। শুধু জানতেনই না, জেনে শুনেই এদের অসভ্য, অভদ্র, ছোটলোকি আচার-আচারণকে তিনি (শেখ হাসিনা) রীতিমতো প্রশ্রয় দিতেন। এরা এতই অসত্য, অভদ্র, ছোটলোক যে এরা কখনোই মানুষকে সালাম দিত না বরং কেউ এদের সালাম দিলে এরা সালামও নিত না।

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের ভাগ্যেও একই আচার-আচরণ প্রযোজ্য ছিল। কোনো উপদেষ্টা কখনোও বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে গেলে দূর দূর! উপদ্রপ খেদাও, উপদ্রপ খেদাও! বলে তিনি (শেখ হাসিনা) তাদের বিদায় করতেন।

কুত্তার জাত

মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বর্তমান এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমান–এর স্ত্রী আইভি রহমান ১৯৯২ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জনৈক মহিলার নাম উল্লেখ করে বললেন, নেত্রী ওর নামে অনেক স্ক্যান্ডাল আছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কি বেশ্যা এই তো? কুত্তার (কুকুরের) জাতকে তো বেশ্যা দিয়েই নেতৃত্ব দেয়াব।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মুখে এই কথা শোনার পর আইভি রহমান থ' হয়ে যান। আর একটি কথাও না বাড়িয়ে বিদায় নেন।

জিল্লুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারি

ধানমন্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরি কক্ষে বসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ হাফিজুর রহমান টোকন, শেখ মারুফ এবং আরো কয়েকজন গল্প করছে।

আওয়ামী লীগের আসন্ন কাউন্সিলে কাকে জেনারেল সেক্রেটারি করা যায় কথা উঠলে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সাজেদা চৌধুরী মেয়ে মানুষ, তাকে জেনারেল সেক্রেটারি রাখা চলে না। তোমরা এমন একজন পুরুষের নাম বলো, যে শুধু নামেই পুরুষ। কিন্তু কাজেকর্মে মেয়ে মানুষের চেয়েও লেবেন্ডিস। পুরুষ চরিত্রের কোনো পুরুষকে জেনারেল সেক্রেটারি বানানো যাবে না। পুরুষ চরিত্রের কোনো পুরুষকে দলের সেক্রেটারি করলে সে আব্দুর রাজ্জাকের মতো দল ভেঙ্গে ফেলবে। একজন পুরুষকেই দলের সাধারণ সম্পাদক করতে হবে, যে পুরুষ নামে পুরুষ, কাজে পুরুষ নয়। এমন একজন মেরুদণ্ডহীন পুরুষকে দলের সাধারণ সম্পাদক করতে হবে। তোমরা খুঁজে এমন একজনকে বের করো।

শেখ হাফিজুর রহমান টোকন বলল, ফুপু, জিল্লুর রহমানকে বানালে কেমন হয়?

সঙ্গে সঙ্গে শেখ হাসিনা বললেন, ইয়েস, তুমি তো ঠিক বলেছ, ওই তো সবচাইতে ফিটেস্ট।

শেখ মারুফ বলল, না বুবু (আপা), জিল্লুর রহমানকে বানানো যাবে না। জিল্লুর রহমান আর তার বউ আইভি রহমান ১৫ই আগস্টের পর খুনি ফারুক ডালিমাদের দাওয়াত করে বিরানী রান্না করে খাইয়েছিল। সুতরাং জিল্লুর রহমানকে তুমি জেনারেল সেক্রেটারি বানাতে পারো না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, হ্যাঁ, একেই আমার দরকার। এই-ই সবদিক থেকে উপযুক্ত। জিল্লুর রহমানকে দলের জেনারেল সেক্রেটারি করলে, ভেড়া বানিয়ে রাখা যাবে। এই ভেড়ার গলায় রশি না থাকলেও উঠানের বাইরে যাবে না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই কাউন্সিল করে জিল্লুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক করলেন।

টাকা আর লাশ

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক জীবনে দুষটি জিনিস ছাড়া আর কোনো কিছুই চেনেননি। জিনিস দু'টির একটি হলো অর্থ, মানে টাকা-পয়সা আর অন্যটি হলো লাশ, মানে মানুষের লাশ। এই দু'টি জিনিস ছাড়া তার দলের নেতাকর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং অন্যান্য যারা তার (বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার) কাছে এসেছেন তাদের কাছে কোনোদিনই তিনি অন্য কোনো কিছুই চাননি। এমন কি ২৮শে সেপ্টেম্বর তার জন্মদিনে যারা টাকা ছাড়া অন্য কোনো কিছু উপহার নিয়ে আসতেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভর্ৎসনার সাথে তাদের বলতেন, এইগুলি আমি নেই না। আমি ক্যাশ চাই, ক্যাশ। নগদ টাকা ছাড়া অন্য উপহার আমি গ্রহণ করি না।

১৯৯৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গণভবনে বসেও তিনি একই কথা বলেছেন। অর্থের দাবি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রধান দাবি। আপনি যেই হোন না কেন, যেখান থেকেই টাকা নিয়ে আসেন না কেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কথা হচ্ছে, তাকে টাকা দিতে হবে। যদি টাকা না দেন তাহলে তার (শেখ হাসিনার) কাছে মানুষ হিসেবেই গণ্য হবেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ডান হাতে টাকা দেবেন, ডান হাতের টাকা বা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি (শেখ হাসিনা) আপনার কথা বেমালুম ভুল গিয়ে টাকার জন্য নতুন মক্কেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন। এমনভাবে তিনি টাকা নেবেন, যেন তার পিতা শেখ মুজিবর রহমান আপনার কাছে টাকা রেখেছিলেন। তিনি শেখ হাসিনা পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে পিতার টাকাই আপনার কাছ থেকে নিচ্ছেন। টাকা চাই-ই-চাই। টাকা দিতেই হবে। চুরি করে টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে। কালোবাজারি বা পাচার করে টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে। মানুষ খুন করে টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে। ঘুষ খেয়ে টাকা এনেছেন তাও দিতে হবে।

ঘুষ খেতে এবং ঘুষ দিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জুড়ি মেলা ভার। টাকা না দিলে আপনাকে মুহূর্তের মধ্যে অপমান করে বের করে দিতে পারেন, আবার টাকা দিলেই আপনাকে সমাদর করে মর্যাদা দিয়ে চেয়ারে বসাতে পারেন।

একদিন ধানমণ্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরি কক্ষে বসে আছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল। এমন সময় বজলুর রহমান (শেখ মুজিবের পিএ, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লিয়াজো অফিসার) জনৈক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বলল, নেত্রী ইনি একটা অনুষ্ঠান করতে চায়....। বজলুর রহমানের কথা শেষ না হতেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রেগে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে আগন্তুক লোকটিকে বললেন, এখানে কি ইতরামি করতে এসেছেন? বানরামির আর জায়গা পান না? আপনাকে না বলে দিয়েছি, আমি যাব না? আবার এসেছেন বুঝি ফাতরামি করতে? আপনি কোথাকার কোন আলতু-ফালতু লোক তার ঠিক নাই, আর আমি আলতু-ফালতু লোকের আলতু-ফালতু অনুষ্ঠানে যাব – এটা ভাবলেন কি করে? আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা, আমার কি কোনো দাম নেই? যান, বেড়িয়ে যান! এই লোককে বের করে দাও। এই লোক যেন আর ঢুকতে না পারে। ভদ্রলোক প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক দরজা পর্যন্ত যেতেই শেখ হেলালকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এই লোক চান্দা দেয় না, আবার চিটাগাং এর লোক। এই কথা শুনে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়িয়ে এনেছি, বলে তার প্যান্টের দু'পকেট থেকে দু'টি একশত টাকার ব্যান্ডিল বের করে এক লাফে শেখ হাসিনার টেবিলের সামনে এসে পড়লেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা চিলের মতো ছোঁ মেরে একশত টাকার বান্ডিল দু'টি নিজের হাতে নিয়ে ভদ্রলোককে বলতে লাগলেন, বসেন, বসেন। এই উনাকে চা-নাস্তা খাওয়াও।

শেখ হেলাল আবার টাকার বান্ডিল দু'টি নেয়ার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে ভদ্রলোকের সামনেই কাড়াকাড়ি শুরু করল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এর মধ্যেই ভদ্রলোককে বলতে লাগলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি যাব। অনুষ্ঠানটা একটু ভালো করে করেন। আপনি আসবেন। ঘন ঘন আসবেন।

১৯৯২ সাল থেকে যমুনা সেতুর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কোরিয়ান হুন্দাই কোম্পানি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে আসত। আর সে জন্যই যমুনা সেতু উদ্ধোধনের কয়েক দিন আগে উত্তর বঙ্গের জন্য নির্মিত গ্যাস লাইন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যমুনা নদীতে পড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্যাস লাইন নির্মাণে হুন্দাই কোম্পানির ক্রটি, অনিয়ম ও নিম্নমানের অভিযোগ আনলেও শেখ হাসিনার সরকার বেমালুম নিরব থাকে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মীকে কখনোই নীতির কথা শোনাননি। আদর্শের কথা শোনাননি। ত্যাগের কথা শোনাননি। যে-ই তাঁর কাছে গিয়েছে তাকেই তিনি কারণে-অকারণে শুধু বলতেন, আমি নির্দেশ দিলাম মেরে লাশ ফেলে দাও। আমি লাশ চাই।

আওয়ামী লীগের বর্তমান মন্ত্রীরা অনেকেই বলতেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা তো টাকা আর লাশ ছাড়া কিছুই বোঝে না। আর কত টাকা দেবো, আর কত লাশ দেবো? অবক্ষয়। অবক্ষয়।

শিল্পপতি জহির হত্যার প্রধান খুনী আসামী ইউসিবিএল ব্যাংকের পরিচালক চেয়ারম্যান আক্তারুজ্জামান বাবু বলেন, আর কত টাকা দেবো, দিতে দিতে তো নিঃশেষ হয়ে গেলাম।

স্বামীর সাথে না থাকা

বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮৬ সনের ১৭ই মে বাংলাদেশে আসার পর থেকে তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে কখনোই একটি দিন বা একটি রাত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কাটাননি। আগেই বলেছি, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার পর প্রথমে তার স্বামীর মহাখালী সরকারি কোয়ার্টারে ওঠেন, পরে ধানমণ্ডি বত্রিশে তার পিত্রালয় বঙ্গবন্ধু ভবন, তারপর ২৯ নম্বর মিন্টো রোড এবং আরও পরে ধানমণ্ডি ৫ নম্বরে স্বামী ও নিজের বাড়িতে, এখন প্রধানমন্ত্রী সরকার বাসভবন গণভবনে থাকেন। কিন্তু তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত

তার (ডঃ ওয়াজেদের) মহাখালীর আণবিক শক্তি কমিশনের কোয়ার্টারেই রয়েছেন। তিনি কখনোই ধানমন্ডি ৩২ নম্বর, ২৯ মন্টিরোড, ধানমণ্ডি ৫ নম্বর বা গণভবনে আসেননি এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও তাকে আনেননি। শুধু তাই-ই নয়, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যখন তার স্বামীর মহাখালী কোয়ার্টারে থাকতেন তখন ডঃ ওয়াজেদ থাকতেন ঐ কোয়ার্টারের ভিতরের রেস্ট হাউজে। দু'জনার দু'জনের সাথে রাতদিন দেখা সাক্ষাৎ তো দূরের, মুখোমুখিও হতেন না।

মহাখালী স্বামীর কোয়ার্টারে থাকতে এবং পরবর্তীতে ধানমণ্ডি বত্রিশের পিত্রালয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনে থাকতে, ১৯৮৭ সালে মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ ছাত্র সংগঠনের ভিপি মৃণাল কান্তি দাস নামের তরুণ যুবক আসার আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিয়মিত, রুটিন মাফিকভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যার ঠিক এক ঘন্টা আগে গোসল করে পাউডার, পারফিউম মেখে লম্বা চুলের একটি বেণী করে, চকচকে নতুন শাড়ি-ব্লাউজ পড়ে খুবই পরিপাটি হয়ে কাউকে সঙ্গে না নিয়ে শুধুমাত্র গাড়ির চালক ড্রাইভার আলালকে সঙ্গে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে বেরিয়ে যেতেন এবং ঘন্টা দু'য়েক পরে ফিরে আসতেন। শুধু এই সময়ে ঐ অজ্ঞাত স্থানে যাওয়া ছাড়া বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আর কখনোই একা শুধু জিপ গাড়ি আর চালক নিয়ে বাইরে যেতেন না। ঐ সময় এবং ঐ অজ্ঞাত স্থান ছাড়া যেখানেই তিনি যেতেন তার সাথে সকলকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

১৯৮৭ সালে মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি তরুণ যুক মৃণাল কান্তি দাসের সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পরিচয় হয় এবং পরিচয়ের পর থেকেই মৃণাল কান্তি দাস ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে দিবা-রাত্রি সার্বক্ষণিকভাবে থাকতে শুরু করল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন ঐ বাড়িতেই থাকেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধীরে ধীরে নিয়মিত রুটিন মাফিক সন্ধ্যার আগে অজ্ঞাত স্থানে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। অধিক রাত পর্যন্ত, এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত ধানমণ্ডি বত্রিশের বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরিতেই অবস্থান করতে লাগলেন।

হিন্দুরা কেন আওয়ামী লীগ সমর্থন করে

এদেশের সকল হিন্দু একেবারে কায়মনে হিন্দুস্থানে বিশ্বাস করে। হিন্দুরা এই দেশে থাকলেও হিন্দুস্থান বা হিন্দুরাষ্ট্র ভারতকেই তাদের দেশ মনে করে। বাংলাদেশকে কখনোই হিন্দুরা তাদেরে দেশ মনে করে না। তবে তাদের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশ একদিন না একদিন হিন্দুদের রাজ্য ভারতের দখলে যাবে। আর এ বিষয়ে তারা আওয়ামী লীগকে নিকট বন্ধু মনে করে। এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস – একমাত্র আওয়ামী লীগই হচ্ছে, বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক দল যে

দলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একদিন না একদিন হিন্দুস্থানের অধীনে নেয়া যাবে। আর এ কারণেই এদেশের আপামর হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মহাসচিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক এর মতে আওয়ামী লীগই হচ্ছে এদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল যে দল ভারত–পাকিস্তান দ্বন্দ্বে বা সংঘর্ষে ভারতকেই সমর্থন জানাবে, শক্তি যোগাবে। এ জন্যই এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, শক্তি যোগায়। স্বল্প শিক্ষিত মিষ্টির দোকানদার রাম হরি মজুমদারের মতে একদিন দেখবা আওয়ামী লীগে কোনো মুসলমানই থাকব না। তখন এই আওয়ামী লীগই হিন্দু লীগ হইব। আমরা জয় হিন্দে বিশ্বাস করি। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। শ্লোগানে মিলটা দেখো না ? আবার জয় দূর্গা, জয় মা কালী, জয় বাংলা একই ধ্বনি, তাইলে আওয়ামী লীগ করুম না, তয় করুমটা কি? আওয়ামী লীগ তো আধা হিন্দুই, এক সময় পুরাটা হিন্দু হইয়া যাইব।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসের সদস্য বন বিভাগের উচ্চ পদস্থ হিন্দু কর্মকর্তার মতে, আওয়ামী লীগ হচ্ছে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দল, তাই হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগে বিশ্বাসী সম্প্রদায়। এদেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগকে শুধু ভোটই দেয় না। অর্থ দেয়, বুদ্ধি দেয় এবং তারা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এদেশের হিন্দু সাংবাদিকরা সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করে। সবচাইতে ভয়ের ও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, হিন্দু বিচারপতিরাও বিচারে পক্ষপাতিত্ব করে। হিন্দু বিচারপতিগণ, বিচারপতির আসনে বসে প্রথমেই বোঝার চেষ্টা করেন, বাদী বা বিবাদী কোন রাজনৈতিক দলের লোক বা সমর্থক? যদি আওয়ামী লীগের লোক বা সমর্থক হয়, তাহলে তাকে যতটা সম্ভব লঘু দণ্ড দেয়া হয়। আর যদি আওয়ামী লীগের লোক বা সমর্থক না হয় তাহলে তাকে যতটা সম্ভব গুরুদণ্ড দেয়া হয়।

প্রশাসন ও ব্যাবসায় থাকা হিন্দু সম্প্রদায়ের বৈধ বা অবৈধভাবে তাদের উপার্জিত অর্থের একটা অংশ অবলীলাক্রমে শেখ হাসিনাকে দেয় এবং বাকি সম্পূর্ণ অংশ ভারতে পাচার করে।

পাচার

এই দেশের হিন্দু সম্প্রদায় চাকরিজীবিই হোক আর ব্যবসায়ী হোক, অবলীলাক্রমে এই দেশের সকল ধন-সম্পদ ভারতে পাচার করে। চাকরিজীবি বৈধ-অবৈধ যেভাবেই অর্থ উপার্জন করুক, অর্থাৎ অসৎ পথে ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমেই অর্থ উপার্জন করুক কিংবা চাকরির বেতনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুক, যেভাবেই

উপার্জন করুক তাদের উপার্জিত সকল ধন-সম্পদই ভারতে পাচার করবে। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। হিন্দু সম্প্রদায় কখনোই এই দেশকে তাদের দেশ মনে করে না। আর তাই এ দেশে থেকে বৈধ-অবৈধভাবে উপার্জিত সমুদয় অর্থ ভারতে পাচার করে।

অনুরূপভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবার-পরিজন সকলেই এই দেশকে নিজের দেশ মনে করে না। আর সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা বৈধ-অবৈধ যেভাবেই অর্থকরি উপার্জন করুক না কেন, বাংলাদেশে একটা ফুটাকড়িও রাখেন না। তাদের উপার্জিত সকল ধন-সম্পদ বিদেশে পাচার করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের লোকেরা প্রধানত ভারত, সিঙ্গাপুর, হংকং, লন্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ধন-সম্পদ পাচা করেন।

ভ্যাট প্রত্যাহার

১৯৯২ সালে বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট প্রথা চালু করে। খালেদা জিয়া ভ্যাট চালু করার সময় তখনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দল আওয়ামী লীগ ভ্যাট প্রথা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ভ্যাট প্রথা বাতিলের দাবিতে মিছিল সমাবেশ করে বেগম জিয়া সরকারকে নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এর মধ্যে ভ্যাট প্রথা বাতিল না করলে হরহাল করা হবে।

তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো, আপনি যে ভ্যাট বাতিলের জন্য হরতাল আহ্বান করতে যাচ্ছেন, আপনি ক্ষমতায় গেলে কি করবেন? ভ্যাট প্রথা বাতিল করবেন?

পরেরটা পরে হবে, এ কথা বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই ভ্যাট বাতিলের দাবিতে হরতাল করলেন। আর তিনি (শেখ হাসিনা) যখন ক্ষমতায় এলেন, তখন ভ্যাট বাতিল তো দূরের কথা, উল্টো ভ্যাটের আওতা আরো বাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া সরকার যে সকল পণ্যের উপর ভ্যাট বসিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সে সকল পণ্যের উপর ভ্যাট বহাল তো রাখলেনই বরং যে সমস্ত পণ্যের উপর ভ্যাট ছিল না সে সমস্ত পণ্যের উপরও ভ্যাট ধার্য করলেন।

খেলা

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে একজন বড় খেলোয়ার মনে করেন। তিনি মনে করেন, তিনি দুনিয়ার সবচাইতে দক্ষ খেলোয়ার এবং তার মতো

খেলোয়ারের সারা বিশ্বে কোনো জুড়ি নেই। তিনি খেলতে ভালবাসেন। বলতে গেলে খেলাই যেন তার একমাত্র কাজ। তিনি সকলের সাথেই খেলেন। জনতার সাথে খেলেন। রাজনৈতিক নেতাদের সাথে খেলেন। নিজের দলের কর্মীদের সাথে খেলেন। স্বামীর সাথে খেলেন। আত্মীয়-স্বজনের সাথেও খেলেন, তবে কম খেলেন। নিজের বোনের সাথে খেলেন, তবে পেরে উঠেন না, ধরা পরে হেরে যান। ছেলেমেয়ের সাথে খেলতে গিয়ে প্রচণ্ড মার খেয়ে যান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন তার মতো এতো বড় খেলোয়ার আর নেই এবং তিনি যে খেলা খেলেন, সে খেলা ধরার বা বোঝার শক্তি কারো নেই। পৃথিবীর কেউই তার খেলা ধরতে পারবে না, বুঝতে পারবে না। এ খেলায় তিনি অনন্য, অদ্বিতীয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে খেলা খেলেন, সে খেলার নাম হচ্ছে প্রতারণার খেলা। তিনি সকলের সাথেই প্রতারণার খেলা খেলেন।

প্রিয়-অপ্রিয়, পছন্দ-অপছন্দের

প্রিয় খাদ্য	ঃ	গরুর ভুড়ী;
প্রিয় গান	ঃ	জিন্দেগি জিন্দেগি;
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	ঃ	মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু;
সবচাইতে বেশি লোভ	ঃ	টাকার প্রতি;
সবচাইতে অপছন্দের	ঃ	নামাজী মানুষ;
সবচাইতে স্বস্তি এবং আনন্দের	ঃ	মানুষের লাশ;
সবচেয়ে বেশি পটু	ঃ	মিথ্যে বলায়।

প্রথম নির্দেশ

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রথম নির্দেশ মেরে ফেলো। মেরে লাশ ফেলে দাও। আওয়ামী লীগের কোনো নেতা, কর্মী কিংবা সমর্থক কথা প্রসঙ্গেও যদি বলে প্রশাসনের অথবা অন্য রাজনৈতিক দলের অমুক আমাদের বিপক্ষের, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথমেই যে নির্দেশ বা আদেশ দেন তাহলো মেরে ফেলো, মেরে ফেলে দাও। আমি হুকুম দিলাম খুন করে ফেলো।

যদি কোন কারণে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা না যায় তাহলে বলবেন, ঘুষ দাও, টাকা দাও। টাকা দিয়ে ওকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসো।

১৯৯৫ সালে মাওয়া রোড দিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার সময় ফেরিতে ৩০/৪০ বছর আগে দেশ থেকে যুক্তরাজ্যে চলে যাওয়া, যুক্তরাজ্যের নাগরিক শেখ হাসিনা

সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত শিল্প ঋণ সংস্থার পরিচালক প্রফেসর আবুল আসেম তার নিজ থানা নবাবগঞ্জ সম্পর্কে বললেন, নবাবগঞ্জে (ঢাকা জেলার) আওয়ামী লীগের প্রার্থী দেয়া না দেয়া সমান কথা। নবাবগঞ্জের মানুষ আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না, ভোটও দেয় না।

এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, রাতের অন্ধকারে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেন। আগুন লাগিয়ে ওদের পুরিয়ে মেরে ফেলেন।

কোনো নেতা ছিল না

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কখনোই কোনো সিদ্ধান্ত কোনো নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অথবা উপদেষ্টা কিংবা জ্ঞানী-গুণী কোনো ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করে নিতেন না। মূলতঃ তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন তার চারপাশে থাকা ছেলে-ছোকরা এবং আত্মীয়দের কথার উপর ভর করে। এমনকি বঙ্গবন্ধু কন্যা কোনো পদযাত্রা, মিছিলে ইত্যাদি যখন অংশ নেন তখন কোনো নেতা বা নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি তাঁর সাথে কখনোই থাকতেন না। কোনো নেতা বা ঐ জাতীয় কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে যদি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রীর পাশে এসে পড়তেন, তাহলে তাঁর সাথে থাকা ছেলে-ছোকরারা ঐ নেতা বা ব্যক্তিকে কিল-ঘুষি, চর-থাপ্পড় এমনকি লাথি-গুতা দিয়ে তাড়িয়ে দিত। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এসব বুঝতেন না বা দেখতে না তা নয়। তিনি এ সবই আড়চোখে দেখতেন, মজা নিতেন, আর খিলখিল করে হাসতেন। মূলতঃ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার ইন্ধন ও আস্কারার ফলেই তার সাথে থাকা ছেলে-ছোকরারা নেতাদের সাথে ঐ রকম চরম বেয়াদবির আচার-আচরণ করতে সাহস পেত।

চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলা

কোনো কথাবার্তা বা ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারেও কারো সাথে কখনোই কোনো আলোচনা করা তো দূরের কথা, নিজেও কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মুখে যাই আসে, তাই বলে ফেলেন বা তাই ঘোষণা দিয়ে দেন। আওয়ামী লীগের নেতারা এবং শুভানুধ্যায়ীরা সবসময় টঠস্থ থাকেন, এই বুঝি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বেফাঁস কিছু বলেন ফেলেন।

১৯৯৭ সালের ১০ই জানুযারি রমনা বটমূলে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তৃতা করার সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার মন্ত্রীসভার মন্ত্রী তোফায়েল আহাম্মদকে হাত তুলে দেখিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, "ঐ যে তোফায়েল ভাইয়েরা ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসে অযোগ্য লোকদের চাকরি দিয়েছিল, তার এই কথায় দাড়ালো তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী

হিসেবে বলছেন বা ঘোষণা করছেন বর্তমানে তারই মন্ত্রী তোফায়েল আহামেদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী তারই পিতা শেখ মুজিবর রহমানের আমলে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডার (বিসিএস) সার্ভিসে অযোগ্য লোকদের চাকরি বা নিয়োগ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রের নির্বাহী হিসেবে এই কথা প্রকাশ্যে বলার পর (তার পরদিন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই সংবাদ ছাপা হয়েছে) বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিস (বিসিএস ৭৩) ১৯৭৩ এর সকলের অযোগ্যতার অভিযোগে চাকরি যাওয়া উচিৎ এবং রাষ্ট্রের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী বা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের অযোগ্য লোককে চাকরি দেয়ার অভিযোগে বিচার হওয়া উচিৎ। নইলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হওয়া উচিৎ।

রাজা-বাদশা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের জুনিয়র সারির নেতারা একদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র জয়কে বলছে, "আমরা আছি, আপনি যখন প্রধানমন্ত্রী হবেন তখন আপনার সাথে আমরা আছি।"

জয় বলছে, "প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা করে। ভোট ভিক্ষা করে আমি কোনোদিন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হব না। যদি রাজা বানান তাহলে আছি, নইলে নাই।"

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "বাবা আমরা তো রাজাই, আগামীতে তো তুমিই রাজা হবা। তোমার নানা তো এদেশের রাজাই ছিলেন, তোমার নানাই তো এই দেশ সৃষ্টি করেছে, এই দেশের মালিক ছিল। চাকর- বাকররা ষড়যন্ত্র করে তোমার নানাকে মেরে সিংহাসন দখল করেছে।

আলীবর্দী খাঁ যেমন বাংলার নবাব ছিলেন, তারপরে তাঁর নাতি সিরাজদ্দৌলা নবাব হয়েছিল। তোমার নানা শেখ মুজিবর রহমানও বাংলাদেশের রাজা ছিল, আগামীতে তুমিই বাংলাদেশের রাজা হবে। রাজা বাদশাদের আধুনিক নামই রাষ্ট্রপতি–প্রধানমন্ত্রী।

ওয়াদা

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে মূলতঃ এবং প্রধানতঃ তিনটি ওয়াদা করেছিলেন। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াদার প্রথমটি হচ্ছে – রেডিও–টেলিভিশন এর স্বায়ত্বশাসন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে – বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ (যে আইনে বিচারে যে কাউকে কারাগারে আটক রাখা যায়) বাতিল করবেন এবং তৃতীয় হচ্ছে – বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা বা পৃথক করবেন।

এই তিনটি ওয়াদার প্রথমটি টেলিভিশন ও রেডিও–এর স্বায়ত্বশাসন মাশাল্লাহ। এটা বলার বা লেখার কোনোই প্রয়োজন পড়ে না। এরশাদ–এর আমলে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা লক্ষ লক্ষ বার টেলিভিশনকে বলেছেন সাহেব, বিবি গোলামের বাক্স।

বেগম খালেদা জিয়ার আমলে বিরতীহীন ও লাগামহীনভাবে এমন কোনো অনুষ্ঠান নেই যেখানে টেলিভিশনের কথা তিনি বিবি, গোলামের বাক্স বলেননি।

এখন সেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার ওয়াদা এমনভাবে পূরণ করেছেন যে মানুষ এখন বলে বাপ-বেটির বাক্স।

আর দ্বিতীয় ওয়াদা বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনা বিচারে মানুষকে কারাগারে রাখার এই কালো আইনটি বাতিল করবেন কিভাবে? কোন যুক্তিতে? এ যে তার পিতা শেখ মুজিবের তৈরি করা কালো আইন। এই বিশেষ ক্ষমতা আইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান মুক্তিযোদ্ধাসহ এদেশের হাজার হাজার নির্দোষ নিরপরাধ মানুষকে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রেখেছিল। পিতার সৃষ্টি করা মানুষকে নিগৃহীত করা ও অত্যাচার করা এই কালো আইন তিনি বাতিল করলে, পিতার যোগ্য কন্যা, যোগ্য উত্তরসূরী তিনি কীভাবে দাবি করবেন ?

তাই তিনি ক্ষমতায় গিয়েই বললেন, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ সে তো বাতিল করার প্রশ্নই আসে না। এই তো যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা, যোগ্য উত্তরসূরী! বাপকা বেটি! এই কালো আইনটি শুধু পুরোপুরি বহালই রাখলেন না। এর কার্যকারিতাও প্রয়োগ করতে লাগলেন। কালো আইনের এই প্রয়োগ করতে গিয়ে বিরোধী দলের চার নেতাকে বিনা কারণে, বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখলে, মহামান্য আদালত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে শাস্তি স্বরূপ অর্থদণ্ড দেয়। এরপরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওয়াদার কথা তো মনে হয়ইনি, লজ্জাও হয়নি। হাজার হলেও বাবার তৈরি করা এবং রেখে যাওয়া, তাই কালো আইনটি বহালই রেখেছেন এবং তৃতীয় ওয়াদা বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা বা পৃথক করা। এ নিয়ে তিনি ভুলেও টু শব্দ করছেন না। বেমালুম চেপে যাচ্ছেন।

চাচি-ভাতিজির কান্ড

এক শুক্রবার বিকেলে শেখ মুজিবের একমাত্র আপন ভাই শেখ নাসেরের বিধবা স্ত্রী শেখ হেলালের মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচী প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বললেন, "মা তোমাকে তো পাই-ই না। তুমি এতো ব্যস্ত থাকো। এই জন্য আমি আসিই না। খাটতে খাটতে তুমি একদম

কাহিল হয়ে গেলে। এক কাম করো মা, সপ্তাহে দুইদিন ছুটি দিয়ে দিয়ে দাও। কর্মচারীরাও খুশি হবে নে, আমরাও তোমারে পাবা নে।"

"আপনি ঠিকই তো কইছেন চাচি।" এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পরের দিনই সপ্তাহে দুইদিন ছুটি ঘোষণা করলেন। চারিদিকে এবং পত্র-পত্রিকায় সপ্তাহে দুইদিন ছুটি ঘোষণা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠল। পত্র-পত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনায় সবচাইতে বেশি গুরুত্ব সহকারে বিস্ময়ের সাথে যা বলা হলো, তা হলো সরকারের নীতি-নির্ধারকরা সপ্তাহে দুই দিন ছুটির ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এমন কি মন্ত্রীসভার সদস্যরাও দুই দিন ছুটির ব্যাপারে কিছুই জানেন না এবং সপ্তাহে দুই দিন ছুটির দাবিও কেউ করেনি। তাহলে কার সাথে আলোচনা করে পরামর্শ করে সপ্তাহে দুই দিন ছুটি দেয়া হলো? এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক দিন পর্যন্ত হইচই চলল। প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল। উত্তর মিলল না। কেউ জানতে পারল না। বুঝতে পারল না। আবিষ্কার করতে পারল না এ যে চাচি-ভাতিজির কান্ড!

ইয়েস ম্যাডাম, কারেক্ট ম্যাডাম

ইয়েস ম্যাডাম, কারেক্ট ম্যাডাম। প্রশাসনের কাজ শুধু মন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীদের খুশি করা। বিশেষত প্রধানমন্ত্রীকে বা যদি রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাহী হন তাহলে রাষ্ট্রপতিকে খুশি করা। বাড়ির চাকর বা বাবুর্চিকে যদি মনিব কিছু হুকুম করেন, তাহলে চাকর বা বাবুর্চিও মনিবকে তার হুকুমের ভাল-মন্দ কিছু বলবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ করলে সরকারের কর্মকর্তারা কখনোই নির্দেশের ভালমন্দ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে কিছুই বলবে না।

মনিব যদি বাবুর্চিকে সকাল দশ/এগারোটায় বাইরের কাজের হুকুম করেন, তাহলে বাবুর্চি মনিবকে বলবে, আমি এখন বাইরে গেলে রান্নার ক্ষতি হবে, আপনার খাওয়ার অসুবিধা হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে আদেশ দেন সরকারি কর্মকর্তারা সে আদেশ মতোই কাজ করে যান।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রধানতঃ কাজ হচ্ছে ভোরে ঘুম থেকে উঠে পকেটে কাগজ ও কলম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবনে হাজির হওয়া এবং প্রধানমন্ত্রী ঘুম থেকে উঠে যখন যা বলবেন, তা পকেটের কাগজে লেখা ও সেই মতো কাজ করে যাওয়া। এই কাজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে তারা কখনোই কোনো অভিমত দেন না। শুধু বলেন ইয়েস ম্যাডাম, কারেক্ট ম্যাডাম, রাইট ম্যাডাম। প্রধানমন্ত্রীর আদেশ-নির্দেশের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তারা ভালো ছাড়া কখনোই মন্দ কিছু দেখেন না।

এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের অভিমত হলো, ভালো-মন্দের দায়ভার তো আমাদের না। আমরা সরকারি কর্মচারী। সরকার যা বলবেন বা যে নির্দেশ করবেন, আমরা তাই করব। ভালো-মন্দের দায়-দায়িত্ব সরকারের। মার্শাল 'ল' সরকার আসুক, আর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকারই আসুক, যখন যে সরকার আসবে, আমরা সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সেই সরকারের হুকুম-হাকাম পালন করব। এই–ই আমাদের কাজ। ভালো-মন্দ কাজের হিসাব-নিকাশ করার দায়িত্ব সরকারের এবং যারা সরকার নির্বাচিত করেছে তাদের। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে আমাদের একমাত্র কাজ সরকারকে খুশি করা। সরকারকে মানে প্রধানমন্ত্রীকে যত খুশি করতে পারব আমরাও ততই সফল হতে পারব।

কাকে প্রথম সৎ হতে হবে

কাকে প্রথম সৎ হতে হবে? আমাদের দেশের যে করুণ অবস্থা, এই অবস্থায় কার প্রথম সৎ হওয়া প্রয়োজন? বা কাকে প্রথম সৎ করা দরকার? সারা দেশের সমস্ত প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসৎ ব্যক্তিদের যে অসততা, এই অসততার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে, দেশকে বাঁচাতে হলে, প্রশাসনের কোন ব্যক্তিকে প্রথম সৎ হতে হবে? এই রকম একটা চিন্তা, একটা ভাবনা এবং অনুসন্ধান দীর্ঘদিন ধরে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু এই চিন্তা-ভাবনা এবং অনুসন্ধানের একটা ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। আবার মাথা থেকে এটা ফেলে দেয়াও যাচ্ছিল না। দেশের এই অহিনকূল অবস্থায় প্রশাসনের কাকে প্রথম সৎ হওয়া উচিত, কে প্রথম সৎ হলে প্রশাসনের অসৎ ব্যক্তিরা নিয়ন্ত্রণে আসবে। মাথার এই ভাবনাটা দূর না হতেই, ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ বন বিভাগের কক্সবাজার রেস্ট হাউস–এ বন বিভাগের ডিএফও (ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার)দের এক বৈঠক বসল। প্রায় ২০/২৫ জন ডিএফও বৈঠকে উপস্থিত হলেন। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হলো সরকার কর্তৃক নতুন সিসিএফ (চীফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) বা প্রধান বন সংরক্ষক নিয়োগ দান প্রসঙ্গ। ডিএফও'দের বৈঠকে আলোচনা হলো, নতুন সিসিএফ প্রার্থী পাঁচজন। এই পাঁচজনের মধ্যে বর্তমানে যিনি সিসিএফ আছেন তিনি চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে সিসিএফ পদে আরো থাকতে চান এবং বাকি চারজন সিএফ (কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) সিসিএফ হতে চান। এই পাঁচজন সিসিএফ প্রার্থীই আলাদা আলাদাভাবে ডিএফওদের কাছে ঘুষ বা চাঁদা হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকা চাচ্ছেন। ডিএফও'দের কাছ থেকে এই মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে সিসিএফ প্রার্থীরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বা নিজস্ব চ্যানেলে সিসিএফ হওয়ার জন্য বনমন্ত্রীকে ঘুষ দেবেন। এবং যেহেতু সিসিএফ একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ তাই এই পদে কাউকে নিয়োগ দেয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর একটা সম্মতি

বনমন্ত্রীকে নিতেই হবে। আর তাই সিসিএফ প্রার্থীদের কাছ থেকে নেয়া ঘুষের টাকা থেকে একটা বড় অংশ প্রধানমন্ত্রীকে বনমন্ত্রীর দিতে হবে। নইলে সিসিএফ পদে নিয়োগ দেয়া হবে না। বনমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে ঘুষ দেয়ার এই প্রতিযোগিতায় যে প্রার্থী সর্বোচ্চ টাকা দেবেন তিনিই সিসিএফ হবেন। এই জন্যই সিসিএফ প্রার্থীরা ডিএফও'দের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছে। ডিএফও'দের আলোচ্য বিষয় হলো, আমরা যে সিসিএফ প্রার্থীকে টাকা দেবো তিনি সিসিএফ না হয়ে, যে প্রার্থীকে টাকা দেবো না সেই প্রার্থীই যদি সিসিএফ হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের বদলি করে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে কর্মহীন করে রাখা হবে। ডিএফও হিসেবে ফিল্ডে থেকে দেদারছে যে টাকা তারা কামাচ্ছি তা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সর্বসম্মতিক্রমে ডিএফও'গণ সিদ্ধান্ত নিল যে, সকল সিসিএফ প্রার্থীকে সমান টাকা দেয়া হবে এবং দেয়া হলোও তাই।

যিনি নতুন সিসিএফ হয়েছেন (আব্দুস সাত্তার) তিনি মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর টাকা একত্র করে বনমন্ত্রীর কাছে না দিয়ে আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। নতুন সিসিএফ জনাব আব্দুস সাত্তার প্রধানমন্ত্রীর অংশ বনমন্ত্রীর হাতে না দিয়ে সোজা চলে গেলেন ঢাকার বেইলি রোডের টাঙ্গাইল মিষ্টিঘরের ঠিক সাথে লাগোয়া পিছনে তৃতীয় তলা বিল্ডিং ১২ নম্বর নিউ বেইলি রোডে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্যাশিয়ার কাম ছোট বোন শেখ রেহানার অর্ধ বিকলাঙ্গ স্বামী শফিক সিদ্দিকী ঢাকঢোল পিটিয়ে তদবিরকারক চেম্বার খুলেছেন। সেখানে গিয়ে শফিক সিদ্দিকীকে না পেয়ে সিসিএফ প্রার্থী আব্দুস সাত্তার গেলেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার মালিকানাধীন বিজয় নগরের সুং গার্ডেন চায়নিজ রেস্টুরেন্টে। এই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার ইসলামকে তদ্‌বিরের বিষয় খুলে বলার পর ম্যানেজার ইসলাম সিসিএফ প্রার্থী আব্দুস সাত্তারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন বনানীর আবেদ টাওয়ারের নিচ তলায় অবস্থিত শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাদের মালিকানাধীন অপর রেস্টুরেন্ট 'ফাউন্টেন ফরচুন রেস্টুরেন্ট এন্ড বার'–এ। সিসিএফ প্রার্থী আব্দুস সাত্তার এখানেই শফিক সিদ্দিকীর হাতে প্রধানমন্ত্রীর অংশটা দিলেন এবং তিনি (জনাব আব্দুস সাত্তার) নতুন সিসিএফ নিয়োগ পেলেন।

তাহলে কি দাঁড়াল? এদেশ থেকে দূর্নীতি দূর করতে, ঘুষ দূর করতে কাকে প্রথম সৎ হতে হবে?

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যিনি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তাকেই প্রথম সৎ হতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর সততা আর দক্ষতায় মন্ত্রীরা সৎ হবে। তারপর সচিবরা। এভাবেই আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে গোটা দেশে ন্যায় ও সততার শাসন কায়েম হতে পারে।

এই চিন্তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে ডাঃ নাজনীন বেগম ফ্যান্সী এমবিবিএস, এমওজি, ওপিডি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা। এবং তার স্বামী ডাঃ

রহমাতুল বারী লাবলু, এমবিবিএস, এসইএম ও এনআই, সিডিডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা; বলেছেন সর্বপ্রথম জনগণকে সৎ হতে হবে। জনগণ কোনো অবস্থাতেই যেন অসৎ ব্যক্তিদের নেতা বা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত না করে। নির্বাচিত করার আগে দলের দিকে না তাকিয়ে ব্যক্তির সততার দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রেখে যেন ভোট দেয় এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে।

পেশায় চিকিৎসক এই দম্পত্তি এই প্রসঙ্গে ধানমণ্ডি–মোহাম্মদপুর থেকে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ডঃ কামাল হোসেন এর কথা বললেন। চিকিৎসক দম্পতি অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললেন, তারা ধানমণ্ডি নির্বাচনী এলাকার ভোটার। নির্বাচনের সময় তারা ঢাকার বাইরে ছিলেন। ডঃ কামাল হোসেন–এর মতো একজন সৎ ও শিক্ষিত লোক নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন বলে তারা অত্যন্ত তাড়াহুড়ো ও কষ্ট করে ঢাকায় এসে ডঃ কামাল হোসেনকে ভোট দেন। কিন্তু ভোট গণনায় দেখা গেল ডঃ কামাল হোসেন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। অথচ ধানমণ্ডি–মোহাম্মদপুর এলাকার প্রায় সকল ভোটারই শিক্ষিত। তাই এই ডাক্তার স্বামী-স্ত্রীর অভিমত হলো, সর্বপ্রথম জনগণকে সৎ হতে হবে, ঠিক হতে হবে। সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে। তাহলেই আমাদের দেশে সৎ ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুরে সুরে কথা বলা

রাজনীতিতে সুরে সুরে কথা বলতে হয়। পার্টি বা সংগঠনের মূল নেতা বা নেত্রী যিনি, তার সুরে সুরে কথা বলতে হয়। আপনি যে পর্যায়ের নেতা বা কর্মীই হন না কেন, পার্টি বা সংগঠনের অথবা রাষ্ট্রের মূল নেতা যিনি, যার হাতে মূল ক্ষমতা, তিনি যদি চৈত্রের ভর দুপুরেও বলেন এখন রাত, আপনাকেও তাই বলতে হবে। যদিও তখন ভর দুপুর, তবুও ভুলেও তা বলতে পারবেন না। যদি সুরে সুরে কথা না বলে সত্য কথা বলেন, তাহলেই আপনি নেতার কাছে হবেন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। নেতা বা নেত্রী যা বলবেন তা যতই অসত্য বা ভুল হোক না কেন, তা আপনাকে তালে তালে সুরে সুরে ঠিক সব ঠিক বলে যেতে হবে। যদি তা না পারেন, তাহলে আর যা হোক অন্তত রাজনীতিতে সাইন করতে পারবেন না। যোগ্য হতে পারবেন না। আর রাজনীতিতে যিনি মূল নেতা/নেত্রী বা ক্ষমতার মূল মালিক, অর্থাৎ যিনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, তার কাজ হলো যে তার সাথে তালে তাল মিলিয়ে সুরে সুরে কথা বলবে বা কাজ করবে, তাকেই সবচেয়ে যোগ্য ও আনুগত্যশীল মনে করা। এর বাইরে তিনি আর কিছুই মনে করতে পারেন না। অর্থাৎ ভুল করেই হোক, অথবা ইচ্ছে করেই হোক, তিনি দিনকে রাত বলেছেন, আর অধীনস্ত কোনো নেতা বা কর্মী যদি তা

শুধরে দেয়, তাহলেই তিনি ধরে নেন অধীনস্ত এই লোক তার প্রতি আনুগত্যশীল নয়, যোগ্যও নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে তিনি যা বলবেন বা করবেন তা সঠিক হোক না হোক, অবশ্যই বলতে হবে ঠিক, সবটাই ঠিক। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার রাজনীতিতে প্রথম কথা হচ্ছে, তার (শেখ হাসিনার) কোনো ভুল থাকতে পারে না। কেউ যদি মনে করে তার (শেখ হাসিনার) ভুল হয়েছে, তাহলে তাকে রাজনীতির প্রথম কথা পুনরায় স্মরণ করতে হবে। ঠিক ঠিক, নেত্রী আপনি যা বলেছেন বা যা করেছেন তা সব ঠিক। শেখ হাসিনার রাজনীতিতে যারা এভাবে চলেছে তারাই উপরে উঠেছে এবং সফল হয়েছে।

কোনো শিক্ষা নেয়নি

রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনৈতিক নেতাদের ইতিহাসে সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি, যার মুখের কথায় লক্ষ-কোটি মানুষ উদ্বেলিত হতো, যার অঙ্গুলির ইশারায় সারি সারি মানুষ মৃত্যুর দিকে ছুটে যেত, পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে নিজের জন্য দোয়া করার কথা ভুলে গিয়ে যার জন্য মানুষ দোয়া করত, তিনি শেখ মুজিবর রহমান। কেউ কেউ তাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেন, কেউ কেউ বলেন না। এদেশের বেশির ভাগ মানুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেন না, স্বীকার করেন না এবং মানেন না। কিন্তু তিনি যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি এটা সকলেই স্বীকার করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মসজিদে ফজরের আযান হচ্ছে, আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম, আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম। মুসুল্লিরা শয্যা ছেড়ে নামাজে যাচ্ছে – ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান বাঁচার জন্য, শুধু বাঁচার জন্য, দীর্ঘ তিনঘন্টা সারে তিনঘন্টা কত চেষ্টা-তদ্‌বিরই না করেছেন! তার প্রাণ বাঁচার জন্য সেনাবাহিনীর প্রধানের কাছে ফোন করেছেন। সেনাবাহীনির ঢাকা বিগ্রেড কমান্ডারের কাছে ফোন করেছেন। তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনা ইউনিট প্রধানের কাছে ফোন করেছেন। পুলিশের আইজির কাছে ফোন করেছেন। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করলেন। গণভবনে ফোন করলেন। কিন্তু কোনো জায়গা থেকেই একটু সাড়াশব্দও এলো না। সর্বশক্তিমান পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শেখ মুজিবর রহমান ও তার পরিবার-পরিজনের জীবন রক্ষার জন্য একটি মানুষকেও পাঠালেন না। যে ব্যক্তির এতো লোকজন, এত ঢাল-তলোয়ার, এত অনুসারী, এত ক্ষমতা, তাকে সাহায্য করতে, তার প্রাণ বাঁচাতে কেউ–ই এগিয়ে এলো না।

মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ, দেশপ্রেমিককে বন্দী করে বিচার না করে বন্দীদশায় হাতে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় সামনে থেকে বুকে গুলি করে হত্যা করে পবিত্র পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দম্ভের সাথে 'কোথায় শিরাজ শিকদার!' বলা ও দম্ভ করা, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠকারী এম, এ রশিদ শেখ মুজিবরের ভাগ্নে শেখ শহীদ যখন ছাত্রলীগের সভাপতি তখন এম, এ রশিদ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। শেখ কামালের সাথে দ্বন্দ্বের কারণে এম, এ রশিদ দীর্ঘদিন শেখ মুজিবর রহমানের কাছে যাননি।

এম, এ রশিদ বলেন, বঙ্গবন্ধু যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবেন এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। শেখ মনি ভাইয়ের অনুরোধে ১৯৭৫—এর জুলাই-আগস্টে আমি যখন গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যাই, আমাকে দেখেই বঙ্গবন্ধু বলে উঠলেন, পৃথিবীতে এমন কেউ আছে, যে আমার দরবারে হাজির হবে না? বলে অট্টহাসি দিলেন। সেই বলা আর হাসিতে ছিল ভয়ানক অহংকার প্রচণ্ড গড়িমা। তখনই আমার মন বলে উঠল, বঙ্গবন্ধু আর বেশিদিন পৃথিবীতে নেই।

১৫ই আগস্টের শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহকে ভয় করা। সব সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখা। মানুষের প্রতি অমানুষের আচরণ না করা। মানুষকে সম্মান করা। নিজেকে সর্বেসর্বা মনে না করা। মানুষকে ভালবাসা।

আত্ম অহমিকা ও গড়িমা বর্জন করা। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা এবং তাদের পরিবার-পরিজন আত্মীয়রা ১৫ই আগস্ট থেকে বিন্দুমাত্র শিক্ষাও নেয়নি। বরং ১৫ই আগস্টের ঘটনা থেকে তারা আরো কুশিক্ষা অর্জন করল। তারা মানুষকে চুল পরিমাণও ভালোবাসে না। মানুষকে অপমান-অপদস্ত করে প্রচণ্ড আনন্দবোধ করে।

কার কত টাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানার এখন একই এ্যাকাউন্ট। একই হিসেব। দুই বোনের মধ্যে অনেক ঝগড়াঝাটির পর দুজনে মিলে একটি এ্যাকাউন্ট হওয়ার বিনিময়ে আপোষ হয়েছে। এই দুই বোনের বর্তমানে আমেরিকায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) তিনটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হয়েছে। এর একটি চালায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে পুতুল ও তার স্বামী। অপরটি চালায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে জয়। এবং তৃতীয়টি চালায় প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানার ছেলে ববি। এছাড়া এই দুই বোনের বিভিন্ন দেশে প্রায় তিন থেকে চার হাজার কোটি টাকা নগদ আছে। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হেলাল—এমপি প্রায় হাজার কোটি টাকার উপরে মালিক। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো বোন লুনা এবং মিনা শত শত কোটি টাকার মালিক। প্রধানমন্ত্রীর অপর চাচাতো ভাই রুবেল ও তার অন্যান্য

ভাইয়েরা শত কোটি টাকার মালিক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো চাচা শেখ হাফিজুর রহমান টোকন প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকার মালিক। প্রধানমন্ত্রীর বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে প্রধানমন্ত্রীর এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম এবং তার চাচাতো ভাই প্রধানমন্ত্রীর চীফ্ সিকিউরিটি নজিব আহাম্মেদ নজিব ও তার ভাইয়েরা মিলে বর্তমানে কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের এমন কেউ নেই, যিনি বর্তমানে শত কোটি টাকার মালিক হননি।

স্বাধীনতা ঘোষণা, দিবস, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত বিতর্ক

একটা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করলাম। নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র হলো, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিলো। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বা মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ল। ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে এক হয়ে যুদ্ধ করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠাল। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের পক্ষে মার্কিন সপ্তম নৌবহর—এর মোকাবেলা করার জন্য সাবমেরিন পাঠাল। বিশ্বের অন্যান্য দেশও পরোক্ষভাবে পক্ষে-বিপক্ষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। সারা দুনিয়া তোলপাড় করে প্রায় এক লক্ষ পাকিস্তানি হানাদার সৈনিককে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ আমরা বিজয়ী হলাম, স্বাধীন হলাম। কিন্তু এরপরও আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে, স্বাধীনতা দিবস নিয়ে, জাতীয় পতাকা নিয়ে, জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক রয়েই গেল। অনেকেই ভাবতে পারেন — এসব ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করে কোনো লাভ নেই। আবার অনেকেই ভাবতে পারেন, না এসব আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিষয়। এর মীমাংসা বা সমাধান হওয়া দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আওয়ামী বুদ্ধিজীবি ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে শেখ হাসিনা সরকারের কাছে দাবি করেছেন, ২৬শে মার্চের পরিবর্তে ৭ই মার্চকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করতে হবে। ডঃ নীলিমা ইব্রাহীমের এই দাবি করার যুক্তি হচ্ছে, তার (ডঃ নীলিমা) ভাষায়, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চের সোহ্‌রাওয়ার্দী (রেসকোর্স ময়দান) উদ্যানের ভাষণে বলেছেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। অতএব ৭ই মার্চই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস।

এক মুক্তিযোদ্ধা দাবি করেছেন বর্তমানে আমরা জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে রবীন্দ্র সঙ্গীতটি (আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি) গাই, এটি আমাদের

প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীত নয়। দেশ স্বাধীনের পরে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মহল বিশেষের চাপিয়ে দেয়া এটি একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত মাত্র। যা এদেশের কোনো কবি সাহিত্যিক দ্বারা রচিত হয়নি এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এ গান গাওয়া হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে গানটি গেয়েছিল, যে গান গেয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খোলা হতো এবং বন্ধ হতো, আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং–এর সময় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে গান গেয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতাম, সেই "জয় বাংলা বাংলার জয়" গানটিই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। অতএব এই গানকেই পুনরায় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। অপর এক মুক্তিযোদ্ধা পত্রিকায় দাবি করা হয়েছে, বর্তমানে যে পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে উত্তোলন করা হয়, এ পতাকা প্রকৃত জাতীয় পতাকা নয়। বর্তমান পতাকা হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় পতাকার পরিবর্তিত রূপ, যা স্বাধীনতার পরে চাপিয়ে দেয়া হয়। গোটা বাঙালি জাতি স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যেক ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা হিসেবে যে পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা দাবি করেছে, এবং পতাকার তলে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছে, এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যে পতাকার তলে দাঁড়িয়ে জীবন দিয়ে পতাকার মর্যাদা রক্ষার শপথ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে, সেই সবুজ পতাকার লালবৃত্তে হলুদ রঙয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র খঁচিত পতাকাই আমাদের প্রকৃত জাতীয় পতাকা। আমরা সেই পতাকাকেই জাতীয় পতাকা হিসেবে দেখতে চাই। বর্তমানে যে পতাকা রয়েছে এ হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় পতাকার বিকৃত রূপ, যা স্বাধীনতার পরে জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

এছাড়া স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক তো শুরু থেকে এখন পর্যন্ত চলছেই। অর্থাৎ কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, তা নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম থেকে অদ্যাবধি অবিরাম বিতর্ক চলছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি কে স্বাধীনতার ঘোষক। এই বিতর্কের অবসান বা সর্বজন সমাধান কখনোই হয়নি। কেউ বলছেন শেখ মুজিবর রহমানই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কেউ বলছেন জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। যখন যিনি ক্ষমতায় যাচ্ছেন বা এই দুইজনের মধ্যে যখন যার সমর্থকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাচ্ছেন রেডিও-টেলিভিশনে তাকেই স্বাধীনতার ঘোষক বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আসলে কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন? গভীরভাবে একাগ্রচিত্তে এর অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং বিচার করা একান্ত জরুরী দরকার। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম, আর আমাদের স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষক খুঁজে বের করতে পারব না। এটা হতে পারে না। আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক খুঁজে না পাই, তাহলে তো আগামী প্রজন্ম একদিন আমরা যে দেশ স্বাধীন করেছি সেটাও খুঁজে পাবে না। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক

আমাদের খুঁজে পেতে হবে। গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক কাঠামোতে যে নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনে গোটা (সারে সাত কোটি) বাঙালি জাতি শেখ মুজিবর রহমানকে একক ও অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। দুই শত বছর পরাধীন থাকা বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য মুক্তি পাগল হয়ে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ভোট নিয়ে শেখ মুজিবর রহমানকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। বাঙালি জাতি তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার সকল দায়-দায়িত্ব শেখ মুজিবর রহমানের উপরে এককভাবে ন্যাস্ত করে। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র স্বাধীনতা পাগল কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার মুখে একটাই শ্লোগান, একটাই দাবি, "পাকিস্তানের মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।" মুক্তিপাগল বাঙালি বাঁশের লাঠি নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হলো।

২রা মার্চ মাঠেঘাটে, বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, বাড়িঘরে, রাস্তাঘাটে দেশের সর্বত্র বাঙালি জাতি তার প্রিয় পতাকা স্বাধীন বাংলার পতাকা টাঙিয়ে দিলো। সবুজ পতাকার লাল বৃত্তে হলুদ রঙয়ের বাংলাদেশের মানচিত্র খঁচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা সারা বাংলার আকাশে পতপত করে উড়তে লাগল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অনেক জায়গায় কাঠের রাইফেল দিয়ে অস্ত্র চালনার (প্রশিক্ষণের) মহড়া চলতে লাগল।

এমনি পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভা ডাকলেন। ৭ই মার্চের রেসকোর্সের এই জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোক বাঁশের লাঠি নিয়ে সমবেত হলো। এই জনসভায় ভাষণ দেয়ার জন্য শেখ মুজিবর রহমান তাজুদ্দিন আহাম্মেদ এবং ডঃ কামাল হোসেনকে একটি বক্তৃতা লিখে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দিলেন। তিনি (শেখ মুজিবর রহমান) তাজুদ্দিন আহাম্মেদ (বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) এবং ডঃ কামাল হোসেনকে বললেন, তোমরা আমার ৭ই মার্চের বক্তৃতার পয়েন্ট তৈরি করে দেবে এবং আমি ঐ পয়েন্ট–এর উপরে নিজের ভাষায় বক্তৃতা করব। তিনি আরো বললেন, তোমরা বক্তৃতার পয়েন্টগুলো এমনভাবে করবে যাতে আমি ঐ পয়েন্টগুলো বক্তৃতায় বললে পাকিস্তান কাঠামোয় কোনো ক্ষতি না হয় এবং পাকিস্তান আইনে তা যেন বেঈমানি না হয়।

তাজুদ্দিন আহাম্মেদ ও ডঃ কামাল হোসেন দুজনে মিলে শেখ মুজিবর রহমান–এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পয়েন্ট তৈরি করে দেন। এবং ৭ই মার্চে শেখ

মুজিবর রহমান যখন বক্তৃতা দিতে থাকেন, তাজুদ্দিন আহাম্মেদ তখন বক্তৃতার ডায়াসের নিচে বসে বক্তৃতার পয়েন্টগুলো মিলিয়ে দেখতে থাকেন। শেখ মুজিবর রহমান তাজুদ্দিন আহাম্মেদ, ডঃ কামাল হোসেন এবং অন্যান্য নেতাদের বলেন, এবার আমাকে পাকিস্তানের ক্ষমতা দিতে হবে। যদি আমাকে ক্ষমতা না দেয়, তাহলে তোমাদের যা করার তোমরা তা করবে।

এই কথাগুলো ৩১শে অক্টোবর, শনিবার, ১৯৯৮ সন্ধ্যা সাতটায় ১২২/১২৪ মতিঝিল মেট্রোপলিটন চেম্বার বিল্ডিং–এর তৃতীয় তলায় তাঁর নিজের চেম্বারে বসে ডঃ কামাল হোসেন নিজের মুখে বলেছেন। ডঃ কামাল হোসেন আরো বলেছেন এবং দৃঢ়তার সাথে বলেছেন তিনি এবং ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলামই শেষ দুই ব্যক্তি যারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে (রাত দশটা–এগারটায়) ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলে বেরিয়ে এসে সোজা তাজুদ্দিন আহাম্মেদের বাসায় যান। কিন্তু তখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়ে কিছুই বলেননি।

ডঃ কামাল হোসেন তাজুদ্দিন আহাম্মেদের বাসায় থাকতেই রাত সাড়ে বারোটা–একটায় কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত এমএনএ (মেম্বার অফ ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি) মুজাফ্‌ফর সাহেব এসে খবর দেন যে, পাকিস্তান আর্মি পিলখানা (বর্তমান বিডিআর হেড কোয়ার্টার), রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করেছে। এই সংবাদ শোনার পর তাজুদ্দিন আহাম্মেদসহ সকলেই যার যার নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যান।

২৫শে মার্চে বা তার পরে, কবে কোথায় কার কাছে এবং কীভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন জিজ্ঞেস করা হলে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, এটা আমার জানা নেই। শুনেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে ডঃ কামাল বলেন, না আমি শুনিনি। আমাকে কেউ বলেনি।

কবে কোন সময়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়? জানতে চাইলে ডঃ কামাল বলেন এ বিষয়ে সবচাইতে ভালো বলতে পারবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কেননা তিনি তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে ঐ বাড়িতেই ছিলেন। একমাত্র বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য ছাড়া এসবের সঠিক উত্তর অন্য কেউ দিতে পারবে না। ডঃ কামাল হোসেনকে এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ গ্রেফতার করা হয়। ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১ ডঃ কামাল গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমান তাজুদ্দীন আহাম্মেদসহ কারো সাথেই কোনো প্রকার যোগাযোগ তাঁর হয়নি। ৪ঠা এপ্রিল গ্রেফতার করে ডঃ কামাল হোসেনকে প্রথমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ৫ই এপ্রিল, ১৯৭১ পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডির হরিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাকিস্তানের হরিপুর জেলে ৫ই এপ্রিল থেকে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডঃ কামাল হোসেনকে রাখা হয়। এই জেলে ডঃ কামালকে মানসিক নির্যাতন করা হয়। মোটা মোটা লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা ছোট একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠের বাইরে কখনোই ডঃ কামাল হোসেনকে বের হতে দেয়া হয়নি। ডঃ কামালকে কখনোই কোনো প্রকার সংবাদপত্র বা রেডিও দেয়া হতো না। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের পর হঠাৎ করে পাকিস্তান জেল কর্তৃপক্ষ ডঃ কামাল হোসেনের সাথে সম্মানজনক আচরণ করতে শুরু করলে তিনি একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে মনে ধারণা করেন। ২৮শে ডিসেম্বর পাকিস্তানের হাযারা জেলার কাশিম শিয়ালা গেস্ট হাউজে ডঃ কামাল হোসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এক সঙ্গে মিলিত হন।

কেউ কেউ বলেছেন এবং দাবি করেছেন যে, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের দিবাগত রাত ১২:০০ টার পর অর্থাৎ ঘড়ির সময় ২৬শে মার্চ রাতে শেখ মুজিবর রহমান টেলিগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। যদিও শেখ মুজিবর রহমান নিজে কখনোই বলেননি যে, ২৬শে মার্চ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তারপরও গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এই দাবি মেনে নিলে কি দেখা যাবে? টেলিগ্রাম হচ্ছে এমন একটি বিদ্যা যে এর একজন প্রেরক এবং একজন প্রাপক থাকতে হবে। শেখ মুজিবর রহমান যদি প্রেরক হিসেবে টেলিগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই একজন প্রাপক হিসেবে টেলিগ্রামটি পেয়েছেন। সেই প্রাপকটি কে? শেখ মুজিবর রহমান টেলিগ্রামটি কার কাছে পাঠিয়েছিলেন? অর্থাৎ টেলিগ্রামের প্রাপক কে ছিলেন? আজ পর্যন্ত সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটির দেখা মিলল না, পরিচয় মিলল না, বলা হবে টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘোষণা পাঠানো হয়েছে। অথচ যার কাছে পাঠানো হয়েছে অনুসন্ধান করেও তার হদিস মিলবে না, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেও প্রাপকের সন্ধান মিলবে না, এটা সঠিক নয়। টেলিগ্রামের প্রেরক থাকলে অতি অবশ্যই প্রাপক থাকতে হবে। প্রাপক ছাড়া টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যায় না এবং প্রাপক ছাড়া প্রেরকও থাকে না। যেহেতু প্রাপক নেই, সেহেতু প্রেরকও ছিল না বলে টেলিগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টির সমাপ্তি টানা যেতে পারে। অর্থাৎ ২৬শে মার্চ রাতে টেলিগ্রামের মাধ্যমে শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই এবং অনুসন্ধান, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে এর পক্ষে কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দানকারী এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহাম্মেদ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুনসুর আলী, ডঃ কামাল হোসেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ থাকতে তাঁদের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘোষণার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

ডঃ নীলিমা ইব্রাহীমের দাবি অনুযায়ী ৭ই মার্চের ভাষণেই (নীলিমাদির ভাষায়) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ৭ই মার্চ–ই আমাদের স্বাধীনতা দিবস। যদি তাই হবে, তবে শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে তো বললেন না যে, আমি ৭ই মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি এবং ৭ই মার্চই আমাদের স্বাধীনতা দিবস। উপরন্তু তিনিই (শেখ মুজিবর রহমানই) স্বাধীন দেশের সরকার প্রধান হিসেবে ২৬শে মার্চকেই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে প্রথম পছন্দ করেছেন।

শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যবর্তী পর্যায়ের এক জায়গায় ঠিকই বলেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" – এ কথা বলেই তিনি পাকিস্তানি শাসকদের কাছে চারটি শর্ত দিয়ে তার বক্তৃতা শেষ করেন। শেখ মুজিজর রহমান ভাষণের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম (১) সামরিক আইন মার্শাল 'ল' উইথড্র করতে হবে। (২) সমস্ত সেনাবাহিনীর লোককে ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। (৩) যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। (৪) জন প্রতিনিধিদের কাছে (অর্থাৎ তার নিজের কাছে) ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই চারটি দাবির মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান–এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা, অর্থাৎ শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করাই মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দাবি। এখানে বিচার-বিশ্লেষণ ও বিবেচনার বিষয় হলো যদি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের দাবি মেনে নিত, তাহলে কি হতো? বাংলাদেশ কি স্বাধীন হতো? কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায়, তাহলে আর যাই হোক, এই যাত্রায় বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণের দাবি অনুযায়ী শেখ মুজিবকে যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হতো, তাহলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশে স্বাধীন হতো না। পাকিস্তানই থেকে যেতো। ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, "আমরা তোমাদের ভাতে মারব। পানিতে মারব। তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত ব্যারাকে রইল। কেউ বের হলো না। এদিকে পাকিস্তানিরা ৭ই মার্চের পরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে ঢাকা–তেজগাঁ এয়ারপোর্ট (বিমানবন্দর) দিয়ে বিমানে করে দিবারাত্রি ২৪ ঘন্টা সৈন্য আনতে লাগল। ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান বললেন, "যে পর্যন্ত আমার দাবি আদায় না হবে, খাজনা-ট্যাক্স সব বন্ধ করে দেয়া হলো, দেউ দিবে না।"

জনগণ পাকিস্তান সরকারকে খাজনা-ট্যাক্স দেয়া বন্ধ করে দিলো। শেখ মুজিবর রহমান আরো বললেন, "এই পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও পাচার হতে পারবে না। তিন ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে শুধু কর্মচারীদের মায়নাপত্র নেয়ার জন্য। ঠিকই ব্যাংকগুলো থেকে পাকিস্তানে এক পয়সাও পাচার হলো না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শেখ মুজিবের নির্দেশেই চলতে লাগল। সরকারি-বেসরকারি প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে শেখ মুজিবর রহমানের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। এগার শত মাইল দূরে মাঝখানে ভারতের মতো বিশাল রাষ্ট্রের ওপার থেকে পাকিস্তানের আর কিছুই করার থাকল না। বাংলাদেশ কার্যত পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা দেশে পরিণত হলো।

৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান থেকে আর একটি সৈন্যও পূর্ব বাংলায় আসতে পারবে না, এই কথাটি বলায় বিমানে করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য আসতেই লাগল।

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস। এই পাকিস্তান দিবসে একমাত্র শেখ মুজিবর রহমানের ধানমণ্ডি বাড়ি ছাড়া এই বাংলার সরকারি-বেসরকারি কোনো অফিস আদালতে এবং কোথাও পাকিস্তানি পতাকার চিহ্নমাত্র দেখা যায়নি।

দেশের সর্বত্র উড়ছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। কেবলমাত্র শেখ মুজিবর রহমানের বাড়িতে একমাত্র পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বরে শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়ে জোরপূর্বক পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঐ সময় শেখ মুজিবর রহমান তার বাড়িতে থাকলেও ঘরের বাইরে আসেননি।

এক সামরিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশে) যত পাকিস্তানি সৈন্য ছিল, তার শতকরা ৬৫ শতাংশ ছিল বাঙালি, যারা ২৫শে মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং ৩৫ শতাংশ ছিল মূল পাকিস্তানি (পাঞ্জাবি, বেলুচ, পাঠান)। এই ৩৫ শতাংশ পাকিস্তানি সৈন্যদের অধিকাংশ ছিল অফিসার যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ করে না।

আর ৬৫ শতাংশ বাঙালি পাকিস্তানি সৈনিকদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল নন কমিশন আর সিপাহী, যারা সরাসরি যুদ্ধ করে। ১৯৭১–এর ৭ই মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবাঙালি ৩৫ শতাংশ সৈন্য, পাকিস্তানি বাঙালি ৬৫ শতাংশ সৈন্যর কাছে এক ধরনের জিম্মি দশায়ই ছিল।

৭ই মার্চের পর থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা, বাঙালি সৈন্যদের চাইতে ২০/৩০ গুণ বেশি অবাঙালি (পাঞ্জাবি, বেলুচ ইত্যাদি) সৈন্য ঢাকা আনে। এবং তারপরই ২৫শে মার্চ রাত ১২:০০ টার পর বাঙালিদের উপর আক্রমণ শুরু করে।

শেখ মুজিবর রহমান যদি সত্যিকার অর্থেই কায়মনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইতেন তাহলে ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের ক্ষমতায় যাওয়ার দাবির আড়ালে স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি চাপা না দিয়ে, পরিষ্কার করে বাংলাদেশের স্বাধীনাতা ঘোষণা করতেন। গোটা বাঙালি জাতির দেয়া স্বাধীনতা ঘোষণার দায়িত্বটি শেখ মুজিবর রহমান যদি পালন করে বলতেন, আমি আজ থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলাম, এখন থেকে পাকিস্তানের সাথে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। পাস্তিান থেকে একটি সৈন্যও আর আসতে পারবে না। বিমানবন্দর বন্ধ করে দেয়া হলো এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যদের বন্দী করা হলো। তাহলে বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র এবং জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেতাম।

মাঝখানে ভারতের মতো বিশাল শত্রু রাজ্য পাড়ি দিয়ে, এগার শত মাইল দূর থেকে পাকিস্তানদের আর কিছুই করার থাকত না। যেমন ১৯৭১–এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের বন্দী করার পর পাকিস্তানিদের কিছুই করার ছিল না। খুব বড়জোর হলে পাকিস্তানি ৩৫ শতাংশ অবাঙালি সৈন্যের সাথে ৬৫ শতাংশ বাঙালি সৈন্যদের একটি খুবই ছোটখাট এবং সীমিত যুদ্ধ বা লড়াই হতো, যা কেবলমাত্র ক্যান্টনমেন্টেই সীমাবদ্ধ থাকত। পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন না করায় আমাদের স্বাধীনতা পেতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত নিতে হয়েছে।

৭ই মার্চের ভাষণ ঃ ট্রিমেনডাস কন্ডিশনাল স্পিচ

আসলে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পাকিস্তানের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এটি একটি চমকপ্রদ অসাধারণ শর্তযুক্ত ভাষণ। ইংরেজিতে যাকে বলা হবে ট্রিমেনডাস কন্ডিশনাল স্পিচ। এই ভাষণকে কোনো বিচার-বিশ্লেষণেই স্বাধীনতার ঘোষণা বলা যাবে না। ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণে শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণকে বলা যায় ট্রিমেনডাস কন্ডিশনাল স্পিচ বা চমকপ্রদ অসাধারণ শর্তযুক্ত ভাষণ। শেখ মুজিবর রহমান যদি ৭ই মার্চের ভাষণে প্রকৃত অর্থেই চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেই থাকবেন, তাহলে ঃ–

(১) ঐ ভাষণেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবি করেছিলেন কেন? ঐ ভাষণের মুখ্য

ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই ছিল শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা।

(২) ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে শেখ মুজিব তার ধানমণ্ডির বাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকার পরিবর্তে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন কেন?
শেখ হাসিনার ঐক্যমত্যের সরকারের মন্ত্রী আ, স, ম রব দাবি করেছেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে ২রা মার্চকে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন দিবস পালন করতে হবে। ২রা মার্চকে যদি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন দিবস হিসেবে পালন করা হয়, তাহলে শেখ মুজিবর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব কতটুকু থাকে?

(৩) যেখানে ৭ই মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবাঙালি (পাঞ্জাবি, বেলুচ, সিন্দি) দুর্বল হাজার পাঁচেক সৈন্যকে বন্দী করে প্রায় বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব ছিল, তা না করে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশে) অধিক পাকিস্তানি (পাঞ্জবি, বেলুচ, সিন্দি) সৈন্য সমাবেশ করার পূর্ণ সুযোগ দিয়ে ২৫শে বা ২৬শে মার্চ আমাদের উপর আক্রমণ করা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় দেয়া হয়েছিল কেন?

(৪) ২৫শে মার্চ রাতে ঘরে ডঃ কামাল হোসেন থাকতে এবং হাতের কাছে তাজুদ্দিন আহাম্মেদ (মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্বদানকারী অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) সহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকতেও শেখ মুজিবর রহমান কেন তাদের কাছে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না?

(৫) ২৫শে মার্চের কালো রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী যখন পৈচাশিক আক্রমণ করল এবং নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করতে লাগল; এবং বাঙালি সৈনিক, ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বর্তমানে বিডিআর), পুলিশ, আনসার পাকিস্তানি হানাদারদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে লাগল, তখন শেখ মুজিবর রহমান দিশেহারা বাঙালির নেতৃত্ব না দিয়ে কেন পাকিস্তানিদের কাছে ধরা দিলেন?

(৬) তাহলে কি শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা যে বলেন, ২৬শে মার্চ দুপুর আড়াইটা-তিনটায় পাকিস্তানের জেনারেল টিক্কা খান আমাদের বাসায় এসে আব্বাকে (শেখ মুজিবকে সেলুট দিলো, মাকে (বেগম মুজিব) সেলুট দিলো, দিয়ে আব্বাকে বলল, স্যার, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমাকে একটি স্পেশাল

বিমানসহ পাঠিয়েছে আপনাকে রাওয়ালপিণ্ডি (পাকিস্তনের তখনকার রাজধানী) নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনি ম্যাডামকে (বেগম মুজিব) সাথে নিতে পারেন। চাইলে অন্য কাউকেও নিতে পারেন।

আব্বাকে সসম্মানে জেনারেল টিক্কা খান নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় মাকে জেনারেল টিক্কা খান সেলুট দিয়ে গেল। তাহলে কি এটাই সত্যি?

(৭) শেখ মুজিবর রহমান কি মনে করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে যাচ্ছেন? আর তাই কি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে গোটা বাঙালি জাতিকে অসহায় অরক্ষিত রেখে তিনি (শেখ মুজিবর রহমান) জেনারেল টিক্কা খানের সাথে পাকিস্তান চলে গেলেন?

(৮) পাকিস্তানি নরপিচাশ হায়নাদের আক্রমণের মুখে, আপোষকামী নেতার আপোষের ফলে, দিশেহারা নাবিকের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাঙালি জাতি। ঠিক সেই সময়, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা বাঙালি সৈনিক পাকিস্তানি সেনা আইনে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে এলেন এক তরুণ বাঙালি সৈনিক।

মুক্তি পাগল স্বাধীনতাকামী মানুষকে তিনি শোনালেন স্বাধীনতার অমরবাণী চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি মেজর জিয়া বলছি, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম।"

২৭শে মার্চ প্রত্যুষে ইথারে ভেসে এলো এই অমর স্বাধীনতার বাণী। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মুক্তি পাগল দামাল ছেলেরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে ঘোষণা করলেন, "আই এ্যাম মেজর দিয়া, প্রেসিডেন্ট অফ পিপুলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, আই ডিকলিয়ার্ড ইনডিপেন্ডেন্ট অফ বাংলাদেশ।" পরে কৌশলগত কারণে তিনি বললেন, "আই এ্যাম মেজর জিয়া, আই ডিকলিয়ার্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ বাংলাদেশে অন বিহাফ অফ আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবর রহমান।"

মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাই কি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আপোষের ভিত্তিতে শেখ মুজিবর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের পথে অন্তরায় হলো?

(৯) এর পরপরই ১৭ই এপ্রিল তাজুদ্দিন আহাম্মেদের নেতৃত্বে ঘটে গেল আর এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক বিশ্বের বহু দেশের সাংবাদিকদের সামনে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে ১৭ই এপ্রিল তাজুদ্দিন আহাম্মেদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করল। তাজুদ্দিন আহাম্মেদ হলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজুদ্দিন আহাম্মেদ তাঁর মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। শেখ মুজিবর রহমানের অনুপস্থিতিতেই শেখ মুজিবর রহমানকে করা হলো রাষ্ট্রপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। যদি শেখ মুজিবর রহমান আপোষের ভিত্তিতে পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যদি গিয়েও থাকেন, তাহলে তাজুদ্দিন আহাম্মেদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ, শেখ মুজিব–ইয়াহিয়া আপোষ ফর্মুলা কি ভণ্ডুল করে দেয়নি?

(১০) আর এই জন্যই কি সফল নেতৃত্ব দিয়ে, সরকার পরিচালনা করে, দেশ স্বাধীন করে, স্বাধীন দেশে শেখ মুজিবর রহমানকে ফিরিয়ে আনার পর, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহাম্মেদকেই শেখ মুজিবর রহমান তার মন্ত্রীসভা থেকে নিগৃহীত করে বের করে দিয়েছিলেন?

(১১) হয়ত এর জন্যই স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর সর্বজ্যেষ্ঠ (সিনিয়র) হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবর রহমান জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধান না করে চাকরিতে জুনিয়র সফিউল্লাহকে সেনাবাহিনী প্রধান করেছিলেন?

(১২) শুধু তাই নয়, যে মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করল, যুদ্ধে বিজয়ী হলো, দেশে ফিরে এসে কোন আক্রোশের কারণে শেখ মুজিবর রহমান বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের ছুড়ে ফেলে দিলেন? এবং যে প্রশাসন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের তাবেদারি করেছে, বাঙালিদের হত্যা করেছে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, সেই পরাজিত প্রশাসনকে কি কারণে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করলেন?

মুক্তিযোদ্ধাদের অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে, অত্যাচার করে, শুধুমাত্র সদিচ্ছার অভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিকা না করে অমুক্তিযোদ্ধাদের এমনকি রাজাকারদেরও মুক্তিযোদ্ধা সনদ বিতরণ করে শেখ মুজিবর রহমান এক কলঙ্কের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু কেন?

ধিক্ শেখ মুজিব ধিক্!

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা জ্বালিয়ে দিলে তড়িৎগতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ইত্তেফাকের মালিক ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেনদের ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ দশ লক্ষ টাকা দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় মঈনুল হোসেনরা লন্ডন-জার্মানি ঘুরে অত্যাধুনিক অফসেট মেশিন কিনে আনলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন না। পাকিস্তান হানাদার কবলিত গোটা সময়, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের গোটা নয় মাস মঈনুল হোসেনরা পাকিস্তান প্রেস থেকে বিনা পয়সায় (পাকিস্তান সরকারের খরচে) ইত্তেফাক পত্রিকা বের করলেন। বলা বাহুল্য ঐ সময় ইত্তেফাকে পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, ফরমান আলী, নিয়াজি ও পাকিস্তানি অন্যান্য জেনারেল ও সৈন্যদের এবং ঘাতক গোলাম আযমসহ অন্যান্য আলবদর রাজাকারদের প্রশংসা করে খবর ছাপা হতো। আর মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হতো দেশদ্রোহী ভারতীয় চর। অর্থাৎ ইত্তেফাক তখন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানের তাবেদারি ও দালালীতে লিপ্ত ছিল এবং দালালী ও তাবেদারির পুরুস্কার হিসেবে পাকিস্তান সরকারের সমস্ত বিজ্ঞাপন ইত্তেফাক পেত। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় ইত্তেফাকের মালিক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুরা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে দালালী ও তাবেদারির পুরুস্কারস্বরূপ পাওয়া বিজ্ঞাপনের বিলের টাকা নিতে পারেনি। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনের পরে পূর্বের পরিচয়ের সূত্র ধরে স্বাধীন দেশের কর্ণধার শেখ মুজিবর রহমানের কাছ থেকে পাকিস্তানি দালালীর ও তাবেদারির সেই বিলের টাকা নেয়। কোনো বিবেকবান মানুষ কি এই বিলের টাকা দিতে পারে?

এই জন্যই কি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন আর মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করা হয়েছে? ধিক্ শেখ মুজিব, ধিক!

এদেশের মুক্তি পাগল দামাল ছেলেরা প্রাণের মায়া ছিন্ন করে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রাণপণ লড়াই করছে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করছে। ঠিক তখন পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধ নস্যাৎ করার জন্য কুমতলবে ইপিসিএস (ইষ্ট পাকিস্তান ক্যাডার সার্ভিস) এর পরীক্ষা নিল। নিজের প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানি হানাদারকে কবল থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচানোর সেই অগ্নিপরীক্ষার দিনে, বাংলার দামাল ছেলেরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। আর স্বার্থান্বেষী চরম সুবিধাবাদী কতিপয় ব্যক্তি পাকিস্তান সরকারের দেয়া সেই ইপিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিল এবং দেশপ্রেম বিবর্জিত ঐ ব্যক্তিরা ইপিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইষ্ট পাকিস্তান ক্যাডার সার্ভিসের চাকরিতে যোগ দিলো। লক্ষ

প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনের পরে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন শেখ মুজিবর রহমান ঐ বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের স্বাধীন বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসের চাকরিতে পূর্ণ বহাল করলেন। কিন্তু কেন? নূন্যতম বিবেক থাকলেও কি এটা সম্ভব? ধিক্ শেখ মুজিব, ধিক্!

মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ দেশপ্রেমিক সর্বহারা দলের নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারকে বিনা বিচারে বন্দীদশায় হাতে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় সম্মুখ থেকে গুলি করে হত্যা করে, মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে "আজ কোথায় সিরাজ সিকদার!" বলে অস্ফালন করে শেখ মুজিব হয়েছে বিবেকহীন এক কাপুরুষ।

ডায়েরির পাতা

তুমি যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে। তুমি চেয়েছিলে যেনতেন প্রকারে একবার শুধু ক্ষমতায় যাওয়া। তাই হয়েছে। দেশের জন্য, জাতীর জন্য কিছু করতে হলে যে ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন তা তুমি করতে কখনোই প্রস্তুত ছিলে না। প্রথম থেকেই শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তুমি সর্বদা ব্যস্ত ছিলে এবং তাই হয়েছে।

১৫/০৬/১৯৯৬

না তুমি দেশের জন্য কিছুই করতে পারবে না। কেননা দেশের জন্য কিছু করার মন তোমার নেই। মানুষের জন্য কিছু করার মন নেই বলেই তোমার ইচ্ছেও নেই। আর ইচ্ছে নেই বলেই তোমার উপায়ও নেই। যদি তোমার ইচ্ছে থাকত তাহলে কিছু একটা উপায় হতো। কিন্তু জাতির জন্য কিছু করার ইচ্ছে তোমার নেই। কাজেই উপায়ও নেই।

১৫/১২/১৯৯৬

আমরা তোমাকে ক্ষমা করতে চাই। কিন্তু কোনো বিচারেই ক্ষমা করতে পারি না। তুমি ক্ষমার অযোগ্য। তুমি প্রার্থনা করো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেন তোমাকে ক্ষমা করার সামর্থ্য আমাদের দেন।

২৭/০২/১৯৯৭

১৯৮১ সালের ১২ই জুন যখন তুমি তোমার পিতার ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটি এবং অলঙ্কারসহ যাবতীয় জিনিস, ৭২ পৃষ্ঠার ইন্ডেন্ট্রিতে সই করে বুঝে নিচ্ছিলে, তখনই মনে হচ্ছিল তুমি মানুষ নও, অন্য কিছু। তুমি যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বুঝে নিচ্ছিলে, সবাই হতবাক হয়ে তোমার দিকে তাকিয়েছিল। কি রকম ধীর-স্থির এবং অবলীলাক্রমে তুমি বলেছিলে, আমার কানের দুল তিনটা কই? আমার নাকের ফুল দুইটা কই? আমার হাতের চল্লিশটা চুরি কই? ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি বলছিলে আর

সরকারি কর্তৃপক্ষ একটা একটা করে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সেই দিনটার কথা আমার আজো মনে আছে। সেদিন তোমাকে দেখে মনেই হয়নি যে, এই বাড়িতেই তোমার পিতৃকুলের সব শেষ হয়ে গেছে। তুমি এমনভাবে গুনে গুনে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকার গয়নাসহ অন্যান্য মালামাল বুঝে নিলে যে, তাতে মনে হলো, তুমি মানুষ নও, অন্য কোনো কিছু।

কারো লেখা পড়ো না; কোনো বই পড়ো না। ভালো কথা শোনো না। তোমার নাম শেখ হাসিনা। তুমি পিতৃমাতৃহীন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত এক রমণী। তোমার মেয়ের ভাষায় তুমি বহুরূপী। তোমার প্রিয় গৃহভৃত্য রমাকান্ত, যাকে তুমি ভালোবাসতে, সেও তোমাকে ভালোবাসতো। কিন্তু সেও তোমার কাছে রইল না। তুমি এমন এক প্রাণী।

শিক্ষা

এসবই তুমি আমাদের দিয়েছ।

তোমার কাছ থেকেই এসব আমাদের পাওয়া।

তুমি যা দিয়েছ, তার সবটুকুই আমরা পেয়েছি।

নতুন করে তোমার কাছ থেকে আমাদের আর পাওয়ার কিছুই নেই।

তাই তুমি যা দিয়েছ, তা আমরা সকলের কাছে ফাঁস করে দিতে চাই।

তাতে তুমি দুঃখ পেলে, আমাদের কিছু করার নেই।

এ শিক্ষা তুমিই আমাদের দিয়েছ। তোমার কাছ থেকেই আমরা এ শিক্ষা পেয়েছি।

সেদিন হয়ত তুমি ভাবনি, তোমার শিক্ষাই তোমার বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে দেবো।

এই হয়। আসলে এই হয়। তোমার মতো যারা এ শিক্ষা দেয় তারা কেউই ভাবে না যে, এ শিক্ষা যে একদিন তাদের বিরুদ্ধেই কাজে লেগে যাবে।

তাই হয়ত তুমিও ভাবনি।

তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, একেবারে খালি হাতে বিদায় না দিয়ে অন্তত শিক্ষাটা দিয়ে দিয়েছিলে।

নইলে তো মাঠে মারা যেতে হতো। (অবশ্য তুমি তাই চেয়েছিলে।)

তোমার দেয়া শিক্ষাটা বেঁচে কিনে, অন্তত বাঁচার চেষ্টা করি।

শেষবারের মতো বলি, তুমি দুঃখ করো না। বিশ্বাস করো, তোমার বিরুদ্ধে এছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না।

জানি বিশ্বাস করবে না। কারণ তোমার মাঝে বিশ্বাস বলে কিছু নেই।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে মানুষের মনন জগতের এক ধরণের অনুভূতি। যে অনুভূতির ফলে একটা জাতির মন-মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের ফলে গোটা জাতি মন থেকে পুরোনো ধ্যান-ধারণা, ব্যক্তি স্বার্থপরতা ঝেড়ে ফেলে নতুন মন ও ভাবনা নিয়ে গড়ে ওঠে। এই মন ও ভাবনাকে বলা হয় চেতনা।

আর এই গড়ে ওঠা নতুন মন ও ভাবনা বা চেতনা হচ্ছে, নিজের চাইতে অন্যকে (অপরকে) বেশি বড় করে দেখা। বেশি ভালবাসা। নিজের ব্যক্তি স্বার্থের চাইতে দেশ ও জাতির স্বার্থকে বেশি বড় করে দেখা। নিজের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে অন্যের সুখ-দুঃখকে প্রাধ্যান্য দেয়া।

একটা জাতির জীবনে এই চেতনা বছর বছর আসে না। একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ প্রয়োজনে হাজার হাজার বছর পর একটা জাতির জীবনে এরূপ একটি চেতনার জন্ম বা সৃষ্টি হয়। আর একটা জাতির জীবনে যখনই এ চেতনার সৃষ্টি হয়, তখনই সে জাতি ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে একে অপরকে নিজের মতো ভালোবাসে। কখনো কখনো নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালোবাসে।

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা বা অন্যকে নিজের মতো করে ভালবাসার চেতনাকেই বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

জাতীর জীবনে যখনই এই চেতনার জন্ম হয় তখনই সেই জাতি মাথা তুলে দাঁড়ায়। পৃথিবীর কোনো শক্তিই সেই জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

অন্যকে নিজের চাইতে বেশি ভালবাসার চেতনা হাজার হাজার বছর পর বাঙালি জাতির জীবনে এসেছিল ১৯৭১–এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়।

১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি নিজের সুখ-দুঃখের চাইতে অন্যের সুখ-দুঃখকে বড় করে দেখেছে, বেশি করে দেখেছে।

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসার বা অন্যকে নিজের মতো ভালবাসার চেতনা বারবার আসে না। হাজার বছরে একটা জাতির জীবনে একবাই এই চেতনা আসে।

জাতীর জীবনে যখন এ চেতনা আসে, তখন গোটা জাতি সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, স্বার্থপরতা, পরাধীনতা ইত্যাদি সকল কিছুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং মুক্তির লড়াই শরু করে।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে একমাত্র ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের সময়েই বাঙালি এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং গোটা বাঙালি জাতি তখন সকল প্রকার ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখেছে। অন্যকে নিজের চাইতে বেশি ভালোবেসেছে। সমস্ত বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করেছে।

এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা। নিজের ব্যক্তি স্বার্থের চাইতে দেশ ও জাতির স্বার্থ বেশি দেখা।

স্বাধীনের পর দেশপ্রেম বিবর্জিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসকারী দেশপ্রেম বিবর্জিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। বলা যায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস হয়েছে।

আমার, শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েল রাজতন্ত্রের ক্ষমতা লোপ করে নিজেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে একজন স্বৈরাচারী শাসক হয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক জনতা তাকে ক্ষমা করেনি। দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার হয়েছিল তার মৃত্যুর পর। এই বিচার প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গড়িয়েছিল এবং তার ফাঁসি হয়েছিল। কবর হতে তার হাড়গোড় তুলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছিল। এটাই হলো আইনের শাসন।

১৯৭৫–এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে যুদ্ধ করে দেশের যে ক্ষতি করেছি, সেই অপরাধে আমার ফাঁসি চাই।

স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও তা প্রকাশ না করায় এবং হত্যাকারীদের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অপরাধে আমার ফাঁসি চাই।

১৯৮৩–এর মধ্য ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র জয়নাল ও জাফর এবং ১৯৮৪–এর ফেব্রুয়ারি সেলিম ও দেলোয়ার হত্যায় শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে যে অপরাধ করেছি তার জন্য আমার ফাঁসি চাই।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড করার জন্য শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও নির্দেশে হিন্দু–মুসলমান রায়ট লাগিয়ে যে অপরাধ করেছি তার জন্য আমার ফাঁসি চাই।

১৯৯২ সালের পর থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নামে ঢাকা শহরে শেখ হাসিনার নীলনকশা ও নির্দেশে যে ১০৩ (একশত তিন) জন লোক নিহত হয়, এই অজ্ঞাতনামা ১০৩ জন মানুষ হত্যার দায়ে আমার ফাঁসি চাই।

তবে তার আগে

(১) সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা স্বত্ত্বেও সঠিক সময়ে শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা না করায়, আমাদের স্বাধীনতার জন্য তিরিশ লক্ষ

মানুষকে নিহত (শহীদ) হতে হয় এবং দুই লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষিত হতে হয়। এই তিরিশ লক্ষ মানুষ হত্যা এবং দুই লক্ষ নারী ধর্ষিত হওয়ার জন্য দায়ী শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর ফাঁসি চাই।

(২) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করার অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(৩) যে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে এবং দেশ স্বাধীন করে শেখ মুজিবর রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে এনেছে, স্বাধীনতার পর ভারত থেকে সেই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা না এনে, রাজাকার আলবদরসহ ভুয়া ব্যক্তিদের মুক্তিযোদ্ধা সনদ (সার্টিফিকেট) দেয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(৪) ক্ষমা না চাইতেই স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আল বদরদের ঢালাওভাবে ক্ষমা ঘোষণা করার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর শাস্তি চাই।

(৫) মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারকে বন্দী অবস্থায় বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর ফাঁসি চাই।

(৬) সিরাজ সিকদারকে খুন করে পবিত্র পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে "আজ কোথায় শিরাজ সিকদার!" বলে দম্ভোক্তি করে পবিত্র পার্লামেন্টকে অপবিত্র করার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর শাস্তি চাই।

(৭) জনগণের ভোট দেয়ার অধিকার, মিছিল করার অধিকার, দল করার অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণসহ সংবিধানের মৌলিক অধিকার হরণ করে জাতির উপর একদলীয় (বাকশাল) এর শাসন-শোষণ চাপিয়ে দেয়ার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(ক) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবর রহমান নিহত হওয়ার পর অনেক চেষ্টা এবং কষ্টের পর শিক্ষিত ছাত্র-যুবকদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনার ধারার সূচনা হয়েছিল। ছাত্র-যুবকরা ভাবতে শুরু করেছিল, "রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়।"

কিন্তু শেখ হাসিনা দেশে এসে সন্ত্রাসী, চোরাকারবারি, কালোবাজারি, ঘুষখোরদের রাজনীতিতে টেনে এনে কালোটাকাকেই রাজনীতির চালিকাশক্তিতে পরিণত করেছে এবং রাজনীতি থেকে সকল প্রকার নীতি-আদর্শ ঝেটিয়ে বিদায় করে

প্রতিষ্ঠিত করেছে নীতিহীন এক রাজনীতি। এই অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(খ) ভারতে বসে স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে এবং ১৯৮১ সালের ৩০শে মে তা বাস্তবায়িত করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

(গ) ১৯৮২ সালে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বিএনপি সরকার উৎখাত করে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(ঘ) সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য, ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে, ছাত্র আন্দোলনের নামে, ১৯৮৩–এর মধ্য ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাফর ও জয়নাল এবং ১৯৮৪–এর ফেব্রুয়ারিতে সেলিম ও দেলেয়ার হত্যার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

(ঙ) ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড করার জন্য, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রায়ট লাগিয়ে দেয়ার অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(চ) ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের ইস্যু তৈরি করার জন্য ঢাকা শহরে ১০৩ জন নিরীহ অজ্ঞাতনামা সাধারণ মানুষকে খুন করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

–ঃ উপসংহার ঃ–

সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের মতো ক্ষমতাসীন থাকাকালে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাবেন এবং পালিয়ে যাওয়ার আগে শেখ হাসিনা কাশ্মিরের হিন্দু রাজার মতো ভারতীয় সেনাবাহিনী ডেকে এদেশটাকে ভারতের দখলে দিয়ে যাবেন।

“সমগ্র জাতি – বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

এবং

মুক্তিযোদ্ধা হুশিয়ার!”